ম্যাজিক ল্যাম্প
ছোটদের বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিন

ম্যাজিক ল্যাম্প :: শারদীয় ২০১৫

প্রথম বর্ষ।। প্রথম সংখ্যা।। শারদীয় ২০১৫।।

www.magiclamp.net.in

প্রচ্ছদঃ পম্পা প্রধান

সূচিপত্র

প্রথম বর্ষ।। প্রথম সংখ্যা।। শারদীয় ২০১৫

- সম্পাদকীয় — পৃষ্ঠা ৬

- গল্প বিভাগ
  - গল্পের ম্যাজিক
    - রহস্য যখন নদীর বাঁকে - অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী — পৃষ্ঠা ৮
    - রবিন জেঠুর ক্যামেরা - পুষ্পেন মন্ডল — পৃষ্ঠা ১৬
    - কালো বিড়াল কান্ড - শিশির বিশ্বাস — পৃষ্ঠা ২৪
    - রংবদল - সহেলী চ্যাটার্জি — পৃষ্ঠা ২৯
    - সুহাসের হাসি - রাজীব কুমার সাহা — পৃষ্ঠা ৩৩
    - গাছের বাচ্চা মাছের বাচ্চা - চুমকি চট্টোপাধ্যায় — পৃষ্ঠা ৪৩
    - প্রোজেক্ট কে ৭ - তন্ময় বিশ্বাস — পৃষ্ঠা ৪৭
    - যুক্তি-তক্কো-অংক - তাপস মৌলিক — পৃষ্ঠা ৫৫
  - দেশ বিদেশের গল্প
    - ভূতুড়ে কুকুর - অনন্যা দাস — পৃষ্ঠা ৫৯
    - কী ভাবে এলো গাছপালা আর জল (দক্ষিণ আফ্রিকা) - মল্লিকা ধর — পৃষ্ঠা ৬৮
    - গোলাপকুমার - দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃষ্ঠা ৭২
  - গল্প রেল (গল্পের অডিও)
    - কথকতার গল্প পাঠ – গল্প: স্মৃতিধরের দিল্লী যাত্রা (সুচিত্রা ভট্টাচার্য) — পৃষ্ঠা ৭৫
    - দ্বৈতার গল্প পাঠ – গল্প: রচনার রহস্য (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) — পৃষ্ঠা ৭৫
  - পুরোনতুন গল্প
    - ত্রিপুর - অদিতি ভট্টাচার্য — পৃষ্ঠা ৭৬
    - বাঙালির দুর্গোৎসব - কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃষ্ঠা ৮০

- ছড়া-কবিতা
    - ছড়া-কবিতা
        - ম্যাজিক ল্যাম্প - দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী — পৃষ্ঠা ৮৪
        - অপু-দুগ্গা'র পুজো - মহাশ্বেতা রায় — পৃষ্ঠা ৮৬
        - প্রজাপতির খোকা - সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী — পৃষ্ঠা ৮৯
        - বছর নামচা - ঋতজিৎ মজুমদার — পৃষ্ঠা ৯০
        - বাঘিয়াবাদের গপ্পো - মধুমিতা ভট্টাচার্য — পৃষ্ঠা ৯১
        - মা ও মেয়ে – সঙ্গীতা দাশগুপ্ত রায় — পৃষ্ঠা ৯৩
        - ছুটির গন্ধ – শ্যামাচরণ কর্মকার — পৃষ্ঠা ৯৪
    - ছড়ার লড়াইঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য বনাম অমিতাভ প্রামাণিক, সমাধানকর্তা - অরুণাচল দত্ত চৌধুরী — পৃষ্ঠা ৯৬
    - শব্দ রেল (আবৃত্তি পাঠের অডিও): রক্তকরবী আবৃত্তির পাঠশালার কিশোর-কিশোরীদের আবৃত্তি পাঠ — পৃষ্ঠা ৯৫

- বিজ্ঞান
    - টরে-টক্কা - বিমান নাথ — পৃষ্ঠা ১০৭
    - ওল গাছে ফুল এবং একটি হুজুগ - সৌম্যকান্তি জানা — পৃষ্ঠা ১১১
    - এ-এম যেখানে জি-এমের চেয়ে বড় - সূর্যনাথ ভট্টাচার্য — পৃষ্ঠা ১১৪
    - গ্রাফের বিন্দুবিসর্গ - অমিতাভ প্রামাণিক — পৃষ্ঠা ১১৭

- 'বহুরূপী'
    - 'তাহাদের কথা' - লেখা মণিমালা চক্রবর্তী ছবি স্বর্ণ চক্রবর্তী, রাখী নাথ — পৃষ্ঠা ১২২
    - 'বহুরূপী' - লেখা ও ছবি স্বর্ণ চক্রবর্তী — পৃষ্ঠা ১২৫
    - 'ছড়িয়ে ছিটিয়ে' (ধাঁধা) – মণিমালা চক্রবর্তী — পৃষ্ঠা ১২৭

- ‘বাঙ্ময়’ – লেখা শ্রেয়সী চক্রবর্তী ছবি স্বর্ণ চক্রবর্তী, শ্রেয়সী চক্রবর্তী পৃষ্ঠা ১২৯
- ‘তিতলির খাতা’ - লেখা স্বর্ণ চক্রবর্তী, ছবি স্বর্ণ চক্রবর্তী, শ্রেয়সী চক্রবর্তী পৃষ্ঠা ১৩২
- তির্যক – লীলা রায় পৃষ্ঠা ১৩৪
- ‘আমাদের কথা’ – বহুরূপী বিভাগ সম্পর্কে সম্পাদকীয় বক্তব্য পৃষ্ঠা ১৩৫

ইতিহাস

- রাজকাহিনী
  - সমুদ্রগুপ্তের খাতা - সহেলী চট্টোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ১৩৬
  - শিলাদিত্য - কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ১৪২
- হারানো শহরের খোঁজে
  - মেঘের শহর মাচুপিচু - রুদ্র সেন পৃষ্ঠা ১৪৫

জাদু কার্পেট (ভ্রমণ)

- পক্ষীরাজের ডানা (দেশ)
  - ডুয়ার্সের ডায়রি - সহেলী চ্যাটার্জী পৃষ্ঠা ১৪৮
- ইউলিসেস (বিদেশ)
  - সি ওয়ার্ল্ড - প্রদীপ্ত ভক্ত পৃষ্ঠা ১৫৫
- ছড়ায় ছুটি (ছবিসমেত ভ্রমণবিষয়ক ছড়া; দেশ, বিদেশ)
  - সুরজকুণ্ড আন্তর্জাতিক শিল্প মেলা - দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী পৃষ্ঠা ১৬০
  - শরতের জলছবি - রাখী নাথ কর্মকার পৃষ্ঠা ১৬৭
- চিত্র-গল্প: (ছবিতে ভ্রমণ - দেশ, বিদেশ)
  - জাদুকরী এলোরা - শ্রেয়সী চক্রবর্তী পৃষ্ঠা ১৭৩
  - কেভ অফ দ্য মাউন্ডস - মহুয়া ব্যানার্জী পৃষ্ঠা ১৭৮

গোলটেবিল

- ভৌতিক অলৌকিক - বুক রিভিউ পৃষ্ঠা ১৮২
- ভালো থেকো মিতিন - সহেলী চট্টোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ১৮৯

- কমিক্সের দেশে
  - হাবলু আর গাবলু - নচিকেতা মাহাত — পৃষ্ঠা ১৯২
  - লালপাহাড় - অভিনব সাহা — পৃষ্ঠা ১৯৩

- চটপট চেটেপুটে
  - প্যারামাউন্ট (শরবত এর একমাত্র ঠিকানা) - সৌগত সেনগুপ্ত — পৃষ্ঠা ১৯৬
  - ফ্রুট পারফেইট - মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (ভিডিও) — পৃষ্ঠা ১৯৮

- মগজাস্ত্র - সহেলী চ্যাটার্জি — পৃষ্ঠা ১৯৯

- হাওয়াকল: হাতের কাজ শেখো - অঙ্কিতা কুন্ডু দাস (২টি ভিডিও) — পৃষ্ঠা ২০৫
- একটু ভাবি - তন্ময় বিশ্বাস — পৃষ্ঠা ২০৬
- ভোজবাজি: সহজে ম্যাজিক শেখো: শশাঙ্ক শেখর চ্যাটার্জী (ভিডিও) — পৃষ্ঠা ২০৫

- বায়োস্কোপ (ফিল্ম রিভিউ)
  - সিন্ডারেলা - ঋজু গাঙ্গুলী — পৃষ্ঠা ২১১
  - হিরের আংটি – শ্রেয়সী চক্রবর্তী — পৃষ্ঠা ২১৪

- ম্যাজিক ল্যাম্পের দলবল, লেখক পরিচিতি ও যোগাযোগ — পৃষ্ঠা ২১৮

সম্পাদকীয়

ম্যাজিক ল্যাম্প এর প্রিয় বন্ধুরা,

সবাই ভালো তো? ভালো তো থাকতেই হবে, পুজো এসে গেল তাই না?

নীল আকাশ জুড়ে দুধ সাদা মেঘের আনাগোনা। তুমি বলবে কই? কোথায় নীল আকাশ? জানলা দিয়ে তাকালেই দেখি একরাশ কালো ধোঁয়া এসে আকাশ ঢেকে দিচ্ছে।

কিন্তু একবার চোখ বন্ধ করে দেখো তো, তোমার মনের মধ্যেই আছে সেই বিশাল নীল আকাশ, যেখানে তোমার কল্পনারা উড়ে বেড়ায়, তোমার স্বপ্নের মেঘেরা খেলা করে। আর আছে তোমার বন্ধু ম্যাজিক ল্যাম্প।

এত ম্যাগাজিন থাকতে আবার একটা নতুন ম্যাগাজিন?

তাতে ক্ষতি কী? তবে ম্যাজিক ল্যাম্প কিন্তু স্বাদে গন্ধে সবার থেকে আলাদা।

কী করে?

কারণ ম্যাজিক ল্যাম্প-এ তুমি শুধু মন মাতানো গল্প কবিতাই পাবে না, পাবে আরও আরও অনেক কিছু। পাবে নতুন নতুন জায়গায় বেড়ানোর ভিডিও, ম্যাজিক ল্যাম্পের ভ্রমণ বিভাগ ম্যাজিক কার্পেট, তোমাদের এক নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে যাবে দেশ বিদেশের নানা প্রান্তে। পরিচয় করিয়ে দেবে অচেনা সংস্কৃতি ও মানুষের সাথে।

ইতিহাস পড়তে অনেকেরই ভালো লাগে না... তাই তো? .. সেই ঘ্যানঘ্যান করে মুখস্থ করা। কিন্তু এখানে সেই ইতিহাসই ধরা দিয়েছে নতুন ভাবে, গল্পের ছলে, আছে হারানো শহরের কথা, যেখানে বড় হয়ে অভিযানে যেতেই হবে তোমাকে।

আছে চিত্র বিচিত্র বহুরূপী বিভাগ। ফুল, প্রজাপতি পাখি, পোকামাকড় এর নাম না জানা প্রজাতির সম্পর্কে নানা মজাদার তথ্য পেয়ে যাবে এখানে। ম্যাজিক ল্যাম্পের বহুরূপী টিম বনেবাদাড়ে ঘুরে অনেক পরিশ্রমে সেই সব ভিডিও তুলে এনেছে তোমাদের জন্যে।

আছে বিজ্ঞানের নানা জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান। এমন কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা, যা তোমরা নিজেও করে দেখতে পার।

কবিতা বিভাগ নিয়ে আসছে হারিয়ে যাওয়া কবির লড়াই আর মন মাতানো ছড়া।

গল্প বিভাগে মিলিয়ে মিশিয়ে ভূত, কল্পবিজ্ঞান, মানবিক, মজার সব রকমের গল্পই পাবে তোমরা, লিখছেন বর্তমানের জনপ্রিয় সাহিত্যিকরা। আছে দেশ বিদেশের অনুবাদ গল্প ও পৌরাণিক গল্প।

মগজাস্ত্র বিভাগে সমাধান কর জটিল ধাঁধার। দেখি কে কত বড় ডিটেকটিভ!

আরও আছে "চটপট চেটেপুটে"... থাকছে সহজ রেসিপি বানানোর ভিডিও, শেখাচ্ছে মহুয়া দি।

“হাওয়াকল” বিভাগে অঙ্কিতা দি শেখাচ্ছে সুন্দর হাতের কাজ, রয়েছে ভিডিও।

ভোজবাজি বিভাগে নতুন ম্যাজিক শেখাচ্ছেন ম্যাজিশিয়ান কাকু।

আর বায়স্কোপ-এ তোমাদের জন্যে থাকছে একটি পুরনো, একটি নতুন সিনেমার রিভিউ।

নতুন কী বই পড়বে? কেন পড়বে? সেই সব জানানোর জন্যে রয়েছে "গোল টেবিল"।

“একটু ভাবি” বিভাগে রয়েছে সেই সব দাদু ঠাকুমার কথা যাদের কথা আমরা ভুলে যাই, ফেলে আসি বৃদ্ধাশ্রমে অবহেলায়।

আর যারা বাংলা গল্প/ কবিতা পড়তে পারো না, বাংলা পড়তে অসুবিধে হয় কিন্তু গল্প শুনতে ইচ্ছে হয় তাদের কথা ভেবেই তৈরী হয়েছে গল্প ও কবিতার অডিও.. গল্প রেল ও শব্দ রেল।

কী? তাহলে? কত কিছু আছে, একবার ভাব দেখি? তবে ম্যাজিক ল্যাম্প-এর আসল ম্যাজিক কিন্তু তুমি। কারণ তোমার ভালবাসার ম্যাজিকেই অনেকদূর পথ যাব আমরা।

ও আমার নামটাই তো বলা হয়নি। আমি ম্যাজিক ল্যাম্পের ওয়েবজিন জিনি। তোমরা আমাকে জিনি বলেই ডেকো। ভালো থেক বন্ধুরা। অন্যদের ভালো রেখো। খুব খুব ভালো কাটুক তোমাদের পুজো।

ইতি,

জিনি

ছবিঃ সম্বুদ্ধ বিশী

গল্পের ম্যাজিক::

রহস্য যখন নদীর বাঁকে

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

"স্বামী ভবানন্দজি। অদ্ভুত ক্ষমতা, তাই না!" মিলন বলে উঠল।

"হ্যাঁ, এরকম গ্যারান্টি দিয়ে ঈশ্বরদর্শন করানো! ভাবা যায়?"

"আসলে বলাটাই বড়ো কথা নয়, করেও তো দেখাচ্ছেন! যে-ই যায় ওর কাছে সেই তো পালটে যাচ্ছে। এই তো ম্যাজিশিয়ান মল্লিক অনেক হম্বি তম্বি করে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন ভণ্ডামি, অপকীর্তি সব ফাঁস করে দেবেন। তা এক মাস বাদে ফিরে এলেন 'বাবা- বাবা' বলতে বলতে। শুনছি ম্যাজিকও ছেড়ে দিচ্ছেন। বাকি সারা জীবন গুরুর বাণী প্রচার করে আর জনসেবায় দিন কাটাবেন বলছেন।"

"দেখেছো কাগজে ভবানন্দজির ওপর রোজ একটা লেখা থাকবেই। আমার মনে হয় মিডিয়ার সঙ্গেও ওর দারুণ যোগাযোগ আছে।"

"তা তো হবেই বড় বড় সব নেতা - আমলারা ওনার শিষ্য। আর ওনার কাছে দীক্ষা নেবার জন্যও বিশাল ওয়েটিং লিস্ট। স্বামীজি নাকি কয়েকশো নামের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে বেছে নেন। তাও আবার বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় ছাড়া দীক্ষা দেন না।"

"অদ্ভুত তো! তা লোকটাও খুব ভালো শুনেছি। ওনার কথা শুনে তাই তো মনে হয়।"

"লোক বলিস না বাবা, ওঁরা হলেন মহাপুরুষ," মাসিমা বলে উঠলেন, "আমরাও এক বছর ধরে অপেক্ষায় আছি। কখন স্বামীজি ডাকেন। ভাগ্যে থাকলে হবে।"

"আমি গত সপ্তাহে ডাক পেয়েছি মাসিমা। আগামী সপ্তাহে যাচ্ছি।"

বিশ্বজিৎদা বলে উঠল, "ন' মাস অপেক্ষা করে।" আমরা সবাই চমকে উঠলাম। এত বড়ো খবরটা এতক্ষণ বিশ্বজিৎ দা বলেনি।

"সত্যি ভাগ্য করে এসেছিস বিশ্ব। তা না হলে এরকম স্বামীজির কাছ থেকে ডাক পাস," মাসিমা বলে উঠলেন। আমরাও সবাই তাতে যোগ দিলাম। এই প্রথম আমাদের চেনা কেউ স্বামীজির দর্শন পেতে চলেছে।

তোমরা যারা আমাদের শনিবারের আসর সম্বন্ধে পরিচিত নও, তাদের জানাই প্রত্যেক শনিবার উত্তর কলকাতার রামতনু বোস লেনের এক বাড়িতে আমরা জনা কুড়ি কিশোর কিশোরী জমায়েত হই। বিজ্ঞান, সাহিত্য, মেলা, সিনেমা কোনও কিছুই আমাদের আলোচনা থেকে বাদ যায় না। তা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় স্বামী ভবানন্দজি। গত এক বছরে তাঁর নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু ভারতে কেন ভারতের বাইরে থেকেও অনেকে ওনার কাছে দীক্ষা নিতে আসেন। স্বামীজির দীক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিটাও ভারি অদ্ভুত। প্রায় একমাস ধরে এই দীক্ষা পর্ব চলে। হয় বছরের বিশেষ কিছু সময়ে। বেছে বেছে নেন। লক্ষাধিক ভক্তের মধ্যে সামান্য কিছু জন স্বামীজির কাছে দীক্ষা নেবার সুযোগ পায়। আর যারাই ওঁর সংস্পর্শে আসেন তাদের মধ্যে বিশাল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিখ্যাত অ্যাডভোকেট রামকুমার শেষাদ্রি, ই এন পি সফটওয়্যার সার্ভিসের প্রধান রবি উনি, ক্রিকেটার ভরত শেঠ, হোম মিনিস্টার রাহুল সরকার - সবার মধ্যেই এক বিশাল মিল। এরা সবাই স্বামীজির শিষ্য। স্বামীজির থেকে দীক্ষা নেবার পর এদের কেউ কেউ পেশার থেকে সরে এসে পুরোপুরি জনসেবার কাজে যুক্ত হয়েছেন, কেউ পুরো সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। স্বামীজির কথায় প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন, আর উনি সেই ঈশ্বর কে খুঁজে পেতে সাহায্য করেন।

"তা বিশ্বজিৎদা তুমি কবে যাচ্ছ? দারুণ এক্সাইটেড নিশ্চয়ই?" রাতুল বলে ওঠে।

"হ্যাঁ তা তো বটেই। তবে এখনও কুড়ি দিন বাকি আছে।"

"তা তুমি এত ধার্মিক হলে কবে থেকে?" শিশির বলে ওঠে।

"আরে আমি থোড়াই যাচ্ছি সেরকম ভক্ত হতে! আসলে এরকম পরিবর্তন এ ক'দিনের মধ্যে কীভাবে সম্ভব সেই কৌতূহলটাই আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।"

"বিশ্বজিৎদা থেকে স্বামী বিশ্বানন্দজি," অনিলিখা এতক্ষণ চুপ করে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলো। হঠাৎ করে খোঁচা মেরে দিল।

কটমট করে অনিলিখার দিকে তাকিয়ে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল, "আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করাটা অত সহজ হবে না। আমার বিশ্বাস এর পেছনে একটা বড় কোনও চক্র কাজ করছে। এই যে চক্রধরপুর - এর কথা আগে কোনও দিন কেউ জানত? এখন শুধু স্বামীজির জন্যই লক্ষ লক্ষ লোক ওখানে আসতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ইয়ংগার জেনারেশান - চল্লিশের কমবয়সীদের আকর্ষণ করতে পেরেছেন। স্বামীজির প্রভাবে ওই অঞ্চলে হিংসার ঘটনাও কমে গেছে।"

"তা এতে অস্বাভাবিক কী আছে?"

"অস্বাভাবিক আছে বৈকি! অন্য কোনও গুরু, মুনি-ঋষি যা পারলেন না, হঠাৎ করে ইনি করছেন কী করে? তা ছাড়া আর কোনও গুরুকে নিয়ে এত লেখালেখি হতে দেখেছিস? কাউকে ঘিরে এত বড় বড় নেতাদের ভিড় দেখেছিস? আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটার পেছনেই সরকার আর প্রচার মাধ্যমের প্রত্যক্ষ মদত আছে। আর তা-ই আমার যাওয়া।"

"তা ওখানে কতদিন থাকতে হবে?"

"একমাস তো থাকতেই হবে। পুরো দীক্ষার প্রসেসটাই চলবে একমাস ধরে। তারপর আমার আরও দিন চার পাঁচ থাকার ইচ্ছা আছে।"

"তার মানে বিশ্বজিৎদা তুমি বেশ কয়েক সপ্তাহ আর এখানে আসছ না?"

"আমি না থাকলেই বা কী! অনিলিখা তো আছেই। ওর কাছেই গল্প শুনিস তোরা।" অনিলিখাকে বিদ্রুপ করার সুযোগ পেলে বিশ্বজিৎদা ছাড়ে না। আজকের বাকি সময়টাও ভবানন্দজি, আর বিশ্বজিৎদা কী ভাবে যাবে, কী প্রস্তুতি নেবে - সেসব নিয়ে আলোচনায় কেটে গেল।

(২)

আমরা আবার তিনমাস বাদে শনিবারের আসরে বিশ্বজিৎদাকে ফিরে পেয়েছি। অনিলিখাও আছে। বিশ্বজিৎদা ছিল না বলে যে আমাদের শনিবারের জমায়েত বন্ধ ছিল তা নয়। তবে অনেকটাই স্বাদ হারিয়েছিল। অনিলিখাও এর মধ্যে একদিন এসেছিল। তাই দুই চন্দ্র –সূর্যের অভাবে আমাদের আসর একদমই টিমটিমে হয়ে পড়েছিল। বিশ্বজিৎদা প্রায় একমাস হল ফিরেছে। কিন্তু ফেরার পর থেকে আমাদের আসরে আর আসেনি। তাছাড়া লোকমুখে খবর পেয়েছি ফেরার পর থেকেই বিশ্বজিৎদা নাকি একেবারেই পালটে গেছে। দিনের অনেকটা সময় গীতা-ভাগবৎ পড়ে সময় কাটায়, হালকা কথা বলে না। তাই আরও উদগ্রীব হয়ে বিশ্বজিৎদার অপেক্ষা করছিলাম, যাতে পরিবর্তনটার চাক্ষুষ পরিচয় পাই। ঢোকামাত্রই সে প্রমাণ পেলাম। অন্যদিনের মতো চটিটা ছুঁড়ে না ফেলে হাতে করে সরিয়ে রাখল। সেরা চেয়ারটায় না বসে, ঘরের এককোণে রাখা টুলটার ওপর কুণ্ঠিত ভাবে বসল। আমাদের সবার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করে একবার উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিল যে ও আর আগের মতো নেই। ট্রেতে রাখা গরম সিঙ্গারাগুলোর দিকে শীতল দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। এ যেন অন্য কেউ।

আমাদের অনেক পীড়াপীড়িতে বিশ্বজিৎদা আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল, "স্বামীজির সংস্পর্শে এসে আমি এটাই বুঝলাম যে এতদিন কীভাবে আমি নষ্ট করেছি।" হাতটা কপালে ঠুকে, চোখ বন্ধ করে প্রণাম করে ফের বলতে শুরু করল, "জায়গাটা খুব রিমোট। আগে তো বলতে গেলে যাওয়াই অসম্ভব ছিল, এখন তাও স্বামীজির আশ্রমের জন্য প্রচুর বাস যায়। যদিও তা কোনও ভাবেই যথেষ্ট নয়। দেরাদুন থেকে বাসে দেড় ঘণ্টার মতো। সাকরি। তারপর সেখান থেকে আশ্রমের বাসই নিয়ে যায়। অন্য কোনও বাস বা গাড়িতে যাওয়ার উপায় নেই। যেদিন পৌঁছলাম তার দুদিন পরে প্রথম স্বামীজির দর্শন পেলাম। একদম আর পাঁচজনের মতো চেহারা। কিন্তু চোখ মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে ইনি সাধারণ নন। একটা অদ্ভুত দীপ্তি, দৃঢ়তা আর প্রশান্তির ছাপ। মুখে সর্বদা স্মিত হাসি। চারপাশের চাঞ্চল্য থেকে যেন কত দূরে। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বলে উঠলেন, "কী আবার আমার পরীক্ষা নিতে এসেছিস? তা ভালো, অন্ধ বিশ্বাস ভালো নয়। যাচাই করে নিতে হয়। তবে মনে রাখিস এ তোর নিজেরই পরীক্ষা।" কী করে আমার মনের কথা বুঝলেন জানিনা। প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধায় মনটা ভরে উঠল। স্বামীজিকে প্রণাম করে অন্য একটা ঘরে বসলাম। আমারই মতো আরও যারা দীক্ষা নেবে তারা অপেক্ষা করছে। স্বামীজির এক শিষ্য এসে আমাদের সব বুঝিয়ে দিয়ে গেল। আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা জায়গা নির্দিষ্ট আছে, যেখানে বসে আমাদের আরাধনা করতে হবে। প্রত্যেকে শুধু দুটো করে জামা কাপড় সঙ্গে নিতে পারবে। দিনে মোটে একবার খেতে পারব। তাও যৎসামান্য। জলতেষ্টা পেলে পাশের নদী থেকে খেয়ে আসতে হবে। এভাবে একমাস কাটাতে হবে। তবেই নাকি আত্মশুদ্ধি হবে। তারপরে হবে দীক্ষা। মনে মনে হাসছিলাম কে কাকে দীক্ষা দেয়! এরপর তিনজন শিষ্য আমাদের আরাধনার জায়গা দেখাতে নিয়ে গেল। ভেবেছিলাম বোধ হয় কোনও বাড়ির বড় চাতাল হবে।

কোথায় কী! পাশেই তোরাই নদী। পাহাড়ি নদী। বাঁক নিয়ে নেমেছে। তারই ঠিক পাশে। চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা। তারই মাঝে খানিকটা উপত্যকা মতো। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গুহা। তারই একটাতে আমাকে বসতে হবে। সেটা বড়জোর পাঁচ বাই সাত ফুটের মতো জায়গা। পাথরের ওপর শুতে হবে। আমাদের আর নদীর মাঝে, নদীর ধার বরাবর শ্মশান ঘাট। তবে অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মড়া পোড়ানো হচ্ছে। জায়গাটা দেখে ভয় পাওয়া খুব স্বাভাবিক। তবু চারদিক এত পরিষ্কার, এত সুন্দর পরিবেশ যে কেন জানিনা ভয় লাগছিল না। চারদিকে তাকালেই মনে হয় এটা দারুণ বেড়ানোর জায়গাও হতে পারত।

(৩)

পরের দিন থেকে আরাধনা শুরু হল। কোনও কথা বলার অনুমতি নেই। যখন তখন ধ্যান ভেঙ্গে ওঠাও যাবে না। তবু প্রথমদিন উঠে মাঝে মাঝেই হেঁটে আসছিলাম। মনঃসংযোগ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। দূর থেকে ওঁ ধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসছে। আমাদের প্রত্যেকের আরাধনার জায়গার মধ্যে প্রায় একশো ফুটের ব্যবধান। সকাল থেকে কোনও খাওয়া নেই। সন্ধেবেলা একজন একটা বাটিতে করে ডাল রুটি দিয়ে গেল। সারাদিনের খিদে কি আর ওতে মেটে? কিন্তু উপায় নেই। এটাই নিয়ম। রাতের বেলায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল কেন মরতে এখানে এলাম। চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে আগুন দেখা যাচ্ছে, মড়া পোড়ানোর। আর নদীর জলের আওয়াজ। মাঝে মাঝে নদীর ধারের মন মাতাল করা হাওয়া। কিন্তু পেট জ্বলছে। প্রথম রাতে একটা মুখরোচক স্বপ্নও দেখে ফেললাম।

খিদের চোটে ঘুম তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে গেল। তখনও সূর্য ওঠেনি। হেঁটে নদীর ধার অবধি ঘুরে এলাম। আমাদের গ্রুপে কয়েকজন বিদেশীও ছিল। তাদের একজনকে পথে দেখলাম। আশপাশে যে কটা গাছ দেখলাম কোনোটাতেই কোনও ফল নেই যে খাবো। রোদ একটু উঠতেই গুহায় ফিরে এলাম। 'গুরুর বাণী' বলে যে বইটা আমাদের পড়তে দেওয়া হয়েছে বসে বসে তাই পড়তে লাগলাম। নদীর ধার থেকে মড়া পোড়ানোর ধোঁয়া ভেসে আসছে। তবে আশ্রমের লোকেরাই পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে, তাই মাঝে মাঝে কাঠ কাটার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। দুপুরের দিকে নদীর হাওয়ায় আর ক্লান্তিতে খানিকক্ষন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি থালায় মোটা বাজরার রুটি আর ডাল দিয়ে গেছে। খিদের চোটে তা-ই খুব তৃপ্তি ভরে খেলাম। বিকেলের দিকে এক গুরুভাই জানিয়ে গেল যে সন্ধেবেলা নদীর ধারে একটা জায়গায় গীতা পাঠ হবে - আমি যেন যাই। খানিকবাদে সেখানে পৌঁছে দেখি জনাপাঁচেক ভক্ত আগুনকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। তারাখচিত আকাশের নিচে আগুনের আলোয় গীতাপাঠ হচ্ছে। অনির্বচনীয় পরিবেশ।

প্রায় ঘন্টাচারেক গীতা পাঠ হল। তারপর আমরা যে যার মতো গুহায় ফিরে গেলাম। সে রাতে খুব বৃষ্টি হল। সঙ্গে বজ্রপাত। এমন বজ্রপাত আগে দেখিনি। চারদিকের পাহাড় ও গাছগুলো চমকে চমকে উঠছিল বিদ্যুৎ চমকে। ভোরবেলা উঠে দেখি ঠিক সামনেই একটা গাছে বজ্রপাত হয়েছে। গাছের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। চারদিকের বাতাস অনেক হাল্কা লাগছে।

এরকম ভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগল। কোনও বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু অদ্ভুত একটা আনন্দ আছে, একটা নেশা আছে। সারাদিন ধরে গুহায় বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, দুপুরের দিকে সামান্য আহার। সন্ধেতে বেশির

ভাগ দিন সমবেত ভাবে আগুনের ধারে বসে গীতাপাঠ। রাতের অন্ধকারে তারাভরা আকাশ দেখা। নদীর ধারে শ্মশান ঘাটে আগুনজ্বলা দেখা। পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়া বাতাসের কানাকানি, নদীর স্রোত আর ঝিঁঝিঁর ডাকের সিম্ফনি শোনা। মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টির রাতে গুহার কোণে কোনও রকমে পড়ে থেকে বৃষ্টির ছাঁট এড়ানোর চেষ্টা। শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। মনে হয় সবসময় শুয়ে থাকি। মাঝে কয়েকদিন জ্বরও এল নদীর ঠাণ্ডা জলে স্নান করে। ডাক্তার দেখে কিছু কবিরাজী ওষুধ দিয়ে গেল। শুধু আমারই যে এরকম তা নয়, প্রত্যেকের এক অবস্থা। এত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা খুব কম জনেরই থাকে। তবে আশ্রমের গুরুভাইরা এমনিতে খুব যত্ন নেয়। কারো শরীর খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। বয়স্কদের উপর বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখে।

ওখানে একটা জিনিস খুব অদ্ভুত লাগত। এত সুন্দর একটা জায়গায় শ্মশান রেখেছে কেন? ওটাকে আলাদা করে দিতে পারত, অবশ্য এটা ঠিক শ্মশানের এই আগুন দূর থেকে দেখে মন যেন কেমন উদাস হয়ে ওঠে। মনে হয় একদিন তো আমারও ওই দশা হতে চলেছে। এসব কষ্ট তখন অনেক কম লাগে। প্রায় প্রতি রাতেই বৃষ্টি আর সঙ্গে বজ্রপাত। আর সেই বজ্রপাত এত অবিরাম হয় যে সকালে উঠলে অবাক লাগে এই ভেবে যে এত গুলো গাছ রক্ষা পেল কী ভাবে? দিন কুড়ির পর থেকে রোজ ডাক্তার এসে দেখত। ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জেকশানও দিত। ছাব্বিশ দিনের মাথায় শরীর এতটাই ভেঙ্গে পড়ল যে ডাক্তার দুধ খেতে বলল। পরের দিন দুধ খাবার পরই অদ্ভুত ব্যাপারটা হল।

দুধ খাবার পরই মাথাটা কী রকম ঝিমঝিম করে উঠল। হঠাৎ করে মনে হল কেউ যেন আমাকে অন্ধকার পথ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দুরন্ত গতিতে। আর সেই অন্ধকার চিরে হঠাৎ দেখতে পেলাম তীব্র আলো। বাবা মারা গেছেন দশ বছর হল। তাঁকে দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম আমার ছোটমাসিকে যে আমাকে ছোটবেলায় মানুষ করেছে। ছোটমাসিও বছর পাঁচেক হল মারা গেছে। স্কুল থেকে বেরুলেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত এক অন্ধ ভিখারি, যাকে রোজ আমি টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে পাঁচ পয়সা দিতাম। তাকেও দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম প্রথম স্কুলে যাবার দিন। স্পষ্ট। বাবার হাত ধরে স্কুলের চাতালে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হল আমি যেন আমার শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছি। ওপর থেকে আমার শরীরটা দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম দূরে নদীর জল। চারদিকে পাহাড়। মনে হল আমার আর কোনও বন্ধন নেই। যেখানে চাই যেতে পারছি। সে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা। মনে দুঃখের কোনও লেশ নেই, শুধুই স্বার্থহীন আনন্দ। কতক্ষণ এরকম ছিলাম জানিনা। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি আমাকে ঘিরে কয়েকজন গুরুভাই দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছিল। মনের মধ্যে কোনও পাপবোধ নেই, নিজেকে নিয়ে চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। বুঝলাম যে জন্য এখানে এসেছি, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছে। পরের দিন ভবানন্দজি আমাকে দীক্ষা দিলেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "আর কোনও প্রশ্ন নেই নিশ্চয়! এতদিনে নিজেকে ফিরে পেয়েছিস, যা এবার তা কাজে লাগা। এ সংসার শুধু মিথ্যেয় ভরা। কালকে যা অনুভব করেছিস তাই ঈশ্বর। ঈশ্বর তোর মধ্যেই আছেন," বলে আমার বুকে হাত ছুঁইয়ে বললেন, "এই এইখানে। এবার অন্যের কাজে নিজেকে লাগা। অন্যের কষ্ট দূর করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।"

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল, "আমি এখন বুঝতে পারি কীভাবে আমি জীবনের এতগুলো বছর নষ্ট করেছি। যাই হোক গুরুর কৃপায় এখন আমার উপলব্ধি হয়েছে।"

"তা তুমি যে জায়গায় গিয়েছিলে সেটা কি শুধুই পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছিল? না আলাদা পাঁচিলও ছিল?" এতক্ষণের নীরবতা ভেঙ্গে অনিলিখা হঠাৎ একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসল। জানিনা পাঁচিলের ব্যাপারটা এত দরকারী মনে হল কেন?

বিশ্বজিৎদা খানিকটা অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ ঠিক বলেছ। পুরো জায়গাটা প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তা তুমি আন্দাজ করলে কী করে? আমারও একটু অবাক লেগেছিল। এমনিতেই অত বিচ্ছিন্ন জায়গায় অত উঁচু পাঁচিল কেন! তেমন দামী কিছুও তো নেই।"

"তোমাদের কি মারা হত?" আবার অনিলিখা প্রশ্ন করল।

বিশ্বজিৎদা এবার সত্যিই অবাক, "হ্যাঁ অনুমতি নিয়েই পিঠে দশবার করে রোজ বেত মারা হত। স্বামীজির মতে এটা আত্মশুদ্ধি, পুরোনো গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য। যাতে মনে অতীতের কোনও অপরাধ বোধ না থাকে।"

"আচ্ছা, যে দিন সকালে তোমার এই দর্শন হল, তার আগের রাতেও কি বৃষ্টি বজ্রপাত হয়েছিল?"

বিশ্বজিৎদা খানিক চিন্তা করে বলে উঠল, "হ্যাঁ, তার আগের দিন থেকে দুপুর থেকে প্রবল বৃষ্টি-বজ্রপাত হচ্ছিল। সেদিন সকাল অবধি চলেছিল। আচ্ছা তুমি এসব প্রশ্ন কেন করছ বলতো অনিলিখা?"

অনিলিখা মৃদু হেসে খানিকক্ষন চুপ করে রইল, "তোমার যেদিন ওই অনুভূতি হয়েছিল তা খুব একটা সাধারণ দিন নয়। ওই দিনের একটা বিশেষত্ব ছিল — কী জানো?"

"আরে ওই দিনেই তো আমেরিকার ভার্জিনিয়ায় ইউনিভার্সিটিতে পাগল একটা ছাত্র এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী মেরেছিলো, তাই নয়?" মিলন বলে ওঠে।

শিশির ধমক দিয়ে বলে ওঠে, "থাম তো, তার জন্য কি আর ওই দিন কে বিশেষ বলা যায়?"

অনিলিখার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি, "ওটা ওই দিনের বিশেষত্বের একটা প্রকাশমাত্র। মহাকাশবিদ ছাড়া খুব কম লোকেই জানে যে ওই দিনটাতে চাঁদ গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব থেকে কাছে এসেছিল। অর্থাৎ কী বলতে পারিস?"

"ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কিছু ব্যাপার?" রাতুল আমতা আমতা করে বলে ওঠে।

"ঠিক তাই। চাঁদের কাছে আসাটা পৃথিবীর তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর বিশাল প্রভাব ফেলে। আর তার প্রভাব পড়ে আমাদের মস্তিস্কে।"

অনিলিখা খানিক থেমে বলে ওঠে, "আমি যা বলতে যাচ্ছি তা বলার সাহস খুব কম লোকেরই আছে। সারা বিশ্বে গুটি কয়েকজন বিজ্ঞানী আছেন যারা এটি জানেন। তারাও এব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু বলবেন না, আর এ তথ্যকে গ্রহণ করতে হলে মনটাকে খোলা রাখতে হবে।"

মাসিমা অধৈর্য হয়ে বলে ওঠেন, "বলে ফেলো না অনিলিখা। এমন আর কী বলতে চলেছো? বিশ্বজিৎ তো আমাদেরই ঘরের ছেলে।"

"আমাদের মস্তিস্কের সব থেকে বড় রহস্য হল টেম্পোরাল লোব। এটা মস্তিস্কের দুই ধারে কানের পাশাপাশি থাকে। টেম্পোরাল লোব সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন আছে। তবে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই টেম্পোরাল লোবকে উদ্দীপ্ত করলে বিশ্বজিৎদার যে অনুভূতি হয় ঠিক একই রকমের অনুভূতি হয়। লোকেরা হারিয়ে যাওয়া ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের দেখে, মনে হয় অনুভূতি শরীরের বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। শরীর কে ওপর থেকে দেখা যায়। অনুভব করা যায় একটা বৃহৎ শক্তিকে, এককথায় আমাদের চেতনাবোধ শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। অ্যালডাক্স হাক্সলে একেই বলেছিলেন মানুষ আর মহাবিশ্বের অচেনা এক বৃহৎ শক্তির মধ্যে সংযোগকারী মাধ্যম। তা কী করে এই টেম্পোরাল লোব উদ্দীপ্ত হয়? নাইট্রিক অক্সাইডের সাহায্যে। এই নাইট্রিক অক্সাইড তৈরী হয় অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের মিশ্রণে বিদ্যুৎসংযোগে। অর্থাৎ নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসে বেড়ে যায় বজ্র-বিদ্যুৎপাত হলে। আর তাছাড়া উঁচু জায়গাতে এমনিতেই নাইট্রিক অক্সাইড বেশী থাকে।"

জয়দীপ বলে ওঠে, "তুমি বলতে চাও বিদ্যুৎপাত হলে পরেই এই ধরণের অনুভূতি হয়। তা হলে তো লোকে আকছার এরকম দেখত।"

"না, শুধু নাইট্রিক অক্সাইড তৈরী হলেই যথেষ্ট নয়। নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসের থেকে ভারী। দেখতে হবে এই নাইট্রিক অক্সাইড চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে। তাই চারধারে এই পাঁচিল। আর গুহার ভেতরে আরাধনা যাতে নাইট্রিক অ্যাসিডের ঘনত্ব আরও বেশী হয় । এবার আসি শ্মশান প্রসঙ্গে। মৃতদেহ পোড়ালে বা পচলে তা থেকে মিথেন বলে একটা গ্যাস উৎপন্ন হয় যা মস্তিস্কে প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞান আজকে এ কথা বলছে, কিন্তু মুনি-ঋষিরা আগে থেকেই এ কথা জানতেন। তাই তাঁরা গুহায় বসেন শ্মশানের কাছে। আর শুধু যে আমাদের দেশেই এই অভ্যাস ছিল তাই নয়। পিরামিড। পিরামিড তো মিশরীয়দের কাছে ছিল একধরনের উপাসনাস্থল। তাই পিরামিডের চার ধারেও অতীতে ছিল উঁচু পাঁচিল যাতে নাইট্রিক অক্সাইড না বেরুতে পারে। কবরখানাও থাকত সব পিরামিডের খুব কাছে।"

খানিক থেমে অনিলিখা আবার বলে ওঠে, "আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করবি, পৃথিবীর সব ধর্মস্থানই হয় নদীর ধারে যেখানে নদী হঠাৎ করে বাঁক নিয়েছে বা কোনও ঝর্ণার কাছে। কারণ ফ্রি ইলেকট্রন। টেম্পোরাল লোব কে উদ্দীপ্ত করতে আরেকটা অনুঘটক। বুদ্ধের বোধি লাভ করার কথাই ভাবো। বুদ্ধগয়া নৈরঞ্জনা নদীর ধারে। বুদ্ধ এরপর প্রথম ভক্তদের উপদেশ দেন সারনাথে। সারনাথেও যে জায়গা বেছে নিয়েছিলেন তা ছিল নদীর ধারে। এবার, দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসি। উপবাস, নাম মাত্র খাওয়া দাওয়া আমরা অনেক পুজোর দিনেই করি। হয়ত একদিন, আধদিন। এই অভ্যাসটা এসেছে কোথা থেকে? আগের মুনি ঋষিরা দিনের পর দিন না

খেয়ে সাধনা করতেন। বিশ্বজিৎ তো তাও কিছু একটা খেত। শরীরের ওপর অত্যাচার, টেনশন, কষ্ট এও তেমন অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে টেম্পোরাল লোব সহজে উদ্দীপ্ত হয়। কিছু ধর্মে তো বেত বা ছড়ি দিয়েও মারা হয়। এ সবই প্রস্তুতি। খুব সুস্থ শরীরে টেম্পোরাল লোব উদ্দীপ্ত হয় না।"

"তুমি এবার বলবে বিশ্বজিৎদা কে দুধ খাওয়ানো হয়েছিল - তাও বিশেষ উদ্দেশ্যে," মিলন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল।

"দুধ তো অবশ্যই ইচ্ছে করে খাওয়ানো হয়েছিল। দুধে থাকে ট্রিপটোফ্যান। ট্রিপটোফ্যান অবসন্ন শরীরের ক্ষেত্রে মস্তিস্কে খুব তাড়াতাড়ি প্রভাব বিস্তার করে। সেরোটনিন নামক এক রাসায়নিক যৌগ তৈরী করে। ঠিক যেমন বুদ্ধকে করেছিল। উনপঞ্চাশ দিন উপবাসের পর বুদ্ধ যখন প্রায় মৃত তখন সুজাতা নামক এক বালিকা বুদ্ধকে পায়েস দিয়েছিল, মনে পড়ে সে কথা? পায়েস মানেই দুধ। ট্রিপটোফ্যান যে ভাবে বুদ্ধের ওপর প্রভাব ফেলেছিল, ঠিক তেমনই ফেলেছে বিশ্বজিৎ এর ওপরে। আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। অশোকের পরিবর্তনের কথাই ভাবো। চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোক। কোথায় হয়েছিল কলিঙ্গ যুদ্ধ? দয়া নদীর ধারে, যেখানে নদী বাঁক নিয়েছে, ধৌলিগিরি পাহাড়ের উপত্যকায়। নাইট্রিক অক্সাইডের মতো ভারী গ্যাসের পছন্দের জায়গা। যুদ্ধে এক লক্ষের মতো সেনা মারা গিয়েছিল। সেদিনও হাজার হাজার চিতা জ্বলেছিলো, তারপরে নেমেছিলো বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টি। সবে মিলে আমরা পেলাম সর্বকালের সেরা সম্রাটকে।"

"তাহলে তুমি বলতে চাও বিশ্বজিৎদাও এখন বুদ্ধের মতো হয়ে গেছে?"

"এটাই তো মুস্কিল। মহাপুরুষদের মধ্যে বাড়তি আরও কিছু থাকে এত কিছু সত্ত্বেও যার নাগাল বিজ্ঞান এখনও অবধি পায়নি। আর যাই হোক বিজ্ঞান কোনও দিন ল্যাবরেটরিতে মহাপুরুষ তৈরী করতে পারবে না। তবে এটাও ঠিক সেই সব মহাপুরুষের জীবনেই বড় পরিবর্তন এনেছিল কোনও একটা বিশেষ দিন। সেই দিন, সেই সময়, সেই পরিবেশ, সেই জায়গা ছিল একই রকম যার কথা তোমরাও এখন জেনে গেলে। তবে দেখো এসব কথা অপাত্রে বোলো না। মারধোর খেয়ে যেতে পারো।"

ছবি — দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

গল্পের ম্যাজিক::

রবিন জেঠুর ক্যামেরা

পুষ্পেন মণ্ডল

রবিন জেঠুর ক্যামেরাটা আমার হাতে এসেছিল অনেক গুলি হাত ঘুরে। ইনি বাবার ছোট বেলার বন্ধু ছিলেন। মাঝে দীর্ঘ দিন আমাদের সাথে কোনও যোগাযোগ ছিল না। তিনি মারা যাবার পর বাবা খবর পেয়ে এক বন্ধকি দোকান থেকে ক্যামেরাটা উদ্ধার করেছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন এক ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ। বাবা বললেন,"শুনেছিলাম এই নিকোম্যাটের জুম লাগান ক্যামেরাটি নেপালে এক সাহেবের কাছ থেকে কিনেছিলেন রবিন দা, বছর তিরিশেক আগে। শেষ জীবনে টাকার প্রয়োজনে হয়ত বন্ধক দিতে হয়েছিল।"

প্রায় দু থেকে আড়াই কেজি ভারি। পুরানো আমলের রিল লাগানো সিস্টেম। এখন ডিজিট্যাল যুগে এই ধরনের ক্যামেরা একেবারেই অচল। ম্যানুয়াল সেটিং জুম। ক্যাপ খুলে আইহোলে চোখ রাখতে ভেতরটা ঘোলাটে মনে হল। লেন্সের গায়ে ফাঙ্গাস পড়েছে বোধ হয়। কালো কালো ছোপ। বাবা এই পুরানো জিনিসটা কেন বন্ধকি দোকান থেকে ছাড়াতে গেলেন কে জানে? যাই হোক সেটা আসার পর থেকে বুক সেলফের এক কোণে পড়ে রইল অনেক দিন। এবং ক্রমশ স্মৃতির পলিতে চাপা পড়ে গেল।

ঘটনাটা ঘটল আমি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হবার পর। বোটানির এক্সকারসানে চার পাঁচদিনের জন্য গ্যাংটক যাব। যাবার দিন ট্রেন ছাড়ার দু ঘণ্টা আগে মৃণাল ফোন করে জানাল যে তার ডি.এস.এল.আর. ক্যামেরাটা গণ্ডগোল করছে। ছবি তোলার পর সেভ হচ্ছেনা। মনে হয় সার্কিটের কোনও সমস্যা। দোকানে না দিলে সারানো যাবে না।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, "এখন কী হবে? আমাদের গ্রুপে তো ঐ একটা ভালো ক্যামেরা। কী ছবি নিয়ে প্রোজেক্ট জমা দেব!"

এক্সকারসানের জন্য স্যার পাঁচজন করে এক একটা গ্রুপ করে দিয়েছেন। আমার সাথে আছে মৃণাল, সাহেব, অরিজিৎ আর তন্ময়। সে বলল, "আমিও তো চিন্তায় মরছি। অন্য সবাইকে ফোন করেছিলাম। ওরা বলল অর্ডিনারি ডিজিট্যাল ক্যামেরা ছাড়া কিছুই যোগাড় করা যাবে না। কিন্তু তাতে আর কত ভালো ছবি হবে? দূরের ছবি তো কিছুই আসবে না। তোর কোনও চেনা লোকের কাছে ভালো ক্যামেরা পাওয়া যাবে?"

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "ট্রেন ছাড়তে আর কত বাকি ভাই? এখন কাকে বলব? ব্যাগ গুছানো রেডি। আর কিছু হবে না। ফোন রাখ।"

বাবা শুনে বললেন, "তুই এক কাজ কর, রবিনদার ঐ পুরানো নিকোম্যাট ক্যামেরাটাই নিয়ে যা। এক সময়ে ঐ ক্যামেরাতেই দারুণ ছবি হয়েছে। আমি দেখেছি। টেকনিক্যালি পুরানো হলেও জাপানী জিনিস তো!"

তা শেষমেশ ঐ ক্যামেরার জন্য আমার লাগেজ আরও আড়াই কেজি ভারি হয়ে গেল। আর মনের মধ্যে থেকে গেল অস্বস্তি। ক্যামেরাটা তো নিলাম কিন্তু এর ঝামেলা অনেক। এর রিল এখন পাই কোথায়? আর রিল পেলেই হবে না সেটাকে ঠিকঠাক সেট করতে হবে। ফ্ল্যাশ গানের জন্য লাগবে চারটে পেনসিল ব্যাটারি।

রাত্রের ট্রেনে স্লিপার কোচে কলেজের ছেলেমেয়েদের হৈচৈ আর হুল্লোড়ে সে কথা ভুলে গেলাম। পরের দিন সকালে নিউজলপাইগুড়িতে নেমে ব্রেকফাস্ট সেরে বাসে করে সোজা গ্যাংটক। পাহাড়ের রাস্তায় গাড়ি উঠতেই মনটা ডানা মেলে উড়ে গেল দূরে ঝাউগাছ আর শাল, সেগুন, রডোডেনড্রনের জঙ্গলে। তারপর এলো চা বাগানের সারি। সবার হাতে ক্যামেরা। পটাপট ছবি তুলছে। আমার সম্বল এনড্রয়েড ফোন। জবর জং ক্যামেরাটা পড়ে রয়েছে লাগেজের সাথে বাসের পেটের মধ্যে। কাছে থাকলেও তাতে ছবি তোলা যেত না। রিল নেই। আর বন্ধুরা দেখলে নিশ্চয় টিটকিরি করত।

গ্যাংটকে যখন পৌঁছলাম দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সন্ধ্যাবেলা লাগেজ থেকে ক্যামেরাটা বের করে কাঁধে ঝুলিয়ে বের হলাম হাঁটতে। অনেক গুলি দোকানে খুঁজে শেষে এম.জি.মার্গের এক প্রান্তে এক নেপালি ভদ্র লোকের কাছে পেলাম ফুজি কোম্পানির একটা রিল। বত্রিশটা ছবি উঠবে এতে। তিনি নিজেই ক্যামেরাটা খুলে রিল ভরে দিলেন। আর বললেন, এই ধরনের ক্যামেরার ব্যবহার এখন অনেক কমে গেছে। খদ্দের পাওয়া যায় না। তবে জিনিসটা নাকি অ্যান্টিক। এখন এর সেকেন্ড হ্যান্ড দামও অনেক। তারপর ব্যাটারি ভরে ফিরলাম হোটেলে। দেখা যাক কাজ কতটা হয়। বন্ধুদের সাথে ফ্ল্যাশ গানে বেশ কয়েকটা ছবি তোলা হল। ডিজিট্যাল ক্যামেরায় যেমন রিওয়াইন্ড করে আগের তোলা ছবি দেখে নেওয়া যায়, এতে সে সুযোগ নেই। রিল পুরো শেষ করে ল্যাবে দিয়ে ওয়াশ করতে হবে। তবে ছবি দেখা যাবে।

বন্ধুদের সাথে হৈহৈ করে কাটল কটা দিন। প্রজেক্টের কাজে প্রতিদিন সকালে গ্যাংটক শহরের পাশে একটা গ্রামে যেতে হচ্ছে। অনেক নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা 'রোরোচু'। সেপ্টেম্বরের ঠাণ্ডাটা এখানে বেশ কড়া। আর মাঝে মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি। শেষ দিনে সেখানে নিরিবিলি জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট বুদ্ধিস্ট গুম্ফা আবিষ্কার করলাম আমরা। অসম্ভব সুন্দর নৈসর্গিক সেই পরিবেশ। পাথরের গায়ে খোদাই করা তিব্বতি ভাষায় 'ওম্ মণিপদ্মে হুম্!'। শুধু পাথর নয় গুম্ফার গায়ে, গোল ঘণ্টার উপর, সব জায়গায় লেখা ঐ একই মন্ত্র। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে জুতো খুলে আমরা প্রবেশ করলাম গুম্ফার ভেতরে। চন্দন ধূপের গন্ধে মম করছে। সোনালী রঙের বুদ্ধ মূর্তির সামনে একজন বয়স্ক মোটাসোটা লামা হলুদ রঙের

ফতুয়ার উপর লাল কাপড় জড়িয়ে ধ্যান করছেন। চোখ বন্ধ। প্রদীপ আর মোমবাতির আলোয় একটা ভৌতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ সাহেব "খ্যাঁক খ্যাঁক" করে হেসে উঠল। কী ব্যাপার? ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি সে আঙুল তুলে কিছু একটা দেখার জন্য বলছে। চোখ পড়ল লামার চকচকে ন্যাড়া মাথায় ঠিক ব্রহ্মতালুর উপরে একটা সাদা টিকটিকি চুপ করে বসে আছে। আশ্চর্য!!

"ওটা কি ওনার পোষা টিকটিকি? হিহি.. হিহি.." সাহেব বরাবরই এরকম ফাজিল। আমরা সবাই ইশারায় তাকে চুপ করতে বললাম। কিন্তু সে সমানে হেসেই যাচ্ছে।

আমি এর মধ্যে ক্যামেরা বের করে ফ্ল্যাশগানে একটা ছবি তুলে নিয়েছি। চকাৎ করে আলো লাগতে লামা চোখ খুলে তাকালেন। সাংঘাতিক সে চাউনি। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। আমরা তাড়াহুড়ো করে ওকে টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তাতেও সাহেবের হাসি আর থামছে না। গুম্ফা থেকে বেরিয়ে সরু পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম লামা বারান্দায় বেরিয়ে আমাদের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছেন যেন ভস্ম করে ফেলবেন।

গুম্ফাটা পেরিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে পাহাড়ের ঢালে ট্রপিকাল জঙ্গল থেকে আমরা কিছু নমুনা সংগ্রহ করতে গেলাম। প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতির গুল্ম পাহাড়ি ফুলের গাছ দেখা যায় এই অঞ্চলে। তার মধ্যে অর্কিড, প্রিমুলা, রডোডেনড্রন, বাঁশ, ওক, কনিফার, ফার্ন আর বহু করমের ঔষধি গাছ, সবই আছে। বড় গাছেদের মধ্যে আছে পাইন, ওক, শাল, সেগুন, চেস্টনাট, ম্যাপল প্রভৃতি। নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি আমার ক্যামেরা দিয়ে যথারীতি দরকার মত ছবি তুলে যাচ্ছি। জানিনা আদৌ ছবি গুলি কতটা ভালো উঠছে!

একটা ম্যাকাও প্রজাতির রংবাহারি পাখি চোখে পড়ল। তার ঘন নীল, রক্তিম লাল, গাড় হলুদ রঙে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। যত বার তাকে জুম করে ফোকাস করার চেষ্টা করছি, ততবার সে উড়ে এক গাছের ডাল থেকে অন্য গাছে চলে যাচ্ছে। আমরাও নাছোড়বান্দা হয়ে তার পিছু ধাওয়া করলাম। জঙ্গলের ঢালে এগোতে এগোতে বেশ গভীরে চলে গেলাম। প্রফেসার আর বাকি সবাই পিছনে পড়ে রইল।

এদিকের জঙ্গলটা আরও ঘন। নিস্তব্ধ বনে মাঝে মাঝে কাঠঠোকরার ঠকঠক ...ঠকঠক আওয়াজ, কিম্বা "চিহু.. চিহু.. চিহু.." করে অচেনা কোনও পাখীর ডাক। পায়ের নীচে বড় বড় ফার্ন আর ঝরা পাতাদের উপর জমা হওয়া শেওলার একটা বিশুদ্ধ বুনো গন্ধ। লম্বা লম্বা গাছেদের মাথা গুলি কুয়াশায় ঢাকা। হাঁটতে হাঁটতে অরণ্যের মুগ্ধতা অদ্ভুত নেশার মত গ্রাস করছে আমাদের। পাখীটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ নামল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা বাড়তে লাগল ক্রমশ। এই কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে বৃষ্টির ফোঁটা গুলি হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে একেবারে। আমাদের কাছে না আছে রেনকোট আর না কোনও ছাতা। দিশেহারা অবস্থায় চোখে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে একটা কাঠের বাড়ি। সবাই মিলে দৌড়লাম সেই দিকে। মাথাটা তো আগে বাঁচাতে হবে।

ভাঙাচোরা সিঁড়ি দিয়ে দুড়দাড় করে উঠে বারান্দায় দাঁড়ালাম। সবুজ শ্যাওলায় মোড়া কাঠের বাড়িটা বহু আগাছা শিকড় চালিয়ে আরও জরাজীর্ণ করে ফেলেছে। অরিজিৎ ভালো করে নিরীক্ষণ করে বলল, "এটা মনে হয় কোনও ইংরেজ আমলের তৈরি পরিত্যক্ত বাড়ি।" মৃণাল আরও উৎসাহ দেখিয়ে কাঠের শ্যাওলা ধরা

দরজায় জোরসে একটা ধাক্কাদিয়ে গটগট করে ভেতরে ঢুকে গেল। বলল, "দেখি কোনও সাহেব ভূতকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা!" শব্দ শুনে দুটো বড় বুনো বাদামী রঙের বেড়াল পালালো জানালা দিয়ে লাফ মেরে। "আমি তো এখানে, আমাকে আবার কোথায় খুঁজতে যাচ্ছিস?" সাহেব চেঁচিয়ে জানান দিল। "আরে তোর মত সাহেব নয়, আমি খুঁজছি ইংরেজ সাহেবের ভূত। এই সব পড়ে থাকা পুরানো বাড়িতে মাঝে মধ্যে তাঁদের দেখা পাওয়া যায়।"

ওদের পিছন পিছন ভেতরে ঢুকলাম। ছাদ থেকে ঝুলছে বেশ কটা বাদুড়। স্যাঁতস্যাঁতে কাঠ পচা গন্ধ। মাকড়শার জাল দেয়ালের কোণ গুলি ছেয়ে ফেলেছে।

তন্ময় বলল, "এটা নিশ্চয়ই শিকারের জন্য কেউ তৈরি করেছিল।"

"হ্যাঁ, হতে পারে। এই অঞ্চলে হিমালয়ান লেপার্ড আগে অনেক ছিল।" সাহেব বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল।

"আরে, তুই তো আগের জন্মে শিকারে আসতিস। মনে নেই?" মৃণাল টিটকিরি মারল তাকে।

"বাজে কথা বলবি না।"

অরিজিৎ বলল, "সেই টিকটিকি লামাকে দেখে ওরকম হাসছিলি কেন? টেনে না নিয়ে আসলে সে তোকে ভস্মই করে দিত।"

"অতোই সোজা? আমাকে কি ও পাহাড়ি বোকা হাঁদা ছেলে মনে করেছে, যে কটকট করে তাকালেই ভয় পেয়ে যাব? এই সব ভন্ড সাধুদের আমি খুব চিনি। আমার তো মনে হয় ঐ টিকটিকিটা নকল।"

মৃণাল সাহেবকে সমর্থন করে বলল, "হ্যাঁ হতেই পারে। অসম্ভব কিছু নয়। এই সব অশিক্ষিত লোকেদের বোকা বানানোর কত রকম উপায় যে এরা বার করে।"

আমি বললাম, "ভূতের দেখা পাওয়া যাবে কিনা জানি না। তবে সাপের দেখা পাওয়া যেতে পারে।"

"পাহাড়ি সাপ প্রচণ্ড ক্ষিপ্র আর বিষাক্ত হয় শুনেছি।" তন্ময় বলল। "এ জায়গা থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়া যায় তত ভালো।"

অরি বলল, "কিন্তু বাইরে তো ঝমঝমে বৃষ্টি। এখুনি তো থামবে না।"

"সাপ শীতল রক্তের প্রাণী। এত ঠাণ্ডার জায়গায় থাকবে বলে মনে হয় না। তবে পাইথন জাতীয় সাপ থাকলেও থাকতে পারে।" সাহেব জানাল।

মৃণাল বলল, "সাপেরা পায়ের আওয়াজ বুঝতে পারে। আমরা যদি লাফালাফি করি তাহলে তার ভাইব্রেশানে যদি কাছাকাছি কোনও সাপ থাকে তাহলে সরে যাবে।" বলেই সে লাফাতে শুরু করল। আর তার দেখাদেখি বাকি তিনজনও লাফাতে লাগল।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটল সাংঘাতিক। মেঝেটা পুরো কাঠের পাটা জুড়ে জুড়ে তৈরি। আর পুরানো কাঠে ঘুণ ধরেছিল নিশ্চয়ই। মচাৎ করে একটা পাটা মাঝখান থেকে ভেঙে চোখের পলকে একটা আর্ত চিৎকার করে সাহেব ঢুকে গেল ভেতরে। আমরাও পরিত্রাহি স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম। নীচেটা অন্ধকার। এমনিতেই মেঘলা দিনে আলো কম। আমাদের কাছে টর্চও নেই।

"আ.. আ.." করে ভয়ার্ত চিৎকার আসছে সাহেবর গলা থেকে।

কাঠের ভাঙা পাটাটা সরিয়ে মৃণাল গলা ফাটিয়ে বলল, “সাহেব, ঠিক আছিস তুই? আমি নীচে নামছি।”

সে যেন কিছুই শুনতে পেল না। চিৎকার করেই যাচ্ছে। মনে হয় ভয় পেয়েছে খুব। আওয়াজটা আসছে অনেক নীচে থেকে। কাউকে যে ফোন করে সাহায্য চাইব তারও উপায় নেই। দেখলাম আমাদের কারোর ফোনেই কোনও টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথমে মৃণাল নামল। তারপর আমি। বাকিদের উপরেই থাকতে বললাম। কাঠের পাটার মধ্যে দিয়ে শরীরটা কোনও রকমে গলিয়ে সাবধানে নেমে দেখলাম, বাড়িটার ঠিক নীচে পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার মুখ। শ্যাওলায় এতোই পিচ্ছিল যে মৃণাল পা রাখার সাথে সাথেই শরীরের ব্যালেন্স হারিয়ে সড়াৎ করে ঢুকে গেল ভেতরে। আর আমার জ্যাকেট আঁকড়ে ধরার জন্য আমিও টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম গর্তের মধ্যে। উপর থেকে পড়ার সময়ে মাথাটা গিয়ে লাগল একটা পাথরে। ঝিমঝিম করে উঠল। তারপর ব্ল্যাক আউট।

..... যখন জ্ঞান ফিরল দেখি জল কাদার মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। চারিদিকে অন্ধকার। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। হাত দিয়ে দেখলাম কানের পাশে রক্ত চিটচিট করছে। সামান্য আলো আসছে উপর থেকে। গুহার মুখটা আনুমানিক তিরিশ ফুটের মত উপরে। নীচে থেকে ওঠার কোনও উপায় নেই। গা জলকাদা আর শ্যাওলায় মোড়া। অন্ধকারে চোখটা সয়ে যেতে দেখলাম ভেতরের দিকে গুহার একটা পথ ঢুকে গেছে। বাকি দুজন গেল কোথায়? “সাহেব.... মৃণাল...।” চিৎকার করে ডাকলাম। কোনও প্রত্যুত্তর নেই। আবার গুহার উপরের দিকে মুখ করে চেঁচালাম, “অরি.... তন্ময়...।” উপর থেকেও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। ভয় পেয়ে গেলাম খুব।

ভাবলাম সাহেব আর মৃণালও তো নীচে পড়ে গিয়েছিল। ভেতর দিয়ে কি তাহলে কোনও রাস্তা আছে? কিন্তু ওদিকটা খুবই অন্ধকার। পকেট হাতড়ে এ্যনড্রয়েড ফোনটা বের করলাম। দেখলাম এটা কাজ করছে। টর্চ মোডে দিতেই অনেকটা আলো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। ক্যামেরার ব্যাগটা আমার কাঁধেই ঝোলানো ছিল। সেটা নিশ্চয়ই পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে চুরে গেছে।

ধীরে ধীরে ভেতর দিকে এগোলাম। গুহার হাইটটা কম। মাথা নীচু করে হাঁটতে হচ্ছে। নরম মাটিতে দু জোড়া জুতোর ছাপ স্পষ্ট। তার মানে ওরা এদিকেই গেছে। এ পাহাড় পাললিক শিলায় তৈরি। কাদা মাটি বেশি। কত লক্ষ বছর আগে এই হিমালয় পর্বতমালার জায়গায় টেথিস সাগর ছিল। ইউরেশিয়ান প্লেট আর ভারতীয় প্লেটের সংঘর্ষের ফলে এই চেহারা নিয়েছে। জল পড়ে এই পাললিক শিলাগুলি নরম হয়ে আছে। গুহার ভেতরের দিকে যত ঢুকছি, মনে হচ্ছে যেন এটা প্রকৃতিক গুহা নয়। এই রাস্তা কেউ বানিয়েছে। গুহার উপর নীচে, চারিদিকে মাটি আঁচড়ানোর দাগ। ভালো করে দেখলাম চারটে নখের আঁচড়। এবং সে গুলি বেশ মোটা আর তীক্ষ্ণ। সাম্প্রতিক তৈরি হয়েছে এই রাস্তা। যে বা যারা এটা খুঁড়েছে তারা মানুষ বলে মনে হয় না। নীচে লক্ষ করলাম চার আঙুল ওলা বড় বড় পায়ের ছাপ। ভয়ে হাত-পা কাঁপছে। একি কোনও প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর আস্তানা? হিংস্র বা মাংসাশী প্রাণী হলে মৃত্যু অনিবার্য। বেরুনোর পথ তো একটাই, পিছনে ফেলে

এসেছি। সেখান থেকে বাইরের সাহায্য ছাড়া উপরে ওঠা আমার সাধ্য নয়। অতএব এদিকেই এগোতে হবে। যদি অন্য কোনও রাস্তা পাওয়া যায়। ভয়ে ভয়ে এগোলাম।

বেশ কিছুদূর গিয়ে রাস্তাটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। চিন্তায় পড়ে গেলাম। কোন রাস্তা ধরব? ডানদিকেরটা দেখলাম সামান্য উপর দিকে উঠেছে। হয়ত এটাই পাহাড়ের গা দিয়ে বের হবার রাস্তা। সবে ভাবছি সেদিকেই যাব এমন সময়ে একটা চিৎকার! মৃণাল আর সাহেবের গলা। আওয়াজটা ডানদিকের গুহা থেকেই আসছে। পরিত্রাহি স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে হুড়মুড় করে এসে পড়ল ওরা। আমাকে দেখে বলল, "পালা.. পালা..এই দিকে।" দৌড়াতে শুরু করলাম তাদের সাথে। দ্বিতীয় গুহায় ঢুকে প্রাণ ভয়ে দৌড়চ্ছি। কী তাড়া করছে পিছনে? সেটা আর জিজ্ঞাসা করা হল না। পিছন দিক থেকে একটা বিদঘুটে কান ফাটানো শব্দে সারা শরীর শিরশির করে উঠল। এরকম ডাক কোনও পার্থিব জন্তুর হতে পারে বলে আমার ধারণা নেই। একটা গরম হাওয়া পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারছে। অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে দেখছি এক জোড়া জ্বলজ্বলে ভয়ঙ্কর লাল চোখ। হঠাৎ কী মাথায় এলো, হাতের কাছে অন্য কিছু না পেয়ে কাঁধ থেকে ঐ ভারি ক্যামেরাটা খুলে ছুড়ে মারলাম ঐ জ্বলন্ত চোখ লক্ষ করে।

তারপর অনেকক্ষন ধরে হ্যাঁচোর প্যাঁচর করে জল কাদা মেখে এঁকেবেঁকে সেই গুহা পথটা ধরে দৌড়ানোর পর সামনে একটা ক্ষীণ আলো চোখে পড়ল। পিছনের আওয়াজটা তখন কমে এসেছে। শেষে একটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে বাইরে বের হলাম আমরা। দেখলাম দিনের আলো কমে গেছে আর বৃষ্টিও বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এ কোন জায়গা? জঙ্গল এখানে অনেকটা ফাঁকা ফাঁকা। পাহাড়ের একদম নীচে। কিছুটা দূরে ছোট বড় পাথরের পাশ দিয়ে কলকল করে বয়ে চলেছে একটা জলস্রোত। চোখে মুখে জল দিয়ে আর অনেকটা জল খেয়ে পাশেই নুড়ি বিছানো তীরে হাঁপিয়ে শুয়ে পড়েছি আমরা। আশা করি এখানে খোলা জায়গায় আর সেই জন্তুটা তাড়া করবে না। আর যদি তাড়া করেও তাহলে আমাদের পালাবার ক্ষমতা আর নেই।

আমি উৎকণ্ঠার সাথে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী জিনিস ছিল ওটা?"

সাহেব ঢোক গিলে বলল, "জানিনা... আমরাও দেখিনি। শুধু ভয়ঙ্কর আওয়াজে আমাদের পিলে চমকে গেছে।"

মোবাইলে দেখলাম সাড়ে ছটা বাজে। এবং ভাগ্য ভালো এখানে টাওয়ার আছে। ফোন করলাম প্রফেসারকে।

"কোথায় তোমরা?" তিনি উৎকণ্ঠার সাথে জানতে চাইলেন।

বললাম, "পাহাড়ের নীচে নদীর ধারে শুয়ে আছি। অন্ধকার হয়ে আসছে। রাস্তা চিনে ফিরতে পারব না।"

তিনি বললেন, "ওখানেই থাকো। আমি গ্রামের লোকেদের নিয়ে নামছি।"

আস্তে আস্তে সূর্যের আলো চলে গেল। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চারিদিকে। তখন ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছি আমরা। জানিনা কী আছে কপালে। ভয়ে বার বার ফোন করছি শুধু। শেষে অনেক প্রতীক্ষার পর জঙ্গলের

মধ্যে দিয়ে চার পাঁচটা টর্চের আলো দেখে ধড়ে প্রাণ এলো। অন্ধকারের মধ্যে স্যারের সাথে এগিয়ে এলো অরি আর তন্ময়। পিছনে বেশ কিছু লোকের সাথে পুলিশও আছে।

হোটেলে পৌঁছাতে রাত দশটা হয়ে গেল। মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে হসপিটাল থেকে। গরম জলে গা হাত ধুয়ে খাওয়া সেরে বিছানায় গিয়ে উঠলাম। বাকি ঘটনা অরি আর তন্ময় ভাগাভাগি করে বলল। যা শুনলাম তাতে চুল আরও খাড়া হয়ে গেল।

আমরা গর্তে পড়ে যাবার পর ওরা বৃষ্টির মধ্যেই প্রাণপণে দৌড়েছে উপরে খবর দিতে। আবার জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে অনেক দেরিও হয়েছে পৌঁছাতে। গ্রামের লোকেদের ডেকে নিয়ে এসে যখন আবার সেই কাঠের বাড়িটায় পৌঁছেছিল ওরা, তখন অবাক হয়ে দেখে মেঝেতে কোনও কাঠও ভাঙেনি। আর বাড়িটার নীচেও কোনও গুহা বা গর্ত নেই। হাজার বোঝানোর চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। সবাই ভেবেছে কোনও কারণে এরাই মিথ্যা কথা বলছে। শেষে খোঁজার জন্য পুলিশেও খবর দেওয়া হল। কিন্তু গোটা জঙ্গলে সারাদিন চিরুণী তল্লাশি করেও কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ ওদেরকে জেরা করার জন্য থানায় নিয়ে যাচ্ছিল তখনই ফোন আসে আমাদের। শুনে আমরা গুম খেয়ে গেলাম। এটা কি কোনও অলৌকিক ফাঁদ? না স্বপ্ন? তাই বা হয় কী করে? আমার মাথা তো সত্যি সত্যি ফেটেছে। তবে কি সেই লামার প্রতিশোধ? মায়াজাল?

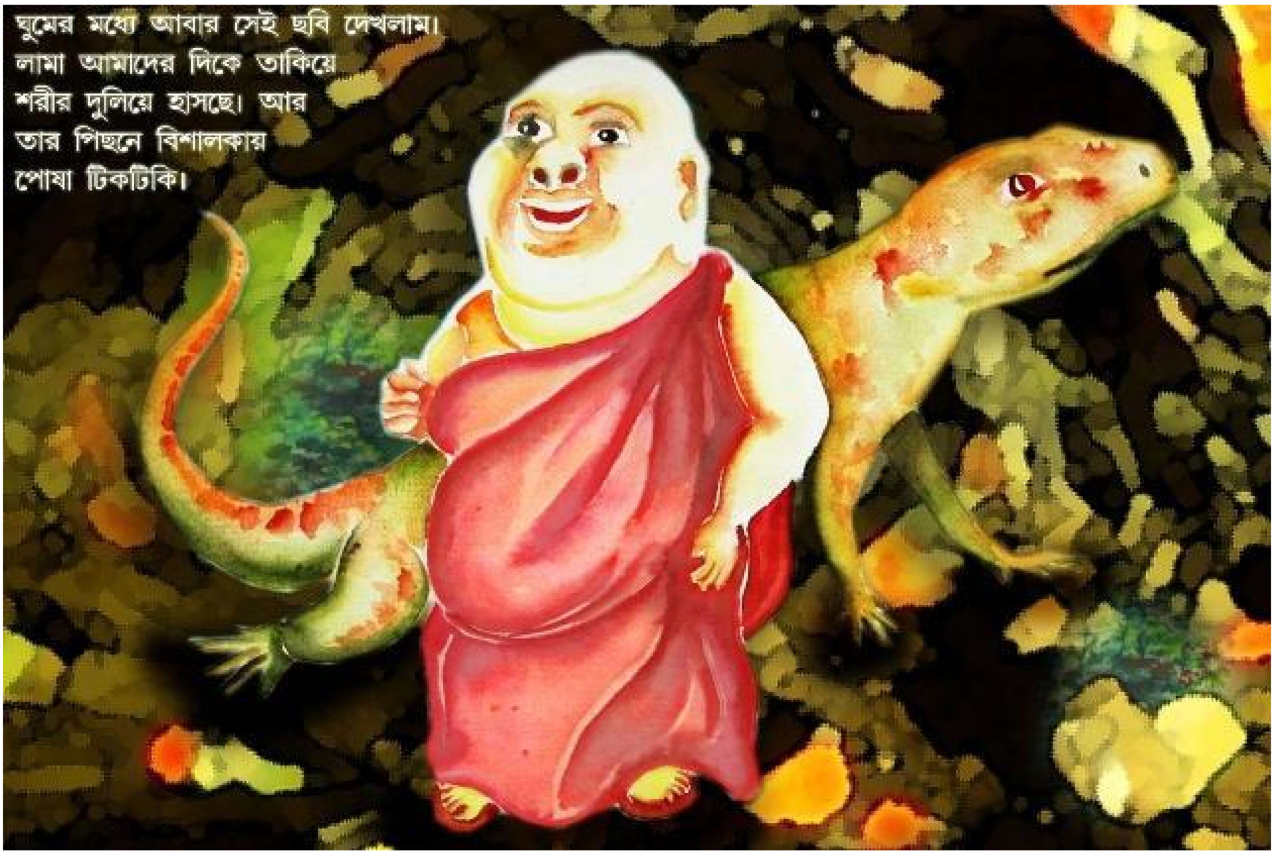

"আমার ক্যামেরাটা গেল!" আমি অনেকক্ষন চুপ করে থাকার পর আক্ষেপের সুরে বললাম।

অরি জিজ্ঞাসা করল, "সেটা কখন হারালি?"

"হারায়নি। আমরা যখন প্রাণ ভয়ে দৌড়চ্ছি, আর ঐ জন্তুটা ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে, তখন ক্যামেরাটা ছুঁড়ে মেরেছিলাম।"

"তার মানে ক্যামেরাটার জন্যই তোরা বেঁচে গেছিস।" তন্ময় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল।

ঘুমের মধ্যে আবার সেই গুহার ছবি দেখলাম। লামা আমাদের দিকে তাকিয়ে শরীর দুলিয়ে হাসছে। সেকি অট্টহাসি! আর তার পিছনে বিশালকায় পোষা টিকটিকি। তার লাল জবা ফুলের মত চোখ, থেকে থেকে শুধু ল্যাজ নাড়ছে। শীতের রাতে আমরা সবাই ঘেমে অস্থির। কিন্তু সবাই একই স্বপ্ন কী করে দেখলাম?

পরের দিন সকালেই ফেরা। হোটেলের নীচে বাস দাঁড়িয়ে হর্ন দিচ্ছে। লাগেজ গুছিয়ে চেক আউট করার সময়ে ম্যানেজার ডেকে বলল, "একটা ক্যামেরা কেউ ফেলে যাচ্ছে। রুমের মধ্যেই পড়েছিল।"

আমি দেখে অবাক। এটা তো আমার ক্যামেরা। রুমে এলো কখন? বাসে বসে লক্ষ করলাম, সবই ঠিক আছে শুধু চামড়ার কভারে চার আঙুলের তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়।

মাথাটা ভোম হয়ে কলকাতায় ফিরলাম। সেই ঘোর কাটতে আরও মাসখানেক সময় লাগল। এর মধ্যে কবে না জানি বাবা ক্যামেরা থেকে রিলটা বের করে ওয়াশ করতে দিয়ে এসেছিলেন। কদিন পরে ছবি গুলি যখন নিয়ে এলেন অবাক হয়ে দেখলাম, এত সুন্দর ছবি অনেক দামী ডিজিট্যাল ক্যামেরাতেও হয় না। প্রতিটা ছবি যেন বাঁধিয়ে রাখার মত। ভারী জিনিসটা ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া সার্থক হল।

শুধু একটা ছবিতে চোখটা আটকে গেল। গুম্ফার মধ্যে তোলা ছবিটাতে সোনালী বুদ্ধের নীচে শুধু একটা মোটাসোটা টিকটিকি। লামা কোথায়?

অলঙ্করণ – লেখক

গল্পের ম্যাজিক::

কালো বিড়াল কাণ্ড

শিশির বিশ্বাস

ভোর সকালে বাড়ির কাজের মেয়ে মানদা আবর্জনার বালতি নিয়ে সবে নীচে সিঁড়ির দরজা খুলেছে, তারপরেই হাউমাউ চিৎকার, 'হেই মা, কী অলক্ষুণে কাণ্ড গো!'

বসার ঘরে বাবা তখন সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছেন। মা কাজে ব্যস্ত। মানদার সেই চিল চিৎকারে সব ফেলে ছুটলেন। বাদ থাকেনি পাপুনও। তারপর ব্যাপার দেখে অবাক। সিঁড়ির মুখে কালো রঙের ছোট এক তুলতুলে বিড়ালছানা। সন্দেহ নেই, খানিক আগে কেউ পাঁচিল টপকে ফেলে গেছে। ইতিমধ্যে সেটা সিঁড়ির কাছে চলে এসেছে। দরজা খোলার আওয়াজে টালমাটাল পায়ে বাচ্চাটা আরও এগিয়ে আসছিল, আঁতকে উঠে মানদা কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ওইটুকু এক বিড়ালছানা, দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছে হয়, তাকে এত ভয় পাওয়ার কী আছে, পাপুন বুঝে উঠতে পারল না। অবাক হয়ে বিড়ালছানাটার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল, মা হাউমাউ করে উঠলেন, 'পাপুন, যাসনে ওদিকে। মানদা, লক্ষ্মী মা আমার, আপদটাকে এখুনি বাইরে ফেলে আয়।'

'কী সব্বনেশে কতা গো!' মায়ের কথায় মানদা প্রায় আঁতকে উঠল। 'ও আমি পারব না মা। কেটে ফেললেও না।'

দু'জনের কথায় ততক্ষণে ব্যাপারটা খানিক বোধগম্য হয়েছে পাপুনের। তবে কী কারণে বিড়ালছানাটা অলক্ষুণে, বুঝে উঠতে পারেনি। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতেও ভরসা হচ্ছিল না। ওপাশে বাবার দিকে তাকাল। বাবা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভয়ানক দোটানায় রয়েছেন। সামান্য ইতস্তত করে শেষে বললেন, 'ওইটুকু বাচ্চা, এখনই এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে রমলা? ঘরে তো আর যায়নি।'

'কী বলছ তুমি!' বাবার কথায় মা প্রায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তাই বলে ওই অলক্ষুণে জিনিস বাড়িতে থাকবে! তুমি বাপু যে করেই হোক কাউকে ডেকে বিদেয় করো। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর।'

এরপর বাবার যে আর মতামত নেই, বিলক্ষণ জানে পাপুন। বিড়ালছানাটার পরিণতির কথা ভেবে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। এই যখন অবস্থা, তখন দাদুর আবির্ভাব। চ্যাঁচামেচির শব্দে কখন যে নেমে এসেছেন, লক্ষ করেনি কেউ। হঠাৎ বললেন, 'বউমা, থাক না এখন। একটু বড় হলে আপনিই চলে যাবে।'

এ বাড়িতে দাদুর উপর কেউ কথা বলে না। মা'ও কিছু বলতে পারেননি। খানিক গুম হয়ে থেকে চলে গিয়েছিলেন। বিড়ালছানাটাকে তাই আর বিদেয় হতে হয়নি।

মা নিজেও হয়তো আশা করেছিলেন, বিড়ালছানাটা নিজেই বিদেয় হয়ে যাবে। তবে তাঁর অনুমান সঠিক হয়নি। বিড়ালছানাটা রয়েই গেছে বাড়িতে। শুধু তাই নয়, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দিন দিন শশীকলার মতো বেড়েও উঠেছে। সেই রহস্যের কারণ অবশ্য দাদু আর পাপুন ছাড়া কেউ জানতে পারেনি। আসলে এই বাড়িতে দু'জনের সম্পর্ক প্রায় বন্ধুর মতো। অতি সংগোপনে দু'জনের সহযোগিতাতেই যে ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এমনকী একটা নামও দেওয়া হয়েছে। ভূতের মতো কালো বলে ভুতো নামটা পাপুনই দিয়েছে।

মা অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে পরে আর তেমন উচ্চবাচ্য করেননি। কারণও আছে। চতুর বিড়ালছানাটা এরপর কোনও দিনই আর ঘরের চৌকাঠ মাড়ায়নি। যতদিন ছোট ছিল, আস্তানা ছিল সিঁড়ির নীচের খুপরি ঘর। এখন সারা দিন প্রায় বাইরেই কাটে। দেখা মেলে কদাচিৎ। ব্যাপারটা তাই এখন থিতিয়ে গেছে। পাপুন পরে দাদুর কাছেই শুনেছে, কালো রঙের বেড়ালের নাকি মোটেই সুনাম নেই। ছোট এই প্রাণীটিকে নিয়ে সারা পৃথিবীতেই ভয়ানক সব গল্পকথা ছড়িয়ে আছে। তাবড় তাবড় লেখকরাও কালো বেড়াল নিয়ে হাড় হিম করা কাহিনী লিখে গেছেন। সেসব গল্পের কয়েকটা গত পুজোর ছুটিতে দাদুর কাছেই শুনেছে পাপুন। মাকে তাই দোষ দিতে পারে না। তারপর গত কয়েক মাসে ভুতোকে নিয়েও তো কম কাণ্ড হয়নি।

একদিন এক মজার ব্যাপার ঘটেছিল। সেদিন সাতসকালে এক ভদ্রলোক মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল ভুতো। প্রায় আঁতকে উঠে ঘ্যাঁস করে ব্রেক চাপলেন তিনি। খানিক থম মেরে থেকে পিছিয়ে গেলেন কয়েক পা। তারপর ফের এগোতে গিয়েও কী ভেবে বাইক ঘুরিয়ে যে দিক থেকে এসেছিলেন, ফিরে গেলেন সেই পথে। বোধ হয় সোজা বাড়ি, নয়তো অন্য কোনও পথে গন্তব্যস্থানের দিকে।

এসব মাস কয়েক আগের কথা। সম্প্রতি স্কুলে গরমের ছুটি চলছে। এই দিনগুলোতেই দাদুকে কাছে পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে দুপুরের দিকে। কত গল্প হয় দু'জনে। কত শলাপরামর্শ। কিন্তু এবার সব মাটি হয়ে গেছে। আসলে দাদু এবার হঠাৎই মণিকাকুর কাছে বেড়াতে গেছেন। মণিকাকু মুম্বাইতে চাকরি করেন। সুতরাং বলাই যায়, মাস খানেকের আগে তাঁর ফেরবার আশা নেই। দাদুর অভাবে পাপুনের দুপুরগুলো তাই একেবারেই নীরস। সময় যেন কাটতেই চায় না। এর মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

শুরু দিন তিনেক আগে। সেদিন লোকটা হঠাৎই পাপুনের নজরে পড়ে গিয়েছিল। এমনিতে দুপুরের দিকে ওদের এই গলি প্রায় নির্জন। দু'একজন হকার ছাড়া মানুষ প্রায় দেখাই যায় না। নতুন বসতি। তাই বাড়ির

সংখ্যাও তেমন বেশি নয়। পথে যাদের দেখা যায়, তাদের বেশির ভাগই পরিচিত। কিন্তু এই লোকটা নতুন। পরনে আধময়লা প্যান্ট। ছোট করে ছাঁটা চুল। মুখ ভরতি অবিন্যস্ত দাড়ি। হাতে ছোট একটা থলে। হঠাৎ দেখলে মিস্ত্রি গোছের বলেই মনে হয়। প্রথম দিন পাপুনও তাই ভেবেছিল। কিন্তু পরের দিন তেমন মনে হয়নি। অতি ধীর পদক্ষেপে চলতে চলতে লোকটা আড় চোখে যেভাবে দু'পাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকাচ্ছে, রীতিমতো সন্দেহজনক। ওদের বাড়িও বাদ যায়নি। পাপুন তখন দো'তলার জানলার সামনে বসে। আড়াল নেবার জন্য, পর্দার পিছনে সামান্য সরে গিয়েছিল। একটু করে ফের যখন পর্দার আড়াল থেকে বাইরে তাকাল, লোকটাকে আর দেখতে পায়নি।

মাস কয়েক আগে এই পাড়াতেই এক বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। বাধা দিতে গিয়ে খুনও হয়েছে একজন। অথচ সন্দেহ হলেও ব্যাপারটা ও বলতে পারেনি কাউকে। বাবা দিন কয়েক বাড়িতে নেই। অফিসের কাজে বাইরে। এমন মাঝে-মধ্যেই যেতে হয় তাঁকে। দাদু বাড়ি থাকলে ভাবনা ছিল না। এছাড়া বাকি থাকে মা। কিন্তু তাঁকে বলতে গিয়েও ভরসা হয়নি। হয়তো ঘাবড়ে গিয়ে আরও অনর্থ করবেন। তাই চেপেই গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত যে এতদূর গড়াবে, ভাবতেই পারেনি।

আজ দুপুরে মা-ও বাড়িতে নেই। ছোটমেসো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। তাঁকে দেখতে গেছেন। ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। বাড়িতে সে আর কাজের মানুষ মানদামাসি। দুপুরে দো'তলার ঘরে বসে ও আনমনে একটা গল্পের বই উলটে দেখছিল। হঠাৎ জানলা দিয়ে নীচে রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই ভুরু কুঁচকে উঠল। সেই লোকটা। হাতে সেই থলি। তবে সঙ্গে আরও দু'জন। তাদের কারও চেহারাই তেমন সুবিধের নয়। কেমন বেপরোয়া ভাব। এগিয়ে আসছে এদিকে।

আজও পথে অন্য মানুষ নেই। তবু লোকগুলো আড়চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। রীতিমতো সন্দেহজনক।

পাপুন ডিটেকটিভ গল্পের পোকা। ফেমাস ফাইভ সিরিজের বই পেলে হুঁশ থাকে না। ফেলুদার কোনও বই পড়তে বাকি নেই। এই বছর স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য একটা গোয়েন্দা গল্প লিখেছিল। ছাপাও হয়েছে। সেই গল্পের গোয়েন্দা দুষ্মন্ত দত্ত যত বাহাদুরিই দেখাক, তার স্রষ্টা শ্রীমান পাপুনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছ্যাঁত করে উঠল। লোকগুলোকে দেখে ওর মনে হচ্ছিল, খারাপ কিছু একটা ঘটাবে বলেই বেরিয়েছে। ঠিক ওই সময় হুস করে একটা হলুদ রঙের ট্যাক্সি ওদের বাড়ির অদূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখে একটু ভরসা পেল ও। পাড়ার পরিচিত কেউ নিশ্চয়। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে ট্যাক্সিটা সেইভাবে দাঁড়িয়েই রইল। কেউ নামল না। ব্যাপারটা কী হতে পারে ভাবছে, হঠাৎ লোকগুলোর দিকে চোখ পড়তে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

কী সর্বনাশ! লোকগুলো যে ওদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। পাপুনের মগজের ভিতর সেদিনের ব্যাপারটা হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। বুঝতে বাকি রইল না, আগের দিন ও জানলার পর্দার আড়ালে সরে যাবার পরে লোকটা গেট খুলে ঢুকে পড়েছিল ওদের বাড়িতেই। পরে তাই আর দেখতে পায়নি। মণিকাকু মুম্বাই চলে যাবার পরে নীচতলা তালাবন্ধ। কেউ থাকে না। লোকটা তাই যথেষ্ট সময় নিয়ে খোঁজ খবর করে গেছে। সন্দেহ নেই, হলুদ ট্যাক্সিটাও ওদের। সব ব্যবস্থা পাকা করেই আজ দলবল নিয়ে এসেছে। ভাবতে গিয়ে পাপুনের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। মানদামাসি তার ঘরে ঘুমোচ্ছে। লোকগুলো হয়তো একটু পরেই সিঁড়ির বেল টিপবে। তার আগেই তাকে সতর্ক করা দরকার। কিন্তু যা ভিতু মানুষ, কীভাবে

কথাটা তার কাছে পাড়বে, ভেবে উঠতে পারল না। পাপুন টের পেল, ওর বুকের ভিতরটা শুকিয়ে আসছে ক্রমশ। মাথাটাও কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে লোকগুলো ইতিমধ্যে ওদের গেটের কাছে এসে পড়েছে। লোহার গেট হ্যাসবোল্ট টেনে ভেজানো। সবার পিছনে দাঁড়ানো দাড়িওয়ালা লোকটা চারপাশে একবার চোখ ঘোরাল। তারপর চোখ নাচিয়ে ইঙ্গিত করতেই সামনে নীল টি–শার্ট করা লোকটা হাত বাড়িয়ে বন্ধ গেটের হ্যাসবোল্ট টেনে খুলে ফেলল। টুং করে একটু শব্দ হল। আর তারপরেই নিমেষে এক ব্যাপার ঘটে গেল। গেটের মাথায় মাধবীলতার ঝাড়ে ঢাকা ছোট এক সান-শেড। ভুতো সম্ভবত তারই ছায়ায় শুয়ে ছিল। হঠাৎ আওয়াজে গা—ঝাড়া দিয়ে উঠে লাফিয়ে পড়ল নীচে। সম্ভবত হিসেবের ভুলে একেবারে নীল টি—শার্টের ঘাড়ের উপর।

‘হাঁই বাপ!’ বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে লোকটা টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল মাটিতে। দ্রুত ডান হাত চলে গেল পকেটের ভিতর। ঘাবড়ে গিয়েছিল ভুতোও। তবু আত্মরক্ষার তাগিদে দাঁত—মুখ খিঁচিয়ে ‘ফ্যাঁস’ করে সামান্য ফুঁসে উঠেই ছুটে রাস্তা পার হয়ে হাওয়া।’

বেড়ালের ধারাল নখে ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। তাই নিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল একটু পরেই। হাতটাও বের করে নীল শার্ট পকেট থেকে। ভীত চোখে অন্য দু’জনের দিকে তাকাল।

আকস্মিক এই ঘটনায় তারাও পিছিয়ে গিয়েছিল কয়েক পা। পাপুন তাকিয়ে দেখল, তাদের মুখেও আতঙ্কের কালো ছায়া। প্রথমজন ওদের দিকে তাকাতেই দাড়িওয়ালা চোখ নাচিয়ে বলল, ‘হাই বাপ! জলদি সে ভাগ হিয়াঁসে।’

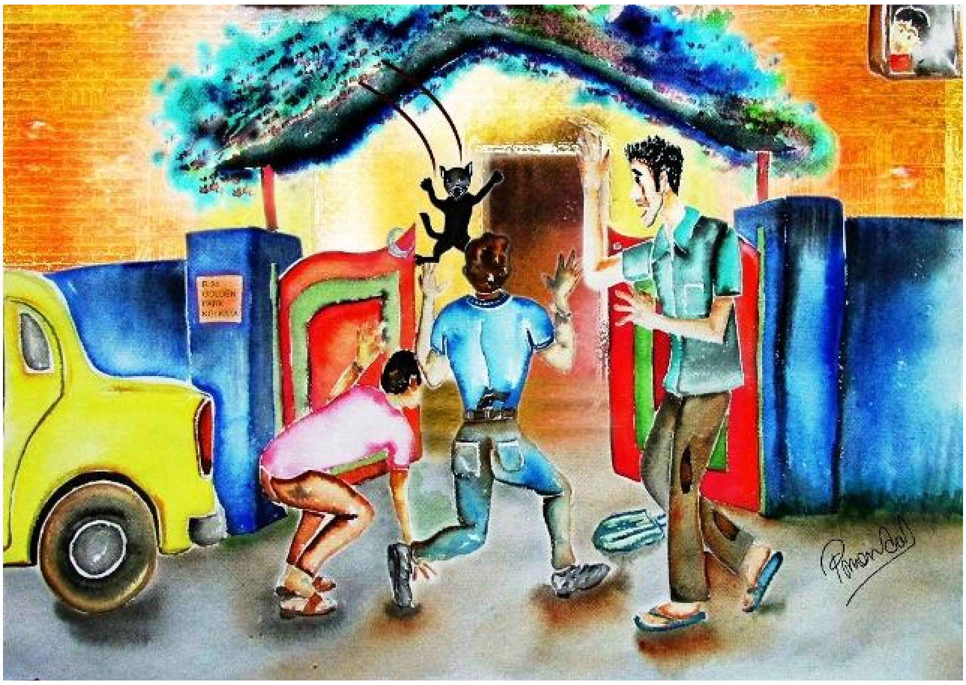

এক মুহূর্ত দেরি না করে তিনজন ছুটল অদূরে সেই হলুদ ট্যাক্সির দিকে। দরজা খুলে উঠে বসতেই নিমেষে ছেড়ে দিল সেটা। ট্যাক্সিটা বাঁকের আড়ালে হারিয়ে যেতেই পাপুন এক ছুটে পাশে দাদুর ঘরে। গোড়ায় যতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিল, ভুতোর দৌলতে আকস্মিক পট পরিবর্তনের পরে এখন ততটাই চাঙ্গা। গোয়েন্দা দুষ্মন্ত দত্তর মতো মাথাটাও বেশ কাজ করতে শুরু করেছে। এই পথে ট্যাক্সিকে বড় রাস্তায় পড়তে হলে রথতলার মোড় হয়ে যেতে হবে। মাস কয়েক আগে সেই ডাকাতির ঘটনার পরে ওখানে পুলিশের নতুন এক

আউটপোস্ট হয়েছে। এখন দরকার ওদের টেলিফোন নম্বরটা। দাদুর টেবিলে ইনডেক্স করা একটা টেলিফোন ডায়েরি রাখা থাকে। নতুন কোনও দরকারি নম্বর পেলেই দাদু লিখে রাখেন। হয়তো এই নম্বরটাও লেখা আছে। দাদুর ঘরে পৌঁছে সেটার পাতা ওলটাতেই পাপুন যথাস্থানে পেয়ে গেল নম্বরটা। এখন আর একটি কাজই শুধু বাকি।

দ্রুত ডায়াল করতেই ওধার থেকে জবাব এল। পাপুন ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'পুলিশকাকু, আমি বি–২৪ গোল্ডেন পার্ক থেকে পাপুন বলছি। একটা হলুদ রঙের ট্যাক্সির নম্বর নোট করুন। ট্যাক্সিটা এখুনি রথতলার মোড়ে পৌঁছুবে। ওতে কয়েকজন দুষ্টু মানুষ আছে। এদিকে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। নীল টি—শার্ট পরা একজনের পকেটে সম্ভবত পিস্তল আছে। ওদের সঙ্গে একটা থলিও রয়েছে। তাতেও কিছু থাকতে পারে।'

প্রায় ঝড়ের বেগে পাপুন এরপর ট্যাক্সির নম্বরটা বলে গেল। ওপ্রান্তে যিনি কথা বলছিলেন, তিনি হঠাৎ যেন সামান্য উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তারপর 'হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক আছে' বলেই ঠক করে টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ। তাঁর সেই অদ্ভুত ব্যবহারে পাপুন বিস্মিত হল না। বরং বুক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেমে এল।

এরপর এই গল্পের আর সামান্যই বাকি আছে। আসলে টেলিফোনে পাপুনের সেই কথা মাঝেই হলুদ রঙের ট্যাক্সিটা পৌঁছে গিয়েছিল রথতলার মোড়ে। সিগনাল থাকায় দাঁড়িয়েও পড়েছিল। সুতরাং সেটাকে আটক করতে পুলিশকে বেগ পেতে হয়নি। ড্রাইভার সহ ধরা পড়েছিল সবাই। সার্চ করে দুটো পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল ওদের কাছ থেকে। তার একটা ওয়ান সটার হলেও অন্যটা দশ রাউন্ডের ম্যাগাজিন সহ এম নাইন পিস্তলের মতো মারাত্মক অস্ত্র। সঙ্গের থলিতে মিলেছিল দুটো ভোজালি আর তালা খোলার হরেক যন্ত্রপাতি। কালো বেড়াল কাণ্ডের কারণে লোকগুলো এমনিতেই ভড়কে গিয়েছিল। তারপর ওইভাবে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, জেরায় পড়ে কিছুই আর চেপে রাখতে পারেনি। তারপর সেই সূত্র ধরে সেই রাতেই ধরা পড়েছিল সম্প্রতি ভিন রাজ্য থেকে আসা বড় এক গ্যাং।

শুধু পুলিশ কর্তারাই নয়, পাপুনদের বাড়িতে এরপর ছুটে এসেছিল এক ঝাঁক রিপোর্টার। কাগজে সেই খবরের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল ভুতোকে কোলে নিয়ে পাপুনের ছবি। রিপোর্টারদের অনুরোধে সেই ছবি যখন তোলা হয়, পাপুনের ভয় হচ্ছিল, মা হয়তো আপত্তি করবেন। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে মা বরং উৎসাহই দিয়েছিলেন। এমনকী মানদামাসি পর্যন্ত।

————————————

ছবি - পুস্পেন মণ্ডল

লেখক পরিচিতিঃ লেখক অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক। লেখা প্রকাশিত হয়েছে প্রথম সারির সমস্ত পত্র পত্রিকায়। প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ের নাম আমবাগানের পদ্মগোখরা, সোনার পাহাড়, মৃন্ময়ী মন্দিরের তোপদার, সোনার মোহর, কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেবেলা, তুফানবাড়ির তিনমূর্তি।

গল্পের ম্যাজিক::

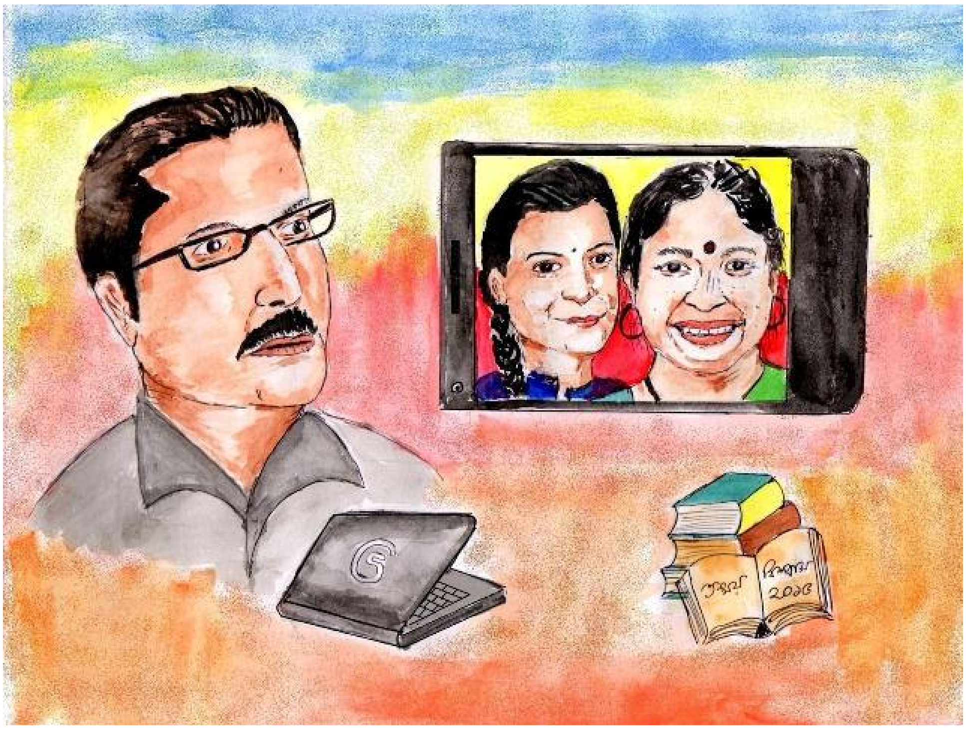

রংবদল

সহেলী চট্টোপাধ্যায়

সব কিছুরই রং বদলে যায় সময়ের সাথে সাথে। এই রংবদল কখনও ভালো, কখনও আবার মন্দের দিকে। বেশ কিছু দিন ধরেই আমার মেয়ে কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করছে। আর তার সাথে তাল মেলাচ্ছে মেয়ের মা অর্থাৎ আমার গিন্নী। মেয়েটা আজ বিগড়েছে তার মায়ের আদরেই। এমনিতে মেয়ে আমার খুব বুঝদার। পড়াশোনায় ভালো। এবার প্রথম বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে বাংলায় অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। কখনও কোনও জিনিসের জন্য আবদার করেনি। ওর চাহিদা ছিল একটাই, গল্পের বই। পুজোর সময় জামা কাপড়ের চেয়ে পুজো সংখ্যার ওপর বেশি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু কলেজে ঢুকেই ওর জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে। বুঝতে পেরেছে যে এত দিনে ও কতটা বোকা ছিল। আর কিছুই নয় চেয়েছে একটা মোবাইল ফোন। তোমরা ভাবছ বাবাটা কী কিপটে মেয়েকে একটা মোবাইলও কিনে দিতে পারে না। তা নয়, কিনে দিয়েছিলাম একটা মোবাইল ফোন। সেই ফোন দেখে মেয়ের মুখে হাসির বদলে বোল ফুটল। "বাবা, এই ক্লাইভের আমলের ফোন দেখলে বন্ধুদের সামনে আমার মাথা কাটা যাবে লজ্জায়। এটা তুমি ই রাখো।"

"কী বললি! ক্লাইভের আমলে মোবাইল ফোন ছিল?" খুব রেগে গিয়ে প্রশ্ন করি।

মেয়ের মা এসে আমাকে থামাল, "কী দরকার বাপু ঝামেলা করে! চাইছে যখন কিনেই দাও না একটা ফোন।"

ফোনটার সবই ভালো কিন্তু অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের দামি ফোন না দেওয়াই ভালো বলে আমি মনে করি। হাজার রকম সুবিধা দেওয়া ফোন নিয়ে কী করবে ওইটুকু মেয়ে? বরং পড়াশোনা আরও লাটে উঠবে। তাই সাধারণ ফোন কিনে দিয়েছিলাম। শুধু কথাটাই বলতে পারবে। কিন্তু এই ফোন দেখে মেয়ে আর তার মায়ের

মুখ যে এমন কালো হয়ে যাবে ভাবিনি। মেয়ের করুণ মুখ আর তার মায়ের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে একদিন ওকে নিয়ে গেলাম ফোন কিনতে।

মেয়ে আমার দশ হাজার টাকার ফোন পছন্দ করে বসল। কী আর করা যাবে? দিতেই হল। একবার শুধু বলেছিলাম, "মা, টিনা এই টাকায় তোমার একটা ভালো নাকছাবি হয়ে যেত অথবা কানের দুল।" টিনা একবার ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে, উত্তর দিল না। ওই তাকানো দেখে ফোনটা না কিনে আর পারলাম না। সেই ফোন দেখে মা মেয়ে দুজনের মুখেই হাসি ফুটল। সারাক্ষণ দুজনে সেলফি তুলছে আর ফেসবুকে পোস্ট করছে। মা আর মেয়ের হাসি মুখ দেখতে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু যে ফোনটা কিনে দিল এত কষ্ট করে তার ফটো তুলতে কারোরই আগ্রহ নেই।

টিনাকে যখনই দেখি মোবাইল নিয়ে খুটখাট করছে, ভয় লাগে রেজাল্ট না খারাপ করে বসে এই ফোনের চক্করে। কথা টথা বলেই না বিশেষ। একদিন ওকে বললাম, "টিনা মা, ফোনের জন্য তোমার পড়াশোনার যেন কোনো রকম ক্ষতি না হয়।" পরপর তিনবার বলার পর টিনা কান থেকে হেডফোন সরিয়ে প্রশ্ন করল, "কিছু বললে বাবা?" বুঝলাম উনি গান টান কিছু একটা শুনছিলেন! আবার বললাম, "তোমার পড়াশোনা..." কথাটা শেষ হল না। টিনার ফোন বাজতে শুরু করে দিয়েছে। বলল, "সরি, একটু পরে আসছি।" বলে ফোন কানে নিয়ে বারান্দার দিকে দৌড় মারল। টিনা খোশমেজাজে গল্প করছে, বোঝা গেল সহজে ছাড়বে না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে এলাম। টিনার মা রান্নাঘরে ছিল। সেদিন রবিবার ছিল তাই আমারও অফিস ছিল না। টিনার মা বলল, "আমিও ফেসবুকে একটা প্রোফাইল খুলেছি।"

"ভালো করেছ। বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রেখো মন ভালো থাকবে," আমি বললাম খবরের কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে।

"হ্যাঁ। কিন্তু আমার মোবাইল থেকে ভালো ফেসবুক করা যায় না, একটা যদি ল্যাপটপ বা ট্যাব থাকত খুব সুবিধা হত।"

এই কথার পর আমি আর বসলাম না। নিজের ঘরে ঢুকে পাখা চালিয়ে শুয়ে পড়লাম। মা আর মেয়ের থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। এরা দুজনেই নির্ঘাত আগের জন্মে রঘু ডাকাতের দলে কাজ করত। ল্যাপটপ অথবা ট্যাব-এর কথা যখন একবার উঠেছে আরও বহুবার উঠবে বুঝতে পারছি।

পরের দিন সকালে টিনা আমার জন্য চা আর জলখাবার নিয়ে এল। জলখাবার টিনাই বানিয়েছে শুনলাম। এক প্লেট পাস্তা। আমার খুব পছন্দের ডিস। তবে আজ চিন্তা হচ্ছে। অন্য দিন পাস্তা দেখলে ভারি আনন্দ হয়। টিনা কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকে। চায়ে চুমুক দিয়ে বলি, "খুব ভালো চা হয়েছে! কলেজ যাবি না?"

"না বাবা, আজ ছুটি। একটা কথা ছিল বাবা," ওর করুণ মুখ দেখে আমার ভেতরের মমতা জেগে ওঠে।

"ল্যাপটপ না ট্যাব?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"ওসব কিছু নয়, অ্যান্টিভাইরাস লাগাতে হবে ফোনে।"

"নেট কার্ড, মেমারি কার্ড, টক টাইম-এর জন্য যা খরচ হয় তাতে একটা হাতি পোষা হয়ে যায়। এবার আবার অ্যান্টিভাইরাস!"

"হ্যাঁ, বাবা। আর মোবাইল স্ক্রিন এর কভার কিনতে হবে। পাতলা যে কাগজটা লাগানো থাকে স্ক্রিনের ওপর, ওটা খুলে গেছে। ওটা না লাগালে স্ক্রিনটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর মোবাইলের আলাদা কভারও লাগবে একটা।"

বাড়ি থেকে না বেরুনো পর্যন্ত এদের ফিরিস্তি চলতেই থাকবে। বেরুবার আগে টিনার মায়ের হাতে হাজার টাকা দিয়ে বলি, "টিনা তার মোবাইলের জন্য কী সব কিনবে বলল, ওকে দিয়ে দিও।"

"আজ তো অনেক তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছো মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ গো। অফিসে অনেক চাপ আছে আজ।"

অ্যান্টিভাইরাস, মোবাইল কভার, মোবাইলের স্ক্রিন-এর ওপর লাগানোর কাগজ আর নতুন একটা হেডফোন কিনে টিনা বেশ খুশি। এই নিয়ে চারটে হেডফোন হল। ল্যাপটপও কিনিয়ে ছাড়ল টিনা আর টিনার মা। এটাকেও অ্যান্টিভাইরাস দিতে হল। শুনলাম এটা নাকি প্রতি বছরই দিতে হবে। নেট-এর লাইন নিতে হল। নেট আসার পর টিনা আর টিনার মায়ের উৎসাহের শেষ নেই। মাঝে মাঝে ল্যাপটপ খারাপও হতে পারে তার জন্য ফরম্যাটও করতে হবে। নেট থেকে রান্নার রেসিপি নিয়ে মা আর মেয়ে রান্নার কম্পিটিশান শুরু করে দিল। সেগুলো গেলাবার আর লোক পেল না আমি ছাড়া। তোমরা ভাবছ একটাই লাভ হয়েছে আমার, নিত্য নতুন খাবার খেতে পাচ্ছি। কিন্ত সে গুড়েও বালি। পশু পাখিতেও মুখে তুলতে পারবে না। এরা পাস্তা, চাউ, সুপ এই সামান্য কিছু জিনিষই পারে। তবে চেষ্টা করছে যখন নিশ্চয়ই শিখে যাবে। গবেষণাটা আমার ওপরই চলবে এটাই যা চিন্তার কথা। যাই হোক মা আর মেয়ে তো দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষায় টিনা কেমন রেজাল্ট করে সেটাই দেখার। টিনা আর ওর মা একটা এসিও কিনিয়ে ছেড়েছে! গরমে নাকি টেকা যায় না, মানছি কথাটা সত্যি। তবে আমাদের ঘরে এসির দরকার ছিল না, পুরানো আমলের দোতলা বাড়ি। এমনিতেই যথেষ্ট ঠাণ্ডা গরমের সময়। আসলে অন্য লোকে কিনলে আমাদেরও একটা কিনতে হবে। এটাও একটা ব্যাপার।

একদিন সকালে অফিস যাব বলে তৈরি হচ্ছি টিনা আমার ঘরে এল। আবার সেই করুণ মুখ। দেখেই চিন্তা হয় আমার। আমার ঘর এখন ভুলেও মাড়ায় না। তায় আবার চা এনেছে আমার জন্য। বুঝতে পারলাম পকেট থেকে বেশ কিছু খসতে চলেছে। বললাম, "কী ব্যাপার? বাবা কে মনে পড়ল এত দিন পর?"

"আমি ৬০ পারসেন্ট নম্বর নিয়ে পাস করেছি বাবা। অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস," টিনার মুখে হাসি ফোটে।

"বাহ। তাহলে বোঝা যাচ্ছে পড়াশোনায় তুমি ফাঁকি দাও নি," বেশ ভালো লাগে আমার।

"বাবা তুমি খুশি তো?"

"নিশ্চয় মা। আমি খুব খুশি। উপহার তো দিতেই হবে আমার মাকে। কী চাই তোমার?" (এই রে মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।) আসলে বরাবর টিনা পরীক্ষায় ভালো করে পাস করলে ওকে কিছু না কিছু দিয়ে এসেছি। আনন্দে উজ্বল হয়ে ওঠে টিনার মুখ।

"সত্যি বলছ, বাবা! যা চাইব তাই দেবে?"

আগে ও পুতুল গল্পের বই, ব্যাগ, পেন, হাল্কা জুয়েলারি এইসবেই খুশি থাকত। কিন্তু বড় হবার সাথে সাথে চাহিদাও বদলেছে।

টিনা আমার চিন্তার জাল ছিন্ন করে বলে উঠল, "বাবা, আমার একটা সেলফি স্ট্যান্ড চাই।"

"সেটা আবার কী জিনিস?" ভীষণ অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করি।

"বাবা, সেলফি স্ট্যান্ড জানো না!" আকাশ থেকে পড়ে টিনা, "লাঠিতে মোবাইল রেখে নিজের সেলফি নিজে তোলা যায়। খবরের কাগজে দিয়েছিল যে এখন সেলফি স্ট্যান্ড পাওয়া যায়। বেশি দাম নয় বাবা। হাজারের মধ্যেই হবে।"

লাঠির মাথায় মোবাইল বসিয়ে নিজের ছবি নিজে তোলা যায়! সত্যি কত কিছুই না বেরিয়েছে, আবার বেরুবে আমাদের চাহিদা মেটাবার জন্য। চাহিদা না থাকলেও চাহিদা বানাতে হবে। আমার মাথায় লাঠি বসালে এর চেয়ে ভালো হত বরং। তোমরা ভাবছ আমি কী কিপটে! তা ভাই ঠিকই ভেবেছ তোমরা। কষ্ট করে মানুষ হয়েছি, এত বিলাসিতা পোষায় না। ভালো জামাজুতোও বাবা আমাকে দিতে পারেননি কখনও। ছেঁড়া জামা নিজেই সেলাই করে পড়েছি।

"যা ইচ্ছা কিনগে যা," বলে একটা হাজার টাকার নোট বাড়িয়ে দিলাম। টাকাটা নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল ও। মোবাইলের লাঠি কিনতে বোধ হয় এখনই বেরুবে। আমার নিজের লাঠি যাকে মনে করেছিলুম সে আমাকে এটিএম ছাড়া কিছু মনে করে না দেখে ভারী দুঃখ হল।

অফিস থেকে ফিরে দেখি টিনা হাসি মুখে আমার ঘরে বসে আছে। আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল নিশ্চয়ই। বললাম, "পেলি তোর মোবাইলের লাঠি?"

"না বাবা, দেখেছিলাম কিন্তু আর কিনতে ইচ্ছা হল না।"

"সে কী! তাহলে কী কিনলি?"

"তোমার দেওয়া টাকা থেকে ৫০০ টাকা সঞ্চয় করেছি, ওই যে তুমি বলতে না, যে টাকা হাতে রেখে দিতে হয়। জমাতে হয়, তাই ..."

"আচ্ছা বেশ করেছিস। বাকি ৫০০ কী করলি?"

"কলেজ স্ট্রীট থেকে কিছু পুরানো বই কিনেছি, অনেক ভালো বই বেশ সস্তায় পেয়ে গেছি বাবা। দেখবে?"

হে ইশ্বর! এত সেই ছোটোবেলার টিনাকে দেখছি। যে এত দিন হারিয়ে গেছিল।

বললাম, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখব!" টিনা ওর নতুন কিনে আনা বইগুলো আনতে ছুটল। ঠিক যেমন ছোটোবেলায় ছুটত আমাকে কোনও কিছু দেখাবার জন্য। যাক আমার ছোট্টো মেয়েটার মনের রং তাহলে একই আছে। বাইরে বদলালেও ভেতরটা এতটুকুও বদলায়নি।

ছবি – তন্ময় বিশ্বাস

গল্পের ম্যাজিক::

সুহাসের হাসি

রাজীবকুমার সাহা

রুই মাছের মাথা নারকোল দিয়ে খেয়েছ কখনও? বেশ পাকা মাথা? খাওনি তো? আমাদের সুহাসের কিন্তু এটাই ছিল খুব প্রিয় খাবার। ছিল বলছি এই কারণে, সুহাসের সাথে আমার দেখা নেই দীর্ঘদিন। সুহাস আমার স্কুলজীবনের বন্ধু। ছোটখাটো চেহারা, হাড় জিরজিরে লিকলিকে হাত পা। কিন্তু হাসিটি ছিল একেবারে চোয়াল ছড়ানো। অন্যের বিপদ-আপদে মুহূর্তের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ত। আবার যখন তখন ভয় দেখিয়ে লোককে জব্দ করতেও ওস্তাদ ছিল। আমার এই অকুতোভয়, পরোপকারী আর সদাহাস্যময় বন্ধুটিকে ভালবাসতাম খুব। ওর গজদাঁতের হাসিটা ছিল খুব মিষ্টি। তবে রেগে গেলে বা ইচ্ছে করলে ও খি খি করে এমন একটা হাসি হাসত যা দেখলে বা শুনলে রীতিমত শিউরে উঠতে হয়। এটাকে কুটিল না জটিল, ভূতুড়ে না অদ্ভুতুড়ে বলা যায় মাথায় আসত না।

একমাত্র লেখাপড়া ছাড়া আর কোনও ব্যাপারেই মনের দোটানায় পড়ে সুহাসকে টেক্কা দিতে পারিনি। পরে বুঝেছি, মন দিয়ে পড়াশোনা করা আর মনকে আলোকিত করে সেই নির্মল রশ্মি নিঃস্বার্থভাবে কোণায় কোণায় ছড়িয়ে দেওয়া এক জিনিস নয়। আমি পারিনি, সুহাস পেরেছিল।

বইয়ের পাতায় সুহাসের মগজটা ততটা খেলত না, যতটা খেলত দুষ্টুমি বুদ্ধিতে।

তখন আমরা ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি। শীতের সময়, পৌষের শেষ কি মাঘের শুরু। সেবার শীতটাও পড়েছিল বেশ। সবাই জানে, এমন শীতে গাছ থেকে নামিয়ে তাজা খেজুরের রস সকালের রোদে বসে গ্লাস ভর্তি করে খেতে বড়ই মিষ্টি লাগে। আমাদের এলাকাটা ইদানীং শহরের তকমা পেলেও সেসময় একটু পাড়াগেঁয়ে গোছেরই ছিল। আর সৌভাগ্যবশত আমাদের বাড়ি থেকে অল্প দূরেই একটা পোড়ো মাঠের ধারে

গোটা তিনেক খেজুরগাছও ছিল। স্বভাবতই ছেলেবেলায় আমরা শীতের সকালে খেজুর-রস থেকে বঞ্চিত হইনি।

গাছগুলোর মালিক ছিল আমাদের পাড়ার মনাদা। মনাদা রোজ দুপুরের পরে খেজুরগাছগুলোর গলা চেঁছে, কাঠি গুঁজে একটা করে হাঁড়ি বেঁধে দিয়ে চলে যেত। আর সারা রাত ধরে সেই কাঠি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রস নেমে হাঁড়িগুলো ভর্তি হয়ে থাকত। বেশি শীত পড়লে কখনও বা হাঁড়ি উপচে রস পড়ত মাটিতে। মনাদা রোজ অন্ধকার থাকতে ভোরে গাছে উঠে রসের হাঁড়িগুলো কোমরে গোঁজা আংটায় করে নামিয়ে আনত। যারা চাইত তারা পাত্র হাতে গাছের নীচে গেলে মনাদা দুই কি তিন টাকা লিটার দরে খেজুরের রস বিক্রি করত। আর বাকিটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে জ্বাল দিয়ে নলেনগুড় তৈরি করে বিক্রি করত।

তো একবার হয়েছিল কী, কয়েকবার চাওয়া সত্ত্বেও মনাদা এক টুকরোও নলেনগুড় সুহাসের হাতে তুলে না দেওয়ায় খানিকটা চুরি করে ফেলে সুহাস। এ নিয়ে সুহাসের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে ওর বাবাকে সালিশি মেনে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলে মনাদা। সুহাসের বাবা সরল-সিধে মানুষ। সামান্য নলেনগুড় নিয়ে এই অপমান মেনে নিতে পারেননি। প্রচণ্ড মার মেরেছিলেন সুহাসকে সেদিন। ঠাণ্ডা মানুষ হঠাৎ রেগে গেলে যা হয় আর কী!

বাবার হাতে মার খেয়ে মনে মনে ফুঁসতে থাকলেও মুখে কিছু বলেনি সুহাস। ঘটনাটা ওর মনেও কম আঘাত করেনি। আমার ডাকাডাকি, কাকিমার কান্নাকাটি উপেক্ষা করে দু'তিনদিন নিজের ঘরের খিল আটকে বসেছিল। দানাপানি স্পর্শ করেনি। ওর আদরের কুকুর ভোলাও খুব চিৎকার চেঁচামেচি করত সুহাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সুহাসকে বের করা যায়নি। পরে বুঝেছিলাম, এই ক'দিন একা বসে মনাদাকে শায়েস্তা করার মতলব ভাঁজছিল সুহাস।

হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ওর কীর্তি দেখাল সুহাস। কোত্থেকে বাঁশ, খড়, মাটির হাঁড়ি আর এক টুকরো সাদা কাপড় যোগাড় করে একটা বীভৎস মূর্তি বানিয়েছে ও। ওর গোপন বাক্স থেকে বের করে আমাকে এক ঝলক দেখিয়েই আবার বাক্সবন্দী করে ফেলল তৎক্ষণাৎ। চোখে মুখে রহস্যের হাসি ঝিলিক মারছে। প্রথমে চট করে ধরতে না পারলেও সুহাসের চোখ মুখ দেখে ওর উদ্দেশ্যটা টের পেয়ে গেলাম। আর সাথে সাথে পই পই করে বারণও করলাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা! সে রাত্রেই খেজুরগাছের পাশের একটা লিচুগাছের ডালে ওই ভয়ঙ্কর পুতুলটা ওর প্ল্যানমতো ফিট করে এল। দু'গাছি কালো রঙের রশি লিচুগাছটার ডাল থেকে খেজুরগাছ অবধি এমনভাবে টেনে এল যাতে এক গাছ থেকে পুতুলটাকে আরেক গাছে অনায়াসে টেনে আনা যায়। অন্ধকারে কালো রঙের রশি দেখা যাবে না বলে মনে হবে যেন সত্যি সত্যিই ভয়ঙ্কর একটা কিছু এক গাছ থেকে আরেক গাছে হাওয়ায় ভর করে চলে আসছে।

ভোর চারটে বাজার খানিক আগেই বিছানা ছেড়ে লিচু গাছটায় উঠে লুকিয়ে রইল সুহাস। দু'হাতে দুটো রশির প্রান্ত। শীতের ভোর, আকাশের গায়ে তখনও বেশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভোরের আলো ফুটতে ঢের দেরি। খানিক পরেই মনাদা খেজুর গাছের তলায় চলে এল ভোর-কীর্তন গাইতে গাইতে। পুবের আকাশটা ততক্ষণে হালকা হতে শুরু করেছে একটু একটু করে। জুতোজোড়া খুলে রেখে অভ্যস্ত কায়দায় খেজুর গাছের মাথায় উঠে এল তরতর করে মনাদা। রোজকার মতো যেই মাত্র রসের হাঁড়িটার বাঁধন খুলেছে মনাদা, এমন সময় লিচুগাছ থেকে রশিতে পড়ল টান। সড়সড় করে সাদা থান পড়া কিছু একটা তেড়ে আসতে লাগল হাওয়ায়

ভর করে মনাদার দিকে। কিন্তু কুয়াশার পর্দা ভেদ করে স্পষ্টভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর যখন দেখতে পাওয়া গেল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভালো করে ওটার দিকে চোখ পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের' প্রভাতী সুর গেল থেমে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে কানে আসছে একটা অদ্ভুত বিটকেলে হাসি – খি খি খি। মুখে অস্ফুট একটা গোঙানির মতো আওয়াজ করে গৌরাঙ্গের ওপর বিন্দুমাত্রও আস্থা না রেখে সোজা রামনাম জপতে জপতে টেনে হিঁচড়ে শরীরটাকে খেজুর গাছের অর্ধেকটা পর্যন্ত নামিয়ে আনল মনাদা। তারপর এক লাফে বাকি অর্ধেকটা পার করে কোনোমতে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়েই পড়ি মরি করে এক ছুট লাগাল। বাবা গো, মা গো, ভূতে মেরে ফেলল গো বলে চেঁচাতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল মনাদা।

এই ছিল আমাদের সুহাস।

সুহাসের বাবা অবনীবাবুর হাসপাতালের চাকরি। ছোট চাকরি, আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। আমরা ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময়ই অবনীবাবু বদলি হয়ে চলে গেলেন পরিবার সমেত। সুহাসের সাথেও আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সজল চোখে মালপত্রসহ বন্ধুকে ম্যাটাডোরে তুলে রওনা করিয়ে দিয়েছিলাম। সুহাস ওর নতুন ঠিকানাটা এক টুকরো কাগজে লিখে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল মনে আছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কাগজের টুকরোটাও মলিন হতে হতে এক সময় কোথায় যে হারিয়ে গেল, খুঁজে পেলাম না। ঠিকানাটা মুখস্থ করে রেখেছিলাম। কিন্তু কাগজে লেখা গোটা গোটা অক্ষরগুলোও আস্তে আস্তে স্মৃতির আকাশে আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল এক সময়। শেষ পর্যন্ত আর ঠিকানাটাও মনে নেই।

আমি মন দিয়ে পড়াশোনা করেছি। বড় হয়েছি। মোটা বেতনের চাকরি করছি। যা যা না করলে সমাজে মুখ থাকে না সবই করেছি। পাশাপাশি আর সবাইকার মতো সুহাসকেও মন থেকে প্রায় মুছে ফেলেছি।

কিন্তু সুহাস যে আমায় ভোলেনি তার প্রমাণ পেলাম দিন তিনেক আগে।

একদম আনকোরা চাকরিটা নিয়ে হপ্তাদুয়েক হল এখানে এসে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। পাড়ার মুখেই একটা বাজার আছে। নিত্যদিনের খরচপাতিটা ওখান থেকেই করি আমি। একা থাকি, একদিন বাজার করলে তিনদিন চলে যায়। সেদিনও অফিসের বাস থেকে নেমে সোজা বাজারে ঢুকলাম গিয়ে। তিনদিন চারদিন ধরে লাগাতর বৃষ্টি হচ্ছে। কাদা পচে গিয়ে কালো হয়ে থিকথিক করছে চারদিক। এই সন্ধের মুখেও বাজারে লোকজন নেই তেমন। আমি সোজা মাছ-বাজারে ঢুকে বেশ পাকা দেখে একখানা রুইমাছ থলেতে পুরে বেরোবার মুখেই কাঁধে একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেলাম। শীতল আবহাওয়ার দরুনই হোক আর যে কারণেই হোক, হাতের স্পর্শটা এতটাই ঠাণ্ডা ছিল, যে চমকে উঠলাম। ভ্রূকুটি করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমারই বয়সী একটা তালঢ্যাঙা লোক আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। জামাকাপড় ভিজে লেপটে রয়েছে গায়ে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম নির্বাক।

"কী রে তুই! এখনও চিনতে পারিসনি?" বলে লোকটা যেই হেসেছে, ভ্রূকুটিটা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার। সেই ভুবনভোলানো গজদাঁতের হাসি!

"আরে সুহাস! তুই?" উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ল আমার গলায়।

"হ্যাঁ রে! তা রুইটা তো বেশ পাকা সাইজের নিলি দেখলাম। একজোড়া নারকোল নে না বেশ ঝুনো দেখে।"

"যা ব্বাবা, রুইমাছ কিনলে সাথে নারকোলও কিনতে হয়!" হঠাৎ একটু থতমত খেলেও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সুহাসের 'নারকোল দিয়ে রুইয়ের মুড়ো'-এর কথা মনে পড়ে গেল। আর সাথে সাথেই হা হা করে প্রাণ খুলে হেসে দুই বন্ধু এসে বসলাম একটা চায়ের দোকানের টুলে। বেশ শীত শীত লাগছে। দুটো চায়ের কথা বলতেই সুহাস বারণ করে দিল। বলল, "তুই খা অন্তু, আমি তো চা খাই না জানিসই।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "হ্যাঁ, কিন্তু তখন খেতিস না বলে এখনও খাবি না তা কি হয়! ভিজে চুপসে আছিস, এক কাপ খা, বেশ আরাম লাগবে।"

সুহাস আমার কথা পাত্তা না দিয়ে বলল, "তারপর বল, এখানে কী করছিস? চাকরি?"

আমি মাথাটা দু'বার উপর-নিচু করে বললাম, "আরে আমারও তো একই প্রশ্ন রে! তুই এখানে? কী করছিস এখন?"

প্রশ্নটা কানে আসতেই হঠাৎ উদাস হয়ে গেল সুহাস। লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বলল, "আমার আর করা। বাবার চাকরি যদ্দিন ছিল মা চালিয়ে নিত এক রকম। চাকরি পেরিয়ে পেনশনে যেতেই মা'র হাতের দড়িরও পাঁক খুলতে লাগল। অনেক ধরা-করা করে আমি শেষ পর্যন্ত একটা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিতে......"

আমার চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে বললাম, "থাকিস কোথায় তোরা এখানে?"

সুহাসের দেওয়া ঠিকানা জেনে বললাম, "বাহ! এ যে আমার অফিসের লাগোয়া। কই দেখিনি তো তোকে?"

সুহাস একটু তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, "দেখবি কোত্থেকে? বাড়িতে থাকলে তো? সারাদিন হয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি নয় গ্যারেজেই পড়ে থাকি। গ্যারেজই এখন আমার সব।"

আমি একটু হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কাকু... কাকিমা..."

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, এখন সুখেই আছে, চ।"

"বাড়ি ছেড়ে চলে এলি, ঝগড়া করেছিস?"

"সে হয়েছে কিছু একটা। পরে বলব একদিন। এখন চল তো! ওঠ।"

কথাগুলো বেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠে দাঁড়াল সুহাস। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়?"

"এই কাছেই। একটা খুব সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাব তোকে। ভালো লাগবে তোর। উঠে আয়!"

আমি দোনামনা করে বললাম, "এই বৃষ্টিতে? তাছাড়া অন্ধকারটাও কেমন মিশমিশে দেখেছিস? দেখতেই পাব না কিছু।"

আমার চোখে চোখ রেখে খি খি করে সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসল সুহাস। তারপর রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখতে হবে না। শুধু অনুভব করবি আয়।"

সুহাসের গলায় এমন কিছু একটা ছিল যা আমি আর বাধা দিতে পারলাম না। তাছাড়া এতদিন বাদে ছোটবেলার একমাত্র বন্ধুকে পেয়ে এত ভালো লাগছিল যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণটা হারিয়ে ফেলছিলাম আস্তে আস্তে। থলেটা তুলে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো সুহাসের পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম। বাজার ছাড়িয়ে, পাকা রাস্তা থেকে কাঁচা রাস্তায় নেমে, ধানক্ষেতের আল বেয়ে, কাঁটা ঝোপঝাড় মাড়িয়ে হেঁটেই চলেছি।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁ রে সুহাস, কোথায় যাচ্ছি আমরা বলতো?"

সুহাস মুখঝামটা দিয়ে বলল, "আচ্ছা, তখন থেকে অত বেগড়বাই করছিস কেন বলতো? আমার পিছু পিছু হাঁটতে থাক না মুখ বুজে।"

শেষ পর্যন্ত একটা ঢালুমতো জায়গায় এসে পৌঁছলাম কিছুক্ষণ পরে। মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল ধরে হেঁটেই চলেছি আমি। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না। চারদিকে বৃষ্টির শব্দ আর ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। মাথা থেকে পা যেন দশমনি পাথর হয়ে আছে। শেষে পায়ের নিচে বালি পেয়ে আর কানে অস্পষ্ট একটা কুলকুল আওয়াজ আসতেই বুঝলাম আমরা একটা নদীর পাড়ে এসে পৌঁছেছি। কাছেপিঠে কোথাও শেয়াল না শকুন ডাকছে। একবার মনে হচ্ছে কুকুরের কান্না, আর একবার মনে হচ্ছে কারও বাচ্চা কাঁদছে। ধপ করে বালির ওপর বসে পড়লাম আমি। একে সারাদিনের খাটুনি, তায় আবার এই অবেলায় বৃষ্টি ভেজা – শরীরের শক্তি যেন ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে।

বসে পড়ে বললাম, "আচ্ছা সুহাস, তুই কী বলতো? সেই খ্যাপাটেই থেকে গেলি চিরটা কাল? এই বাদলায় বনে-বাদাড়ে ডেকে নিয়ে এলি, যদি সাপ-টাপ কিছু একটা কামড়াত অন্ধকারে? কেন, একদিন বিকেল-টিকেলে আসা যেত না?"

কোনও জবাব পেলাম না। পরিবর্তে একটু দূর থেকে যেন সুহাসের সেই অদ্ভুত খি খি হাসি কানে ভেসে এল। মিথ্যে বলব না, গাটা কেমন যেন ছমছম করে উঠল। সুহাসকে আবার ডাকলাম। এবারও সাড়া পেলাম না। হঠাৎ দূরের আকাশে একবার বিদ্যুৎ চমকাল। আবছা আলোয় দেখলাম একটা বাঁশঝাড়ের পাশে বসে আছি আমি। আর সুহাস দাঁড়িয়ে আছে আমার ঠিক পাশেই। এক ঝলক আলোতে সুহাসকে যেন আরও বেশি ঢ্যাঙা লাগল দেখতে। অন্ধকারে আর বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছিলাম না। শীত শীত করছে। সারাটা শরীর ঝিমিয়ে পড়ছে একটু একটু করে। ভাবলাম, অনেকটা পথ ভেঙে এসেছি এই বাদলা মাথায় করে, তাই হয়ত এমন লাগছে। এখন জ্বর-টর কিছু একটা না বাঁধালেই হয়।

গলায় বেশ জোর নিয়েই সুহাসকে ডেকে বললাম, "সুহাস, তোর মনে আছে, আমরা সন্ধেবেলায় মাঠ ফেরত সাইকেল চেপে কতদূর চলে যেতাম? মনে আছে তোর? অ্যাই সুহা..."

আর বলতে পারছিলাম না। গলার জোর পড়ে আসছিল। শেষের কথাগুলো নিজের কানেই কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছিল। টের পেলাম সুহাস এসে বসল পাশে। কী যেন বলছিল কিন্তু স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছি না, কানে জড়িয়ে যাচ্ছে। গলার স্বরটা অস্বাভাবিক ফাঁপা। ভেবে দেখলাম, শরীরটা আস্তে আস্তে খারাপ লাগছে বেশি। মাথায় বৃষ্টি নিয়ে এই জলের ধারে আর বসে থাকা ঠিক নয়। হঠাৎ যেন বেশ শীত করতে শুরু করেছে। একটু একটু করে সমস্ত গায়ের জোর আবার একত্রিত করে সুহাসকে বললাম, "না ভাই, আর বসে থাকা ঠিক হবে না। এবার ওঠ। চল ফিরে যাই। বাড়ি যাবি তো?"

"কার বাড়ি? তোকে তো বললাম তখন, আমি বাড়ি যাই না।"

"তবে আমার ওখানেই চল। রাতটা কাটিয়ে যাবি আজ।"

বলেই লক্ষ্য করে দেখলাম, একটু দূরে কারা যেন একটা মড়া নিয়ে আসছে নদীর দিকে হরি ধ্বনি দিতে দিতে।

দুই বন্ধু উঠে পড়লাম। আবার সেই রাস্তা। কাঁটা ঝোপ, কাঁচা পথ তারপর পাকা রাস্তা। হঠাৎ হঠাৎ দমকা হাওয়ায় দুজনের ভিজে জামাকাপড়গুলো পতপত করছে। পাকা রাস্তায় উঠে দেখলাম জনমনিষ্যি তো দূর, রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত নেই। বৃষ্টির জোরটা কমে গিয়ে এখন ঝিরঝির পড়ছে। শরীরটা এতক্ষণে আবার আগের জায়গায় ফিরে গেছে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে বললাম, "সত্যি সুহাস, তুই ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছিস। ঠিক যেন শরৎচন্দ্রের লালু। আমায় পর্যন্ত ছাড়লি না, ঠিক নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে ভয় পাইয়ে আনলি।"

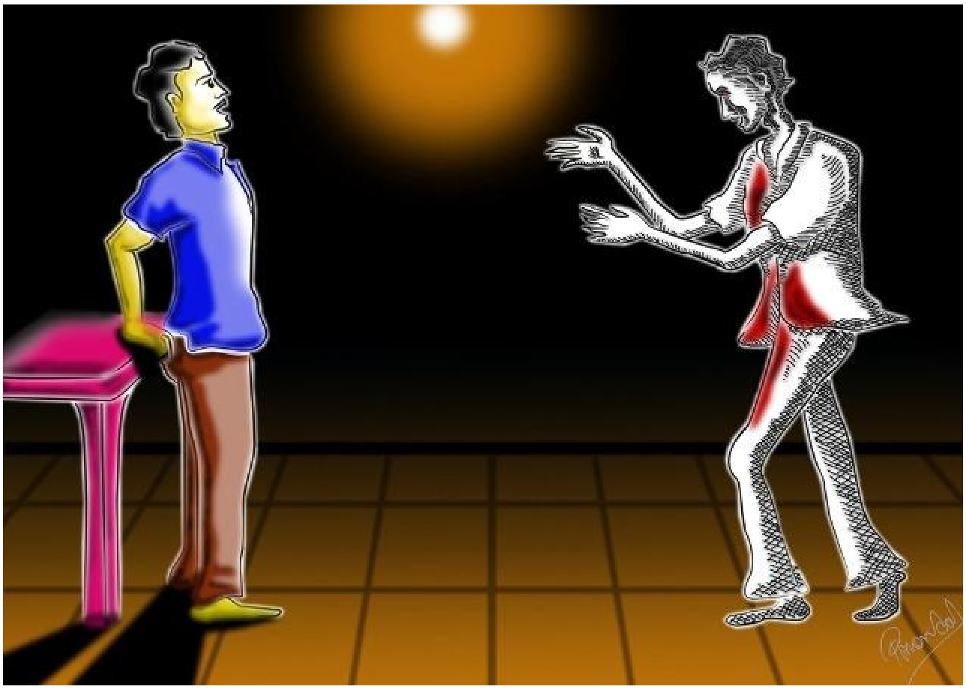

আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল ও। গেট আর দরজার তালা খুলে সুহাসকে ভেতরে নিয়ে এলাম। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি আর সারাদিন বন্ধ থাকার ফলে ঘরটা যেন আইসক্রিম ফ্যাক্টরির মতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে। সটান বাথরুমে ঢুকে জামাকাপড় বদলে চটজলদি বেরিয়ে এসে দেখলাম সুহাস মেঝেতেই বসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি বললাম, "সে কি রে! মেঝেতে কেন? ঠিক আছে আর বসতে হবে না। বাথরুমে যা, আমি তোর জন্যে কাপড় বের করে আনছি।"

একগাল হেসে উঠে পড়ল সুহাস। বলল, "না রে, আজ থাক। এই চিনে গেলাম, আর একদিন আসব।"

"ওমা! তুই না বললি থাকবি আজ?"

"ওটা আমি নই, তুমি বলেছিলে বন্ধু।"

মুখে সেই ভুবনভোলানো মধুর হাসি। আমি নাছোড়বান্দা হয়ে বললাম, "সে একই হল। না না, আজ তোকে থাকতেই হবে এখানে। কত গল্প করব ভেবে রেখেছি। আজ তোকে ছাড়ছি না।"

কিন্তু মিনিট দশেক বাদানুবাদের পরেও সুহাসকে টলানো গেল না। হাল ছেড়ে দিয়ে শেষে বললাম, "আচ্ছা ঠিক আছে, না থাকিস খেয়ে তো যাবি? জাস্ট মাছের ঝোল আর গরম ভাত। বেশিক্ষণ লাগবে না রাঁধতে।"

এই বলে হঠাৎ হুঁশ হল, মাছের ব্যাগটা বারান্দাতেই পড়ে আছে। তালা খোলার সময় রেখেছিলাম নামিয়ে। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়াতেই সুহাস বাধা দিয়ে বলল, “ওটা এখন থাক অন্তু, এনে কাজ নেই। আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে একটা কথা শুধু...”

গলাটা হঠাৎ কেমন যেন পালটে গেল সুহাসের। গা ছমছম করা একটা স্বর। মুখখানা ভীষণ গম্ভীর। জিজ্ঞেস করলাম, “কী কথা?”

“মনাদার সাথে সেই নলেনগুড়ের ঘটনাটা মনে পড়ে তোর? ছোটবেলায়? গুড়টুকু যে আমিই চুরি করেছি সে খবরটা কে লাগিয়েছিল রে মনাদার কানে? অ্যাঁ? ছিলাম তো শুধু তুই আর আমি।”

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি কোনওমতে একটু ঢোঁক গিলে তোতলাতে লাগলাম, “আ-আমি, আমি, মানে ইয়ে...”

এত বছর পরে এই বয়সে আবার ছোটবেলার সেই কলঙ্কটা এসে সামনে দাঁড়াবে ভাবতে পারিনি কখনও। লজ্জায় চোখ রাখতে পারছিলাম না সুহাসের চোখে। মাথাটা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছি। আবার সুহাসের গলা ভেসে এল। তবে এবার গলার স্বরটা বেশ অস্বাভাবিক ঠেকল কানে।

“বাবার হাতে মার খেয়েছিস কখনও বড় হয়ে? খেলে বুঝতিস ওটা শরীরের চেয়ে মনেই লাগে বেশি। এবারে তাহলে প্রতিশোধটা নিয়েই নিই, কী বলিস অন্তু? শেষবারের মতো চুকেবুকে যাক!”

আমি চমকে উঠে হাঁড়িমুখে কোনও রকমে এক চিলতে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বললাম, “অ্যাই যাহ্! কী আবার ফাজলামো শুরু করেছিস বলতো? তোর এই যখন তখন যাকে তাকে ভয় দেখানোটা এবার ছাড়।”

আমার কথার ধার দিয়েও গেল না সুহাস। বলল, “যদি তোর ঘাড়টা মটকে দিয়ে যাই এখানে কেমন হয় বলতো? কেউ টেরও পাবে না, খি খি খি...”

এবার গলার স্বরের সাথে সাথে চেহারাটাও ক্রমশ পালটাতে লাগল ওর। গোটা চেহারাটা হিংস্র হয়ে উঠতে লাগল একটু একটু করে। চোখ দুটো ভাটার মতো জ্বলছে। শুকনো চেহারাতে দাঁতগুলো আর হাড় ক’খানা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আস্তে আস্তে। মাথাটা দপদপ করছে আমার একনাগাড়ে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কী হতে চলেছে এই মুহূর্তে। সুহাসের চেহারা দেখে এখন বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, ও এখন আর ফাজলামো করছে না। কারণ, কথাগুলো বলেই আমার দিকে এগিয়ে এল সুহাস। দু’হাতের আঙুলগুলো দুটো গ্লাস ধরে রাখার ভঙ্গিতে আমার গলার দিকে এগিয়ে আনছে। আমার সারা শরীর গরম হয়ে উঠতে লাগল। পরক্ষণেই হিম হয়ে এল আবার। হাত পাগুলো নিজের বলে মনে হচ্ছে না আর। একেবারে অবশ হয়ে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, সুহাসের হাতের আঙুলগুলো কেমন যেন পাখির পায়ের আঙুলের মতো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সব ক’টা আঙুল থেকেই লম্বা লম্বা ধারালো নখ বেরিয়ে আসছে। গোটা মাথাটা, বুকটা আর ডান পা’টা থেঁতলে আছে একেবারে। ভীষণ শক্ত কিছুর ওপর কোনও নরম জিনিস আছড়ে পড়লে যেমন হয়। চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে। হাসব কী কাঁদব, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না। মা’র মুখটা

বারবার ভেসে উঠছে মনে। ভাবছি, এই রাতদুপুরে কাকেই বা ডাকব। ইচ্ছে করেই খালি বাড়িটা ভাড়া করেছিলাম যাতে একটু গুছিয়ে বসে তারপর বাবা মাকে গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা যায়। এখন দেখছি এই খালি বাড়িতেই বেঘোরে মারা পড়ব। তীব্র টিউবলাইট দুটোর আলোতেও চারদিক কেমন যেন ঝাপসা লাগছিল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই পেছন ফিরে তাকালাম। জোরালো লাইটের আলোয় আমার পায়ের কাছে ছায়া পড়েছে। পরক্ষণেই সুহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর ছায়া পড়েনি মেঝেতে। বুকটা এবার ধড়াস ধড়াস আওয়াজ করতে লাগল।

আমি আস্তে আস্তে পেছতে লাগলাম আর সুহাস এগোতে লাগল। এক সময় টেবিলে ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম মেঝেতে। গলা কাটা মুরগির মতো থরথর করে সারা শরীর। আমার অবস্থা টের পেয়ে সুহাস হেসে উঠল। খি খি করে সেই অদ্ভুত হাসি। আমার গা গুলিয়ে উঠছিল। বেশ কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে তারপর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সুহাস বলে উঠল, "ছেড়ে দিলাম যা! যা মাছটা নিয়ে আয় এবার। আমি গেলাম।"

চকিতে দরজার বাইরে মাছের ব্যাগটার দিকে চোখ ফেরাতেই অনুভব করলাম একটা গুমোট অথচ বরফ-ঠাণ্ডা বাতাস যেন ঘরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘাড় ফেরাতেই দেখলাম সুহাস উধাও। ঠাণ্ডা বাতাসটা শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে এদিক ওদিক। কোনওমতে উঠে দাঁড়ালাম। পা দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে। তারপরও শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখি আলমারিটার মাথায় এক বিশাল আকারের বাদুড় বসে আছে। বীভৎস চেহারা। চোখে সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মাথা, বুকের কাছটা আর একটা পা রক্তাক্ত। আর মুখে অসংখ্য ছোট ছোট দাঁতের দু'পাশে দুটো অপেক্ষাকৃত লম্বা দাঁত। সুহাসের গজদাঁতের মতোই খানিকটা। আমি তাকাতেই ফাও ফাও শব্দে তেড়ে এসে আমার বাম পাশ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিজের চোখ বা কান, কোনওটাকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না পুরোপুরি। ও কী আসলে সুহাসই? সুহাস... সুহাস এরকম করতে পারে আমার সাথে? যদি তাই হয়, ও কী তাহলে...? আর ভাবতে পারছিলাম না। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে মনে অনেক সাহস এনে বারান্দা থেকে ব্যাগটা টেনে নিয়ে এলাম এক শ্বাসে। দরজায় দাঁড়িয়েই ব্যাগটা ফাঁক করে মাছটা টেনে আনলাম। দেখি, এত বড় রুই মাছটার মাথাটা কে যেন কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। আর বাকিটা একেবারেই অক্ষত। সহ্য করতে পারলাম না। কারণ, কাটা মাছ দেখতে এক রকম। আর কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া মাছ দেখতে... ও মা গো!

এতক্ষণের সংশয়টা সত্যিতে প্রমাণিত হতে দেখে আর থাকতে পারলাম না। পা দুটো টলমল করতে করতে আঁধার নেমে এল চোখে। বেশ জোরালো একটা চিৎকার শুরু করেছিলাম মনে আছে। কিন্তু চিৎকারের শেষটা আবছা হয়ে মেঝেতেই নেতিয়ে পড়লাম আমি।

পরদিন বেশ বেলাতে ঘুম ভেঙে জানতে পেরেছিলাম, আমার চিৎকারটা এতটাই জোরালো ছিল যে এই বৃষ্টির মধ্যেও পাশের বাড়ির লোকেদের কানে গিয়েছিল। ওরাই তৎক্ষণাৎ এসে জলটল দিয়ে গরম দুধ খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখে। আর একজন থেকেও যায় আমার ঘরে রাতে।

দু'দিন অফিস যাইনি। তারপর যেদিন গেলাম, লাঞ্চ আওয়ারে খুঁজে পেতে সুহাসের বাড়ি গেলাম। সুহাস ঠিকানাটা এত সোজা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, যে কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয়নি। গেটটা ভেজানো ছিল। ঢুকে দেখলাম, বারান্দায় ভুলো শুয়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। সুহাসের কুকুর। এত বছর পরেও ভুলোকে চিনতে পারলাম ঠিক। তবে বেশ বয়স হয়ে গেছে বোঝা যায়। আমাকে এক পলক দেখেই খ্যাঁক খ্যাঁক করতে করতে বাড়ির পেছনের দিকে চোঁচা দৌড় দিল। আবার ফিরে এসেই আমার থেকে অনেকটা সরে গিয়ে কার যেন আদর খেতে লাগল। হাওয়ার গায়ে জিহ্বা দিয়ে চাটতে চাটতে অনবরত লেজ নাড়ছে আর কেঁউ কেঁউ শব্দ করছে। চারদিক তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। গাটা আবার ছমছম করে উঠল।

কাকু-কাকিমার অনেক বয়স হয়ে গেছে। কাকিমা তো চোখেও দেখতে পান না ঠিকঠাক। তারপরও পরিচয় পেয়ে যথেষ্ট আপ্যায়ন করলেন। ঘরটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। দরজা জানালা সব বন্ধ। চা খেতে খেতে আস্তে আস্তে সুহাসের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ডুকরে কেঁদে উঠলেন কাকিমা। কাঁদতে কাঁদতে খুলে বললেন সব।

সুহাস ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিতে কাজ নিয়ে মাস দেড়েকের মাথায় একটা রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। গাড়ি চালানো শিখছিল অল্প কয়েকদিন ধরে। একদিন ভোরবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে মোড় ঘুরতেই একটা লরির সাথে মুখোমুখি হয়ে...।

বলব কী বলব না ভাবতে ভাবতে এক সময় দু'দিন আগের ঘটনাটা সংক্ষেপে বললাম ওঁদের। কথার মাঝেই মুখ দুটো একেবারে সাদা হয়ে গেল কাকু-কাকিমারদের। কাকুর একটা হাত বেশ জোরে ঝাঁকিয়ে কাকিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমি তখন থেকে বলছি, ওঁর পিণ্ডটা দিয়ে এসো, দিয়ে এসো। গয়ায় না পারো এখানেই ব্যবস্থা হয় শুনেছি। এসব শোনার পরও ঠেকিয়ে রাখতে চাও?"

কাকু একবার চকিতে কাকিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওঁর সাথে আমাদেরটাও নয়... বয়স তো আর কম হয়নি। কী বলো?"

কাকিমা চটেমটে বললেন, "শুনলি, শুনলি অন্তু, তোর কাকুর কথাবার্তা?"

তারপর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "ছেলেটা মরার পর থেকেই এই করে যাচ্ছে। কখন কী বলছে তার কোনও ঠিক ঠিকানা থাকে না। আমার হয়েছে মরণ!"

কাকু শশব্যস্ত হয়ে বললেন, "আমি, আমি এর মধ্যেই ওবাড়ির হারুকে বলে ব্যবস্থা করছি। শুধু পুরোহিতকে একটিবার দিনক্ষণটা জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।"

গেট পেরিয়ে রাস্তায় আসতেই একটা লোক এগিয়ে এল। বলল, "আপনি? এই বাড়িতে কী করছিলেন অতক্ষণ ধরে?"

থতমত খেয়ে বললাম, "সুহাস আমার বন্ধু। ওঁর বাবা মাকে একটু দেখতে গেছলাম। আপনাকে তো ঠিক..."

লোকটা হাঁ করে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি হারু, হারধন সরকার। আপনি সুহাসের বাবা মা'র সাথে দেখা করে এলেন?"

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বসেছিলাম। অনেক কথা হল। কেন?"

"আপনি কি মিথ্যেবাদী, না প্রেতাত্মা মশাই? মাস দুয়েক আগে তিনজন যারা একই সাথে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল, আ-আপনি তাঁদের সাথে কথা বলে এলেন?"

"মানে? কী আজেবাজে বকছেন আপনি?"

"মানেটা হচ্ছে, সুহাস সেদিন ভোরে ওঁর বাবা মাকেও উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গাড়িতে শখ করে। তারপর কিছুদূর গিয়ে একটা মোড় ঘুরতেই... কেউই বাঁচেনি সেদিন। তিনজনই স্পটডেড।"

আমি টলতে টলতে কোনও মতে এগোতে লাগলাম অফিসের দিকে।

তারপর থেকে এখনও মাঝেমাঝে সুহাসের সেই ভূতুড়ে হাসির শব্দ কানে বাজে আমার। আর সাথেসাথেই বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

অলংকরণ – পুষ্পেন মণ্ডল

লেখক পরিচিতিঃ ত্রিপুরার মন্দিরনগরী উদয়পুরে জন্ম। বেড়ে ওঠা এবং স্থিতি গোমতী জেলার কাকড়াবনে। পেশায় একজন ফার্মাসিউটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউটর। নেশা, বই পড়া, সিনেমা দেখা আর কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অনেকদিন ধরেই লেখালেখি করছেন।

গল্পের ম্যাজিক::

ঘুম থেকে উঠেই অন্বয়ের মনে পড়ে গেল যে আজ শনিবার। মেজাজটাই তেতো হয়ে গেল। উফ্ আজ আবার সেই বিচ্ছিরি বারটা। আজ বলে নয়, প্রতি শনিবারই এটা হয় অন্বয়ের।

কেন হয়? প্রতি শনিবার কি ওর কোনও পরীক্ষা থাকে? কড়া কোনও স্যারের টিউশন থাকে কি? কিম্বা এমন কোনও কাজ যা অন্বয়ের মোটেই করতে ইচ্ছে করে না?

না, এসব কিছু নয়। তবে? বলছি, বলছি..........।

সেন্ট মার্টিন স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র অন্বয় মিত্র। পড়াশোনায় ঠিকঠাক। তবে যেটার জন্যে স্কুলে বেশ নামডাক অন্বয়ের তা হল ডিবেট। হ্যাঁ, ডিবেটে ও ওস্তাদ। স্কুলকে অনেক প্রাইজ এনে দেয় বলে টিচাররাও ওকে ভালোবাসে।

জয়েন্ট ফ্যামিলি অন্বয়দের। বাবা, মা, বোন, কাকাই, কাকিন, ভাই, ঘনশ্যামদা পারুলদি আর সবার ওপরে ঠামাই। অন্বয়ের বাবা তপনবাবু ব্যাংকে কাজ করেন। মা ঈশিতা দেবী ও ফুড ডিপার্টমেন্টে আছেন। বোন অনন্যা তিন বছরের ছোট অন্বয়ের থেকে। একই স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ে।

পড়াশোনা নিয়ে বাবা মা বা বাড়ির কেউই চাপ দেয় না অন্বয়কে বা ওর বোনকে। বরং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যক্টিভিটিতেই বেশি উৎসাহ দিয়ে থাকে সবাই। তপনবাবুর মতে, যেটাই করো না কেন, হান্ড্রেড পারসেন্ট দাও। তাহলে জীবনে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে। এদিক দিয়ে কোনও চাপ নেই অন্বয়ের। অন্যান্য বন্ধুদের বেলায় ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়... সব সময় বেশ চাপে থাকে তারা।

বোনটা একটু নালশেকুটে তবে দাদার ওপর আস্থাও কম না। দাদা যে মুখেই মারিতং জগত সেটা এই বয়সেই বুঝে গেছেও।

কাকাই হল অন্বয়ের ক্যারম পার্টনার। ছুটির দিনে জমিয়ে ক্যারম চলে বাড়িতে। সঙ্গে গরম গরম তেলেভাজা। সেও বাড়িতে বানানো। কাকিন যা বানায় না! কোনও কথা হবে না। আর আছে ছোট্ট কাটুস, কাকাই-কাকিনের দেড়বছরের ছেলে। অন্বয় বাড়ি থাকলে আর দেখতে হবে না। বল নিয়ে ওর পেছন পেছন ঘুরতে থাকবে খেলার জন্যে। খুব কায়দা করে ওকে কাটায় অন্বয়। না হলেই কাক- চিৎকার অর্থাৎ চিল চিৎকার জুড়ে দেবে।

ঘনশ্যামদা বাজার করে, বাইরের অন্যান্য কাজ করে। পারুলদি ঘরের কাজে হেল্প করে। ঠামাই এর কথা তো আগেই বলেছি। ঠামাই খুব ডিসিপ্লিন মেনটেন করা পছন্দ করেন। দাদুন মিলিটারি ক্যাপটেন ছিলেন তো। ঠামাই এর অভ্যাস হয়ে গেছে ডিসিপ্লিন্ড লাইফ। যেমন ধর, ঘুম থেকে উঠে সবাইকে এককোয়া রসুন, একটু করে হলুদ আর এক টুকরো আমাদা খেতেই হয়। এতে নাকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। হয়তো ঠিকই বলেন ঠামাই। এবাড়ির লোকজন খুব একটা ভোগে না। এছাড়াও গরম কালে মৌরি- ভেজানো জল, ভাতের পাতে টকদই... এই সব আর কী। বাড়ির কেউই ঠামাই এর কথা বিশেষ অমান্য করেনা। বিশেষ করে দাদুন চলে যাবার পর থেকে।

একটা ব্যাপারে এবাড়ির সবাই একরকম। সেটা হল প্রত্যেকেই প্রচন্ড খেতে ভালবাসে এবং আমিষের দিকেই পাল্লা ভারি।

নাতি- নাতনিদের ঠামাই খুবই আহ্লাদ দেন।

তবে তো দিব্যি কুল ফ্যামিলি। তা হলে শনিবার নিয়ে অন্বয়ের এত অ্যালার্জি কেন?

হবে নাই বা কেন? প্রতি শনিবার যে পুরোপুরি নিরামিষ রান্না হয় অন্বয়দের বাড়িতে। ঠামাইয়ের নির্দেশ। ওনার মতে একদিন অ্যানিম্যাল প্রোটিন বাদ দেওয়া উচিত। তা ছাড়া আজ কাল যা মাছ- মাংসের দাম, একদিন বাদ দিলে একটু সাশ্রয়ও হবে।

এইজন্যেই অন্বয়ের মোটেও ভাল লাগে না শনিবার। ওই সব গাছ- পাতা খাওয়া যায়? আর পনির তো -- ইয়াক্।

মাটন, চিকেন, মাছ না হোক, নিদেন পক্ষে ডিম তো হতে পারে। সস্তায় পুষ্টিকর! কিন্তু ওইযে, ঠামাইয়ের কথার ওপর কথা নয়। মনে মনে সবাই অখুশি কিন্তু বলতে পারেনা। বেশি বড় হয়ে গেলেও ঝামেলা।

অনন্যা অনেকদিন ধরে ঘ্যান ঘ্যান করছে অন্বয়ের কাছে। 'অ্যাই দাদা, তুই তো কথায় সব্বাইকে কুপোকাত করিস, ঠামাইকে হারিয়ে দে না কথায় যাতে শনিবার আর ভেজ খেতে না হয়।'

কিছু তো একটা করতে হবে। ভেজের হাত থেকে মুক্তি প্লাস ডিবেটর হিসেবে বোনের কাছে প্রেস্টিজ বাঁচানো।

আজও একটা ইন্টারস্কুল ডিবেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অন্বয়দের স্কুল। কৃতিত্বটা সত্তর ভাগই অন্বয়ের। বেস্ট স্পিকারের ট্রফিটাও ওই পেয়েছে। স্কুল থেকে ফিরে লাফাতে লাফাতে ঠামাইয়ের কাছে আগে যায় অন্বয়। বাবা, মা এখন অফিস থেকে ফেরেনি। ঠামাই তো বিগলিত নাতির কৃতিত্বে। গায়- মাথায় হাত বুলিয়ে, কপালে দুটো হামি দিয়ে বলেন, ' দাদুভাই কী খাবে বল। যা খেতে ইচ্ছে করছে বল, রবিবার রান্না হবেখন।'

এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল অন্বয়। খাওয়া- দাওয়া প্রসঙ্গ না উঠলে আরও যুক্তি ফলায় কী করে?

আজ শুক্রবার, কাল শনিবার... জয় বজরঙ্গবলী!

'ঠামাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় দাদুভাই। বলনা'

'আচ্ছা, পেঁয়াজ আমিষ না নিরামিষ?'

'পেঁয়াজ তো আমিষ। কেন দাদুভাই?'

'পেঁয়াজ কোথায় হয়? গাছে তো?'

'তা তো বটেই। গাছ থাকে মাটির ওপরে আর পেঁয়াজ মাটির নিচে। কেন, তুমি জানো না?'

'জানি তো'

'তবে?'

'তাহলে কী দাঁড়াল ঠামাই, গাছ নিরামিষ আর তার ফল আমিষ। তাইতো?'

'হুম' --- ঠামাই ঠিক ধরতে পারেননা গাড়ি কোন দিকে যাচ্ছে।

'তা হলে ঠামাই তুমি বল, মাছ আমিষ হলেও তার ডিম তো নিরামিষ হওয়া উচিত। নয় কী?'

'সে কী কথা দাদুভাই! মাছের ডিম কী করে নিরামিষ হবে? সে তো মাছেরই বাচ্ছা।'

'মাছের বাচ্ছা কিন্তু মাছ তো নয়। না সে চলে ফেরে, না তার মুখ- চোখ- লেজ আছে। নিরামিষ গাছে যদি আমিষ বাচ্ছা হয় তবে আমিষ মাছের বাচ্ছা নিরামিষ হবে না কেন? তুমি ভাল করে ভেবে দেখ।'

এটা যে বিলকুল কুযুক্তি তা ভালই জানে অন্বয়। কিন্তু যুক্তি সু হোক বা কু, মানুষকে কনভিন্স করে মেনে নিতে বাধ্য করায় বলেই তো ও চ্যাম্পিয়ন।

ঠামাই কিছু বুঝতে না পেরে বলেন, 'আচ্ছা বেশ, তা যদি হয়েও থাকে, তাতে কী হবে?'

'তা হলে শনিবার করে আমরা মাছের ডিম খাব। ভাজা, ডালনা... কাকিন রাঁধবে। তোমার কথাও থাকল আর আমাদেরও দিলখুশ।'

ঠামাই হেরেই গেলেন বড়নাতির কাছে। ঘনশ্যামদাকে পরের দিন মাছের ডিম আনতে বলে দিলেন। বাড়ির সবাই যখন জানল ঘটনাটা, একসাথে বলে উঠল... 'থ্রি চিয়ার্স ফর অন্বয়বাবু।'

হাততালি দিল পুঁচকে কাটুসও। মহাখুশি অনন্যা। ওর দাদা গ্রেট!

কাল শনিবার, অন্বয়দের বাড়িতে গাছের বাচ্ছা দিয়ে মাছের বাচ্ছার ফাটাফাটি ডালনা হবে..... আসবে নাকি?

ছবি - তন্ময় বিশ্বাস এবং রাখী নাথ

লেখক পরিচিতিঃ কিশোর ভারতীর সম্পাদকীয় দফতরে আছেন প্রায় দশ বছর। কবিতা ক্লাবের সদস্যদের প্রেরণায় লেখা শুরু করেন। পত্র ভারতীর সঙ্গে তিরিশ বছরের সম্পর্ক। অবসর পেলেই ছোটোদের জন্য কলম ধরেন।

গল্পের ম্যাজিক::

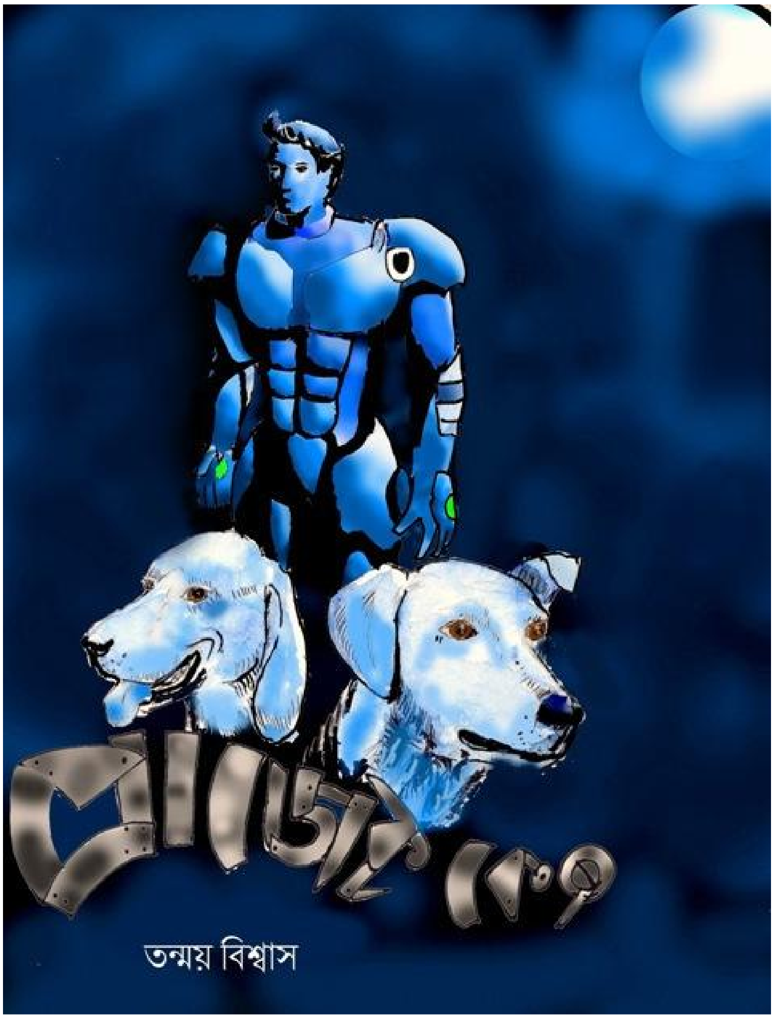

প্রজেক্ট কে নাইন

তন্ময় বিশ্বাস

10/2/2232 (10:01:23:54 AM)

'তোমার অ্যাসাইমেন্ট রেডি?'

'হ্যাঁ...... ইয়ে মানে না... আজ রাতের মধ্যেই কমপ্লিট হয়ে যাবে।'

'আজ লাস্ট ডেট। আই হোপ সেটা মনে আছে?'

'ইয়েস স্যার'

'বাকিদের সফট ফাইল কিন্তু জমা পড়ে গেছে। এবং প্রত্যেকেরটাই বেশ ইন্টারেস্টিং। আই হোপ তোমারটাও তাই হবে?'

'একদম স্যার।'

'ওকে বেস্ট অফ লাক।'

বসের চৌকো মতো মুখখানা অদৃশ্য হয়ে গেল। বস সামনে এলেই আমার মাথা হ্যাং মারে। আগেকার দিনেই ভালো ছিল। ফোনে শুধু অন্য প্রান্তের কথা শোনা যেত। কথা বলতে বলতে কান খোঁচানো যেত। চোখ মুখ

কুঁচকে, মুখ ভেংচানো যেত। কিংবা বাড়িতে বসেও দিব্যি বলা যেত, বাজার করছি! আর এখন! সামনে খানে থ্রি ডি হলোগ্রাম এসে হাজির! আর তার ওপর বসের ওই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চোখ দুটো। যেন দুটো লেসার গান!

আজ এমনিতে আমার অফ ডে। অন্য দিন হলে এই অফ ডে গুলো তে চূড়ান্ত রকমের বোর হই। বাবার মুখে শুনেছিলাম, আগেকার দিনে লোকে ছুটির দিনে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিত! কিন্তু আজকের দিনে এই জিনিসের বড্ড অভাব।

এখন তো বাজারে ‘ডলফিন ব্রেন’ টেকনোলোজি চলে এসেছে। ব্রেনের ওপর ছোট্ট একটা লেজার সার্জারি, ব্যস। ব্যাপারটা কিছুই নয়, ডলফিন যেমন কখনও পুরোপুরি ঘুমোয় না, ডলফিনের ব্রেনের একটা সাইড যখন ঘুমায় অন্যটা তখন সচল থাকে। এই সার্জারিতে মানুষের ব্রেনও ঠিক তেমনি হয়ে যাবে। অর্থাৎ, একজন চাইলে দুমাস বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করে যেতে পারে! তবে মানুষের ব্রেন অবশ্য আরও বেশি জটিল। সেটা কীভাবে এমন করা হচ্ছে, অত টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি আমি জানি না।

যাই হোক, অফ ডে গুলো বোরিং হলেও কেটে যেত। কিন্তু, কথায় আছে সুখে থাকতে রোবটে কিলোয়! পাকামি মেরে ওই হতচ্ছাড়া অ্যাসাইমেন্টটা নিতে গেলাম!

আমাদের কোম্পানি একটা মাল্টিন্যাশানাল রোবটিক্স কোম্পানি। সারা পৃথিবী কে যান্ত্রিক করার ভার একাই যেন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তা সেখানেই একটা নতুন প্রোজেক্ট শুরু হতে চলেছে। কিছু একেবারে ইউনিক রোবট বানানো হবে। যা আগে কেউ বানানো তো লাইট ইয়ার দূরের কথা, কেউ কল্পনা পর্যন্ত করে নি। এবং সে গুলো যেন সোসাইটির উপকারেও লাগে!

এমনিতে লিস্টে আমার নাম ছিল না। কিন্তু ওই যে বললাম সুখে থাকতে রোবটে কিলোয়। ভাবলাম মাঝে অফ ডে। অ্যাসাইমেন্ট- ফ্যাসাইমেন্ট থাকলে দিব্যি কেটে যাবে।

আর এখন? মাথার সব কটা চুল একটা একটা করে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। যেচে নিয়েছি, আর বস এখন যেচে জিজ্ঞেস করতে আসছে।

একটা ক্লিনিং রোবটের কথা ভাবছিলাম। বিল্ডিং গুলোর গায়ে রোজ রোজ যা ধুলো জমে, তা আর বলার নয়। আর তা পরিষ্কার করা আরেক ঝক্কি। ২০০, ৩০০ তলার প্লেন দেওয়াল, পরিষ্কার করা তো মুখের কথা নয়! কিন্তু, রোবটের ডিজাইন কী হবে? যত ওপরে যাওয়া যায় হাওয়ার দাপট তত বাড়ে। ওই হাওয়ার দাপট সামলানোর ক্ষমতা থাকা চাই, এমন ডিজাইন! নাহ, এ আমার দ্বারা হবে না। অন্য কিছু ভাবতে হবে।

তাই মাইন্ড ফ্রেসের জন্য হোম কম্পিউটারের, স্টোর রুমের ফাইলটা খুলে বসলাম। এখানে আমার পূর্বপুরুষদের যে সব জিনিস ফেলে দেওয়া হয়েছে, সে গুলো স্ক্যান করে রাখা আছে। যাতে ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয়, তবে যেন থ্রিডি প্রিন্টারের সাহায্যে সেগুলো আবার বানিয়ে নেওয়া যায়।

ফাইল সার্ফ করতে করতেই জিনিসটা প্রথম চোখে পড়ল। একটা রেক্টট্রাঙ্গুলার পাত, সম্ভবত কাঠের তৈরি। আগেকার দিনে অ্যানালগ সাইন বোর্ড গুলো যেমন হতো অনেকটা সেরকম দেখতে। বোর্ডে একটা কিছু লেখা আছে, আর নিচে অদ্ভুত একটা প্রাণীর ছবি! হাতে আঁকা। শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। খাড়া খাড়া দুটো কান, লম্বাটে মুখ আর ধারাল দু পাটি দাঁত।

লেখাটা বাংলাতেই লেখা। কিন্তু সমস্যা হল সেই কোন ছোট বেলায় স্কুল পাশের জন্য বাংলা শিখেছিলাম। এখন বাংলা মোটামুটি বলতে পারলেও, পড়তে গেলে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়!

যাই হোক প্রায় ১৫মিনিট ২০ মাইক্রো সেকেন্ডের চেষ্টায় লেখাটা উদ্ধার করতে পারলাম।তিনটে শব্দ 'কুকুর', 'হইতে', 'সাবধান'।মানে কোনও কিছুর থেকে সাবধান করা হচ্ছে। সম্ভবত এই প্রাণীটার নামই কুকুর।কিন্তু এ জিনিস আগে দেখিনি!

আমার কম্পিউটারের থিংক ক্যাচার খারাপ, তাই ভয়েজ কমান্ড দিতে হল।

'কু-কু-র'

সাথে সাথে ডান দিকে দেওয়াল জুড়ে ভেসে উঠল অদ্ভুত একটা পশুর ছবি। গায়ের রং লালের দিকেই, মাঝে মাঝে সাদার ছিটে। চারটে পায়ের ওপর ভর দিয়ে পশুটা দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে ছোট্ট মতো একটা লেজ। বুঝলাম সাইন বোর্ডে এরই ছবি আঁকা হয়েছে। কিন্তু এটার কান দুটো কেমন ঝোলা ঝোলা!

তারপর স্ক্রিনে নানা তথ্য ফুটে উঠতে লাগল। অপ্রয়োজনীয়গুলো বাদ দিয়ে যা বুঝলাম। এই পশুটার বিজ্ঞান সম্মত নাম ক্যানিশ ফ্যমিলিয়ারিস। আদিম যুগে যখন মানুষ জীবজন্তুদের পোষ মানাতে চেষ্টা করে, তখন এই কুকুর ই নাকি প্রথম পোষ মানে!

এরা ছিল খুব প্রভুভক্ত প্রাণী। প্রভুর জন্য প্রাণ দিতেও নাকি দুবার ভাবত না। আর এদের ঘ্রাণ শক্তি আর শ্রবণ শক্তি এতটাই পাওয়ার ফুল ছিল, যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টেও কাজে লাগানো হত।

একসময় পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের কুকুর পাওয়া যেত! শুধু আমাদের এই কলকাতার রাস্তাতেই নাকি 20TH সেঞ্চুরি তে প্রায় ৩হাজার কুকুর ছিল। সারা অঞ্চল দাপিয়ে বেড়াত। কিন্তু তারপর অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। এধার ওধার হাইরাইজার বিল্ডিং আর মানুষের অত্যাচারে এরা শেষ হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু ভারতে নয় অন্যান্য দেশেও তাই। দেখভাল করার সময় না থাকায় তখন আর কেউ কুকুর পুষতে চাইত না.......ইত্যাদি ইত্যাদি।

পড়া শেষ করে হাঁক দিলাম, 'H008, এদিকে আয় তো একবার'।

'হ্যাঁ বলুন। আরেক বার ওয়ার্ন করছি। আমাকে তুই তোকারি করবেন না প্লিজ।'

উফ, কী দিন কাল এল। এখন রোবট চাকরগুলোও কথা শোনাচ্ছে! যত নষ্টের গোড়া ওই 'রোবট রেস্পেক্ট অ্যাক্ট' ধারা টা। ওটা পাশ হওয়ার পর থেকেই ব্যাটারা মাথায় উঠে বসেছে। বাবাদের সময় এমনটা ছিল না। মুখ বুজে নিজের কাজ করে যেত। সাত চরেও রা কাটত না। আহা নাম টাও কী মিষ্টি। রঘু। খটাং খটাং করে চলাফেরা করতো। গোল গোল চোখ আর মুখে একটা ফিক্সড হাসি।

কিন্তু কী আর করা যাবে, সেই রোবট গুলো তো এখন ব্যানড করে দিয়েছে। তার জায়গায় এসেছে এই অবতারগুলো। চক চকে বডি কভার। প্লেন কাঁচে ঢাকা মুখ। চোখ মুখের কোনও বালাই নেই। চলা ফেরার কোনও আওয়াজ নেই। আছে যেটা সেটা হল দেমাক। তাও যদি বুঝতাম অ্যান্ড্রয়েড!

'এই সাইন বোর্ড টা দেখছ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'এটা আমাদের বাড়িতে কী ভাবে এল তার ফুল ডাটা চাই। ওকে?'

'ওকে স্যার। আপনি কি কোথাও বেরুচ্ছেন?'

'কেন তোমার পারমিশন নিতে হবে নাকি?'

'এ গুলো জিজ্ঞেস করা আমার পোগ্রামিং এর মধ্যে পরে।'

‘উফ! হ্যাঁ টাইম ট্র্যাভেল এজেন্সি তে যাচ্ছি। আর কিছু?’

‘টেক কেয়ার’।

10/02/2232 (12:00:30:23 PM)

মনে মনে কথা বলাটা আমার একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আসলে এটা আমার একটা হবি। আমি আমার ব্রেনে একটা স্পেশাল বায়োচিপ ইনস্টল করেছি। আমি মনে মনে বা মুখে যা বলি, যা শুনি, সব গিয়ে স্টোর হয় ওই চিপে। এবং চিপ সেটা আবার হোম কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। ওখানে সব ডেটা গুলো টাইম সমেত স্টোর হয়ে যায়। আগেকার দিনে অনেকের যেমন ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল। ব্যাপারটা অনেক টা সেরকম।

এখন বসে আছি টাইম ট্র্যাভেল এজেন্সির রিশেপসানে। টাইম ট্র্যাভেল কলকাতায় এই প্রথম। তা চালু হয়েছে মাস তিনেক হয়ে গেল। আমার আগে ট্রাই করা হয় নি।

কুকুরের কথা জানার পর মাথায় একটা আইডিয়া এল।অ্যানড্রয়েড কুকুর বানালে কেমন হয়? এখন তো চারদিকে অ্যানড্রয়েড এর ছড়াছড়ি। কিন্তু, অ্যানড্রয়েড পশুর ওপর তেমন কাজ হয় নি! একবার অ্যানড্রয়েড ডাইনোসরের কথা উঠেছিল বটে। কিন্তু, ডাইনোসর তো কোনও কাজেই লাগে না। আর কুকুর তো খুব ইউজ ফুল অ্যানিমাল। এটা যদি একবার বানানো যায়........!

ওফ!

প্রজেক্ট কে নাইন!চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি।কাল অফিসে সবাই এটা নিয়েই বলাবলি করছে। বসের চৌকো মুখে এক গাল হাসি।পিঠ চাপড়ে বলছে, ' ওয়েল ডান রায়চৌধুরী। '

আর তার কিছু দিন পর। পৃথিবী ছেয়ে যাচ্ছে অ্যানড্রয়েড কুকুরে। তারা ছুটে যাচ্ছে মানুষের আপদে বিপদে। ছড়িয়ে দিচ্ছে আনন্দ। আর ইতিহাসের পাতায় টুক করে ঢুকে পড়ল আমার নাম! তবে কুকুর গুলোর নাম আবার আমার নামে না রেখে বসে!

‘মিঃ রায়চৌধুরী?’

একটা ভদ্রস্থ পোশাক পরা ছেলে এগিয়ে এল। বেশ স্মার্ট। অ্যানড্রয়েড না মানুষ বোঝা যাচ্ছে না।

‘হ্যাঁ আমি’।

‘ওয়েলকাম টু আওয়ার এজেন্সি। বলুন কী ভাবে সাহায্য করতে পারি?’

‘আমি টাইম ট্র্যাভেল এর ব্যাপারে জানতে এসেছি। খরচ পাতি...’

‘দেখুন স্যার একচুয়েল কোনও ফিক্সড রেট নেই।আপনি কোথায় যাবেন, কোন সময় যাবেন এবং কতক্ষণ থাকবেন তার ওপর ডিপেন্ড করছে।’

‘এই ধরুন, আমি ওই মোটামুটি একবিংশ শতকের কলকাতায় যাবো, তো....’

‘হ্যাঁ এতে খুব বেশি খরচ পড়বে বলে মনে হয় না। আপনি যতক্ষণ থাকবেন তার ওপর এখন....’

‘খুব ভাল, ইয়ে...মানে সাইড এফেক্ট-টেফেক্ট কিছু আছে নাকি?’

‘না না, কিসের সাইড এফেক্ট?’

'এই ধরুন ওখানে গিয়ে কিছু করে বসলাম। তো তাতে ইতিহাস বদলে যাবে না?'

এবার অ্যান্ড্রয়েড ছোকরা মুখে একটা রহস্য রহস্য হাসি মেখে বলল 'ইতিহাস বদলানো যায় না স্যার। আপনি চাইলেও পারবেন না। তাহলে সব অ্যারেঞ্জ করবো স্যার?'

'হ্যাঁ'।

তারপর একগাদা ফর্মালিটির বেড়া টপকে, অবশেষে অ্যানড্রয়েড ছোকরা আমাকে ছোট একটা রুমে নিয়ে এল। অ্যানড্রয়েড বলছি, কারণ আজ কাল আর মানুষ এত আন্তরিক ভাবে কথা বলে না!

ঘরটা বেশি বড় নয়। ফ্লুরসেন্ট পেন্ট দিয়ে রঙ করা। আজকাল এটা খুব উঠেছে। ঘরে আলোর দরকার হয় না রঙই যথেষ্ট!

ঘরটার ঠিক মাঝখানে গোল মতো একটা চাকতি। তার ওপর খাড়া করা আছে একটা কাঁচের টিউব। ব্যাস প্রায় চারফুট মতো। আর টিউবটাকে ঘিরে গুচ্ছের যন্ত্রপাতি। ঘরের একপাশে রাখা একটা সুপার কম্পিউটার। ছোকরা কম্পিউটারে কিছু করল। তারপর একটা জিনিস আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল 'স্যার এটা আপনার লাগবে। এই ডিভাইসে অনেক ডাটা স্টোর করা আছে। কোনও কিছুর সম্বন্ধে জানতে হলে এটা তার সামনে ধরবেন বা ভয়েস কমান্ডও দিতে পারেন।'

'কেন আমার সুপার গ্লাসে হবে না?'

'না স্যার। ওখানে তো সিগনাল পাবেন না'।

আমার হাতে যে ডিভাইস টা দিল সেটা দেখতে অনেকটা, ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের মতো। ছোট একটা গোল স্ক্রিন আর একটা হাতল। হাতলে দুটো সুইচ।

'এই যে লাল সুইচ টা দেখছেন। ওটা টিপলে আপনি আবার রিটার্ন চলে আসবেন। যান এবার ওই টিউবের মধ্যে দাঁড়ান''।

আমাকে টিউবের মধ্যে পুরে ছেলেটা সুপার কম্পিউটারের কাছে চলে গেল। ছেলেটাকে আমার বেশ ভালো লেগে গেছে। হোক না অ্যানড্রয়েড। ওর নামটা জানা হল না।

হঠাৎ, আমার চারদিকে কয়েকটা লাল আলো জ্বলে উঠল। লাইট বলও বলা যায়। আস্তে আস্তে বল গুলো আমার চার দিকে স্যাটেলাইটের মতো পাক খেতে লাগল। ক্রমশই তাদের বেগ বাড়ছে। একটু পরেই লাল ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। লাল লাল আর লাল। তারপর হঠাৎ করেই সব অন্ধকার হয়ে গেল। একদম ব্ল্যাক আউট!

কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ সয়ে গেল। প্রথমেই চোখে পড়ল একটা আলো। টিম টিম করে জ্বলছে। যেন এখুনি অন্ধকার তাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবে! এটা একটা লাইট পোস্ট।

আমি দাঁড়িয়ে আছি খুব সরু একটা রাস্তায়। রাস্তাটা দড়ির মতো এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে। আমিও এগুলাম। আশেপাশে সার সার বাড়ি ঘর কোনওটাই দু-তিন তলার বেশি নয়! চারদিক খাঁ খাঁ। যেন এখানে আমিই একমাত্র জীবিত প্রাণী। বাড়িগুলো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কোথাও কোথাও চটে গিয়ে ইঁট বেরিয়ে পরেছে। বাড়ি গুলোর গায়ে একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। দেখতে অনেকটা ভেলভেটের মতো। সবুজ সবুজ রঙ। হাতের ডিভাইস টা বাগিয়ে ধরলাম। সাথে সাথে গোল স্ক্রিনে রকমারি ইনফরমেশন ফুটে উঠল। এটার স্থানীয় নাম শ্যাওলা। এটা মস জাতীয় একধরণের মূল বিহীন উদ্ভিদ। সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায়

জন্মায়। এই সময়ে, মানে ২০০৭ এ দেওয়ালে ফাইবার কোটিং দাওয়া হত না। তাই জল সোপ করে এই শ্যাওলা জন্মাত!

আবার চলতে লাগলাম। এখানে ওখানে অন্ধকার জমে আছে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। চারদিকে কেমন যেন পুরানো পুরানো গন্ধ। পাড়াটা বেশ পুরানো । যেন অন্ধকার মেখে দাঁড়িয়ে আছে আস্ত সব ইতিহাস।

হঠাৎ, লাইট পোস্ট গুলো সব কানা হয়ে গেল। পাওয়ার কাট! এই সময়ে পাওয়ার সাপ্লাই খুব খারাপ ছিল। তাই মাঝেই এমন হত।

কিন্তু কী আশ্চর্য , কই অন্ধকার হল না তো! চারদিক এক আশ্চর্য রুপোলী আলোয় ভরে গেল! ওপরের দিকে তাকালাম। একটা বিশাল আকাশ। তাতে ফুটে আছে অসংখ্য তারা আর থালার মতো একটা চাঁদ। এটা তবে চাঁদের আলো! চাঁদের আলো এত সুন্দর হয়? এত মায়াময়! সত্যি আমি কোনওদিন চাঁদের আলো দেখিনি। সভ্যতার আলোর চোটে ২২৩২ এর মাটিতে চাঁদের আলো পৌঁছায় না।

আকাশ থেকে যেন রুপো ঝরছে। ডিভাইসটাতে এই আলোর খুব সুন্দর একটা নাম পেলাম। 'জ্যোৎস্না!'

আমাদের যুগটা সব পেয়েছির যুগ। অসম্ভব শব্দটা নাকি বিজ্ঞানীরা মুছে দিয়েছেন!কিন্তু তারা কি পারবে, আবার এই জ্যোৎস্না, এই ইতিহাস, পুরানো পোড়ো বাড়িগুলো ফিরিয়ে দিতে? না।পারবে না।কারণ তারা নিজেরাই তা ছিনিয়ে নিয়েছে।

হঠাৎই একটা শব্দ কানে এল। গোঁ গোঁ-গরর্।আমার ঠিক ডান পাশে আলো ছায়া মাখা একটা সরু গলি। আর সেখানে দাঁড়িয়েই আমাকে ঠিক যেন শাসাচ্ছে চারপেয়ে একটা জীব। তার চকচকে দাঁতগুলো থেকে চুঁইয়ে পড়ছে জ্যোৎস্না। ডিভাইসটা সামনে ধরলাম। হ্যাঁ সন্দেহ নেই এটাই সেই 'কুকুর'!

কুকুরটা একই রকমভাবে গোঁ গোঁ করতে করতে এগিয়ে এল। তার জ্যোৎস্না ভেজা শরীরটা কী রঙের তা বোঝা যাচ্ছে না। এরা রাতে পাড়া পাহাড়া দিত। সন্দেহ জনক লোক দেখলেই তেড়ে যেত। তা আমাকে দেখেও যে সন্দেহ হবে তাতে আর আশ্চর্য কী!আমার পোশাক আশাক এ যুগের থেকে অনেকটাই আলাদা!

সে আরও কয়েক পা এগিয়ে এল। নাখের ফুটো গুলো ছোট বড়ো হচ্ছে। গন্ধ নিচ্ছে। এক অজানা গন্ধ। এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার কাছে একে ঠেকানোর মতো কিছু নেই। তাই হাত রাখলাম ডিভাইসের লাল বোতাম টার ওপর।

ঠিক তখনই ওর পিছন থেকে কুঁইকুঁই করে একটা শব্দ এল। কেউ যেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

কুকুরটা সাথে সাথে সেদিকে ছুটে গেল। আর কী আশ্চর্য আমিও ভয়ডর ভুলে পিছন পিছন এগুলাম! একটু এগিয়েই একটা কানা লাইট পোস্ট। তার ঠিক নিচেই শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে প্রায় একফুট লম্বা একটা প্রাণী। কুকুরটা তার সারা গা চেটে দিচ্ছে। যেন আদরে ভুলাচ্ছে তার ছানাটিকে। তার গোলাপি জিভ থেকে ঝরে পড়ছে একরাশ স্নেহ। একরাশ মমতা।

আমি কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম। সে একবার ফিরে তাকালো। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল। এদের মস্তিষ্ক মানুষের মতো উন্নত নয়। তাই প্রকৃতি এদের দিয়েছে কিছু ক্ষমতা। যেমন মানুষ চেনার ক্ষমতা। বিজ্ঞান হাজার চেষ্টাতেও যা আয়ত্ত করতে পারবে না।

মা কে কাছে পেয়ে ছানাটি এখন বেশ শান্ত। শুধু মাঝে মাঝে ক্ষীণ ভাবে কুঁই কুঁই করে কী সব যেন অভিযোগ করছে!

ছানাটার পিঠের কাছে একটুকরো অন্ধকার! ডিভাইসের আলো সেখানে ফেলে চমকে গেলাম। ওখানে একটা দগ দগে ঘা! চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে লাল হয়ে আছে। হলুদ মতো একটা রস গড়িয়ে পড়ছে।

এ নিয়ে ছানাটা বেশি দিন বাঁচবে না!

আমার পকেটে সব সময় এক পাউচ আইরেটেড পাউডার থাকে। এটা এখন খুব পপুলার প্রোডাক্ট। যে কোনও কাটা ছেঁড়া জায়গায় ছড়িয়ে দিলে, সেখানকার কোষ উৎপাদনের হার বহুগুণ বেড়ে যায়। এবং কিছুক্ষণ পরে সেখানে কাটা দাগ ছাড়া আর কিছু থাকবে না!

বাঁ হাতটা মা কুকুরটার মাথায় রাখলাম। সেখানে ছোট ছোট লোম। হাত বোলালে সরে সরে যাচ্ছে। সে আরামে চোখ বুজল। সেই সুযোগে ডানহাতে ধরা পাউডার ছড়িয়ে দিলাম ছানাটার পিঠে। ওষুধটাই একটু চির বির করে। সেই জন্যই বোধহয় পুঁচকে টা কুঁইকুঁই করে উঠল। সাথে সাথে মা তার ছানা দিকে তাকালো। কিন্তু ততক্ষণে ম্যাজিক শুরু হয়ে গেছে। ঘায়ের গর্ত দ্রুত ভরাট হচ্ছে। একটা সময়ের পর ছাই রঙের আস্তরণের নিচে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল!

তখন মায়ের আনন্দ আর দেখে কে। কুঁইয়াও কঁউয়াও করে আমার চারদিকে লাফালাফি শুরু করে দিল। একবার আমার কাছে এসে গা ঘষছে পরক্ষনেই লেজ নাড়তে নাড়তে, জিভের আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে আমার হাত মুখ। এরা উপকার বোঝে!

পুঁচকেটাও ততক্ষণে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভুক ভুক করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। আর এত জরে জোরে লেজ নাড়ছে যে নিজেই ব্যালেন্স করতে পারছে না।

আরে বাচ্চাটা মাঝে মাঝে কাঁপছে কেন? তখনি খেয়াল হল এয়ার কন্ডিশন শুট পরে আছি বলে কিছু বুঝতে পারছি না। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ডিভাইসে দেখলাম ১৩ ডিগ্রি.সি। এই শীতের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা কি ওর আছে?

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বড় বড় দুটো চোখ মেলে। দু চোখে টলমল করছে দুটো চাঁদ।

তুলতুলে নরম শরীরটাকে নিয়ে এগিয়ে চললাম। মাটাও চলল সাথে সাথে। আমি যেন তার অনেক দিনের চেনা। আমার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। ওর অবচেতন মন বলছে যে ওর বাচ্চা সুরক্ষিত। শুধু মাঝে মাঝে দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দেখে নিচ্ছিল তার সন্তান কে!

নিজেকে আমার বড় অচেনা লাগছিল। আচ্ছা যন্ত্রে কি আদৌ এদের ধরা যায়? ২২৩২ এর কোনও ডিজাইন, কোনও পোগ্রামিং কি ছুঁতে পারবে এদের এই ভালোবাসা? এই কৃতজ্ঞতা বোধ?

একটা বাড়ির গেট খুলে ঢুকলাম। গেটে কোনও রকমের লক নেই। দোতলা বাড়ি। সামনে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে বাগান। বড়ো বড়ো ঘাসের ওপর বরফের মতো জ্যোৎস্না জমে আছে। এক জায়গায় শুকনো পাতার ঢিবি। সেখানেই ছানাটাকে নামিয়ে রাখলাম। এবার ফেরা যাক। শেষ বারের মতো তাকালাম। মা কুকুরটা পাতার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে। ছানাটার মাথা মায়ের কোলে গোঁজা। আরামে বোজা দুটো চোখ। চাঁদের আলো হাত বোলাচ্ছে তাদের সারা শরীরে।

ডিভাইসের লাল সুইচটায় চাপ দিলাম। সাথে সাথে চার দিক থেকে ঘিরে ধরল সেই আলোর দল।

আচ্ছা, সকালে যদি বাড়ির মালিক ওদের তাড়িয়ে দেয়? শুনেছি কিছু কিছু মানুষ এদের প্রতি এতটায় নিষ্ঠুর হত যে পিটিয়ে বা কেরোসিন ঢেলে মেরে ফেলতেও পিছপা হত না! সেরকম কিছু......। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। লাল আলোগুলো পাক খেতে খেতে আমাকে ঢেকে ফেলেছে। লাল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আর তার পরেই সব অন্ধকার!

10/2/2232 (8:23:20:13 PM)

'শ্যাওলা!''

ইয়েস স্যার।

টোয়েন্টি ওয়ান সেঞ্চুরিতেও এগুলো দেখা যেত। দেওয়ালে জল শোপ করে জন্মায়। ''ওকে...''আমার ক্লিন রোবটটাকেও ওই ডিজাইনে বানাতে চাইছি। এটা ভ্যাকুয়ামের সাহায্যে দেওয়ালের সাথে চেপ্টে থাকার ফলে, হাওয়ার ফোর্সটাকে ইগ্নোর করতে পারবে। আর রোঁয়া গুলো একটু নাড়াচাড়া করে সহজেই ক্লিন করতে পারবে। তবে এই দেওয়াল বেয়ে চলাফেরা করার ব্যাপারটায় অন্য ডিপার্টমেন্ট এর হেল্প নিতে হতে পারে।'' হুমম ইন্টারেস্টিং। কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার হল না। ওকে, তুমি কাল এসে ডিটেলে আমাদের বোঝাও। গুড নাইট।''ওকে। গুড নাইট স্যার। 'জানলার সামনে থেকে বস মিলিয়ে গেল। কাঁচের ওপারে একটা হলুদ চাঁদ। এ চাঁদের আলো নেই। জ্যোৎস্না নেই। শুধু উদাস ভাবে চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। সভ্যতার দিকে।ডানদিকে তাকালাম। স্ক্রিনে ভেসে আছে আগেকার যুগের একটা টু ডি ফটোগ্রাফ। এটা H008, আমাদের ফ্যামিলির ফাইল ঘেঁটে খুঁজে পেয়েছে। ফটোটার পিছনে দেখা যাচ্ছে একটা দোতলা বাড়ি। এটা আমাদের ২০ জেনারেশান আগের বাড়ি। আর সামনে বেশ পোজ দিয়ে মা এর সাথে বসে আছে একটা কুকুর ছানা। যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে বিজ্ঞান কে। ও হ্যাঁ ছানাটার পিঠে আইরেটেড পাওডারে শুকিয়ে যাওয়া, একটা কাটা দাগ!

ছবি - তন্ময় বিশ্বাস

গল্পের ম্যাজিক::

যুক্তি-তক্কো-অঙ্ক

তাপস মৌলিক

একেই বলে পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। শনিবার হোস্টেল থেকে বাড়ি ফিরছি। হাওড়া স্টেশনে কাটোয়া লোকালে উঠেই জানালার ধারের একটা একানে সিট পেয়ে গেলাম। তাও মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছিল। কারণ সিটটা ট্রেন যেদিকে যাবে সেদিকে পেছন করে, তার মানে হাওয়া পাব না। এমন সময় আমার উল্টোদিকের বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, "ভাই, তুমি এদিকের সিটটায় বসবে? আমি তাহলে তোমার সিটটায় বসতে পাই।" এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া যাবে। ওই সিটটাই তো বেশি পছন্দ আমার।

সিট পালটে ভদ্রলোককে ভাল করে দেখলাম। বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। ফরসা, বেঁটেখাটো চেহারা। মাথায় কিছুটা টাক, কিছুটা সাদা চুল। মুখে অল্পস্বল্প গোঁফদাড়ি, সেও সাদা। গোলগোল চশমার পেছনে তীক্ষ্ণ চোখদুটোও গোলগোল। ভুরু প্রায় নেই। কেমন জাপানি-জাপানি চেহারা। পরনে বিস্কুট রঙের খদ্দরের ফতুয়ার সাথে সাদা পাজামা। কোলের ওপর একটা বালিশের মত ফুলো কাপড়ের ব্যাগ আঁকড়ে মিটিমিটি হাসছেন। তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, "দেখছ কী? আমার নাম জানো?"

এই মরেছে! আমি ওনার নাম জানব কী করে? মাথা নেড়ে না বলতেই বললেন, "সে কী! আমায় চেন না? আমার নাম উৎফুল্ল পত্রনবিস। আমি একজন কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ, তার্কিক, মনোবিদ, দাবাড়ু, প্রকৃতিপ্রেমী – আরও অনেক কিছু। আমাকে সবাই চেনে।"

"উৎফুল্ল?", মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, এরকম নাম কখনও শুনি নি কিনা!

"কেন? উৎফুল্ল নামটা খটমট লাগছে? তাহলে প্রফুল্লও বলতে পারো। কিন্তু, জানালার ধারের এই সিটটা পেয়ে মনটা এমন খুশি হয়ে গেল যে প্রফুল্ল বললে ঠিকঠাক বোঝানো যায় না। উৎফুল্লই হবে। ডাকনাম হিসেবে অবশ্য আনন্দিত কিম্বা খুশি পত্রনবিস বলতে পার। তুমি সিটটা না ছাড়লে হত ব্যাজার পত্রনবিস।"

"নাম এরকম ইচ্ছেমতন পালটানো যায় না কি?"

"কেন যাবে না? আমি তো পাল্টাই। আসলে সবসময় একই নাম দিয়ে নিজেকে আমি ঠিক বোঝাতে পারি না। এই যেমন ট্রেনের দুলুনিতে যেই ঘুমিয়ে পড়ব, তখন যদি কেউ জিগ্যেস করে আপনার নাম কী, বলব ঘুমন্ত পত্রনবিস।"

"ঘুমিয়ে পড়লে শুনবেন কী করে? নামটা বলবেনই বা কী করে?"

"বাঃ বাঃ, তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি? খপ করে ধরেছ। আসলে তোমাকে একটু টেস্ট করছিলাম। পাশ করে গেছ। তোমার মনটাও খুব ভাল। এককথায় আমাকে এই সিটটা ছেড়ে দিলে। কিন্তু, কেন দিলে বল তো?"

"আমার তো ভালই হল। এদিকের সিটে হাওয়া অনেক বেশি পাব, সামনের দিকে মুখ করে বসেছি।"

"হুম, যা ভেবেছি তাই। ঠিক ওই কারণেই সিটটা আমি ছেড়ে দিলাম। ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ জটিল আর গোলমেলে। হাওয়ার অঙ্কটা কিছুতেই মেলাতে পারবে না।"

"হাওয়ার অঙ্ক মানে?"

"হাওয়ার অঙ্কটা জানো না? এই যে এখন ট্রেনটা চলছে, তুমি দেখ, দু'পাশের সবকটা জানালা-দরজা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে। কেবল ঢুকেই চলেছে। হাওয়াটা বেরোচ্ছে কোথা দিয়ে সেটা ভেবে দেখেছ? এটা আমি অনেক ভেবেও বার করতে পারি নি। প্রথমে ভাবতাম ট্রেনের শেষ কামরার পেছনের দেওয়ালে বোধহয় একটা জানালা আছে, অথবা দেওয়ালটাই নেই, সেখান দিয়ে সব হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একদিন পেছনে গিয়ে গার্ডের কামরায় ঢুকে দেখলাম, পেছনটা পুরো বন্ধ। সেখান দিয়েও হাওয়া বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই। অথচ একটা রাস্তা তো থাকতেই হবে। নাহলে, শুধু যদি হাওয়া ঢুকেই যায়, ঢুকেই যায়, ট্রেনের পেটটা তো বেলুনের মত ফুলে উঠে বদাম করে ফেটে যাবে। অঙ্কটা এখনও মেলাতে পারিনি বলেই ওদিকের সিটটায় বসি না। বাইরে থেকে হাওয়া ঢুকে চোখেমুখে লাগলেই আমি অস্বস্তিকর পত্রনবিস হয়ে যাই।"

এরকম খিটকেলে অঙ্কের কথা আমি জীবনে শুনিনি। দাদুর মাথায় মনে হয় বেশ কয়েক গজ ছিট আছে। ট্রেনটা শ্রীরামপুর ছাড়তেই এক ঝালমুড়িওলা 'ঝালমুড়ি, ঝালমুড়ি' হাঁকতে হাঁকতে কামরার ভেতর ঢুকে এল। সেই কোন দুপুরে ক্যান্টিনে খেয়ে বেরিয়েছি। ভালই খিদে পেয়েছিল। কিনব বলে ভাবছিলাম, এমন সময় দাদুই বললেন, "আমার খিদেটা বলছে ঝালমুড়ি খাবে। তোমার খিদে কী বলছে? চলবে?"

"না না, আপনি খাওয়াবেন কেন? আমি আমারটা কিনে নিচ্ছি।"

"তা কেন? আমিই দুজনকে খাওয়াচ্ছি। তুমি আমায় পছন্দের সিটে বসতে দিয়েছ। চোপ, একদম অস্থির হবি না। খাবার দেখামাত্র চোঁ চোঁ করতে লেগেছে, একটু তর সয় না। দিচ্ছি তো কিনে, সবুর কর।"

"মানে?"

"ওহ, না না, সরি। তোমাকে নয়। ওটা আমার খিদেটাকে বললাম। ব্যাটা ছুঁচোর মত ডনবৈঠক দিচ্ছিল। অবশ্য, বেচারার খুব দোষ নেই, সেই সকালে খেতে দিয়েছি, তারপর আর দিইনি।"

ঝালমুড়ির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে একমুঠো গালে ফেলে ফ্যালফ্যাল করে দাদুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না। ভদ্রলোক নিজের খিদের সঙ্গে কথা বলেন! পাগল নাকি? আমার অবস্থা দেখে উনি কিছু আন্দাজ করলেন।

"বুঝতে পারলে না? দাঁড়াও, বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপারটা অবশ্য একটু গোলমেলে। আইন জানা থাকলে বুঝতে একটু সুবিধে হয়। এই যে তুমি এখন ঝালমুড়ি খাচ্ছ, কখনও কি ভেবে দেখেছ যে এটা তুমি খাচ্ছ, না তোমার খিদেটা খাচ্ছে?"

"এ আবার কী প্রশ্ন! আমিই খাচ্ছি। আমার খিদে আবার খাবে কী করে?"

"দ্যাখো, আমাদের যখন খিদে পায়, আমরা সবাই সামর্থ্য থাকলে খাই, না থাকলেও খেতে চাই। যারা অনশন ধর্মঘট করে তাদের কথা অবশ্য আলাদা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে খাবারটা পেটে গেল, এটা আমি খেলাম, না আমার খিদে খেল?"

"আমিই খেলাম। আমি আছি বলেই তো আমার খিদে আছে। আমি না থাকলে খিদেও হাপিস। খিদেটা তো আমার ওপর নির্ভরশীল। সে কি আমার থেকে আলাদা নাকি?"

"আলবাত আলাদা, একশবার আলাদা। ধর তোমার খিদে পায় নি, পেট ভর্তি, তখনও তো তুমি আছ। তার মানে, তুমি আছ, অথচ তোমার খিদে নেই। অর্থাৎ, তুমি আর তোমার খিদে আলাদা। আবার ধরা যাক, তুমি কিছু খেলে। খাবারটা পেটে গেল। তাতে তোমার পেটটা ভরল। কিন্তু তুমি তো আর শুধু পেটসর্বস্ব নও। তোমার মনটা নাও ভরতে পারে। তার মানে, তোমার খিদেটা নির্মূল হলেও তুমি খুশি হলে না। তোমার খিদেটাই তাহলে খেল, তুমি মনেপ্রাণে খেলে না।"

"কিন্তু উৎফুল্লদাদু, না কি খুশিদাদু বলব? ও না, এখন তো নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত পত্রনবিস হয়ে গেছেন!"

"ভুল করলে। নামটা মনের অবস্থার সঙ্গে পালটায়, পেটের অবস্থার সঙ্গে নয়। বলছি না, খিদেটা আমার থেকে আলাদা। পদবিটা অবশ্য পালটায় না। তুমি আমায় নতুন পাতা বলতে পারো। পত্র নভিস - নতুন পাতা, বা নতুন পাতানো বন্ধু।"

"নতুন পাতা? এই নামে আবার কাউকে ডাকা যায় নাকি? তারচেয়ে স্রেফ দাদুই ভাল। আপনার যুক্তি আমি মানতে পারলাম না। 'আমার খিদে' ব্যাপারটা একটা তাৎক্ষণিক ব্যাপার, 'আমি' ব্যাপারটা শাশ্বত। খিদেটা তো স্বাধীন নয়।"

"অবশ্যই স্বাধীন। ধরো, একদিন বিকেলবেলা তুমি পাড়ার মোড়ের চপের দোকান থেকে একটা ফিস ফ্রাই কিনলে। এবার, ফ্রাইটাতে কামড় দিতে যাবে, এমন সময় একটা কাক এসে সেটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তুমি যে কে সেই রয়ে গেলে, কিন্তু তোমার খিদেটা চড়চড় করে বেড়ে গেল। খিদেটা স্বাধীন।"

"কিন্তু দাদু," আমারও যুক্তি মজবুত, "খায় সবাই বাঁচার জন্য। 'আমার খিদে'টা যদি খেত তাহলে সে বাঁচত। কিন্তু পরিমাণমত খাবার পেটে গেলেই খিদে মরে যায়। তাই 'আমার খিদে' কখনওই খেতে পারে না। আমিই খাই।"

"খিদে মরবে কেন? রাম রাম। খিদে মরে গেলে তো আর কোনও দিন খিদেই পাবে না, যদি না নতুন কোনও খিদের জন্ম হয়। খাবার পেটে গেলে খিদেটা ঘুমিয়ে পড়ে শুধু। আমাদের ভাতঘুমের মত। ঘুম ভাঙলেই ফের মাথাচাড়া দেবে। তাছাড়া ধরো, খাওয়াদাওয়ার পর খিদেটা আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ল; আর তোমার এদিকে বদহজম, পেটখারাপ এসব যা তা হয়ে গেল। খিদে পেল আরাম, তোমার হল ব্যারাম। অর্থাৎ, তুমি আর তোমার খিদে সম্পূর্ণ আলাদা।"

আমার মাথা তখন বনবন করে ঘুরছে। দাদু বলে চলেছেন, "আমার খিদেটারও নানারকম নাম আছে। যখন চাঙ্গা থাকে তখন ডাকি বুভুক্ষু, সর্বভুক, খাই খাই। ঝিমিয়ে থাকলে ডাকি টুকিটাকি, আড়মোড়া। আর ঘুমিয়ে থাকলে একাদশী বা অগ্নিমান্দ্য।"

ট্রেন ব্যান্ডেল পার হয়ে গেছে। আমাদের ঝালমুড়িও অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। এমন সময় ত্রিবেণী থেকে শালপাতা চাপা দেওয়া একঝুড়ি শিঙাড়া নিয়ে একজন হকার উঠলেন। গন্ধেই ফের খিদে পেয়ে গেল। দাদুকে বললাম, "দাদু, আপনার খিদে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ডেকে জিগ্যেস করুন শিঙাড়া চলবে কিনা। এবারে আমি খাওয়াব।"

"শিঙাড়াটা চলতে পারে। শিঙাড়ার অঙ্কটা আমি সমাধান করে ফেলেছি।"

"শিঙাড়ারও আবার অঙ্ক? কী রকম?"

"সে কী! শিঙাড়ার অঙ্কটা শোন নি? ত্রিকোণমিতির অঙ্ক। শিঙাড়া তো দেখ তিন দিক দিয়েই বন্ধ, তাহলে ভেতরে আলুর তরকারিটা ঢুকল কী করে বল তো?"

শালপাতার চোঙায় চারটে করে শিঙাড়া নিয়ে খেতে খেতে বললাম, "ও, এটা! হ্যাঁ, এটা শুনেছি। এ তো খুব সোজা। শিঙাড়া তৈরি করার সময় আলাদা করে আলুর তরকারিটা বানিয়ে তারপর ভেতরে পুরে ..."

"উঁহু, মোটেই না, মোটেই না। এই প্রসেসে অঙ্কটা করলে উত্তর মিলবে ঠিকই, কিন্তু এক নম্বরও পাবে না।"

"তাহলে?"

"আজ থেকে অনেক অনেক দিন আগে, বল্লাল সেনের সময়, একটা বিশাল ক্ষেতে আলু, গম আর সরষে একসাথে চাষ করা হয়েছিল। অদ্ভুত দেখতে বেঁটেমত একটা গাছ গজাল, আর তাতে ফলন হল শিঙাড়ার। যেখানে ব্যাপারটা প্রথম হয়েছিল সেই জায়গাটার নাম এখন সিঙ্গুর।"

আমি গরম শিঙাড়া মুখে নিয়েও তীব্র প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দাদু হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই এই, আমার জিরাট চলে এসেছে। নামতে হবে। চললাম ভাই।"

তাড়াতাড়ি শেষ শিঙাড়াটা শেষ করে, হাতের শালপাতার চোঙাটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে, ব্যাগ সামলে আমার পাশ দিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে 'হেউ' করে একটা বিশাল ঢেকুর তুলে দাদু বললেন, "শুনলে?"

"কী?"

"শুনলে না? আমার খিদেটা তোমায় থ্যাঙ্ক ইউ জানাল।"

ছবি - দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

দেশবিদেশের গল্প::

"ওটা হকিন্স," ট্র্যাভিস আঙ্গুল দিয়ে বাড়ির সামনে বসে থাকা একজন বুড়ো লোককে দেখিয়ে বলল।

"বুড়োটার মাথায় ছিট আছে!" বলে একটা আঙুলকে কানের কাছে নিয়ে গিয়ে শুন্যে গোল গোল করে দেখাল। ওই ভাষা সবাই বোঝে! তারপর ওরা দুজন বাড়িটার সামনে দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেল। জ্যাক আর ওর মা যে বাড়িটাতে সবে এসে উঠেছে সেটা ছাড়া এই বুড়োর বাড়িটাই এই রিজার্ভয়ার এলাকার একমাত্র বাড়ি। বুড়ো খ্যাপাটে বলে ওরা তার দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারল না। বুড়ো ঠিক ওদের দেখে ফেলেছে। টলমল পায়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

"এই!" বলে হাঁক দিল বুড়োটা, "আমার কুকুরটাকে দেখেছ নাকি কোথাও? ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!"

জ্যাক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটার দিকে তাকাল। ওর ঠাকুমার আদরের কুকুরটা একবার পালিয়ে গিয়েছিল। তাতে সবার কী মন খারাপ! যতক্ষণ না তাকে ফিরে পাওয়া গেল ঠাকুমার মনের কষ্টে এঘর ওঘর করছিলেন। তাই বুড়োটার জন্যে একটু মায়া হল জ্যাকের।

"কেমন দেখতে কুকুরটাকে?" জ্যাক জিগ্যেস করল।

"আরে চল রে!" পাশ থেকে ট্র্যাভিস হিস হিস করে বলল, "ওর কথায় কান দিস না! ওর একটা কথাও বিশ্বাস করা যায় না।"

কিন্তু লোকটা যে সোজা ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। তাছাড়া কুকুরটাকে কেমন দেখতে সেটা জানতে তো বাধা নেই। দেখতে পেলে না হয় হকিন্স বুড়োকে জানিয়ে দেবে।

"সাদা কালো ছোপ ছোপ," বুড়ো বলল, "এই এতটা লম্বা," বলে হাতটাকে হাঁটু আর কোমড়ের মাঝামাঝি জায়গায় ধরল।

ট্র্যাভিস হাসল, "ধুস! তুই আবার ওই খ্যাপা বুড়োটার কথায় কান দিতে গেলি কেন!"

"ঠিক আছে, দেখতে পেলে আপনাকে জানাব!" জ্যাক বলল।

"থ্যাঙ্ক ইয়ু খোকা।"

বলে বুড়োটা আবার আস্তে আস্তে করে গিয়ে চেয়ারটায় বসল। চেয়ারটাও এতটাই পুরান যে ওর রোগা শরীরের ভারেও ক্যাঁচ কোঁচ করে উঠল। আদ্যিকালের একটা চেয়ার, যে কোনও সময় যেন ভেঙ্গে পড়বে। সত্যি বলতে কী বুড়োর গোটা বাড়িটাই কেমন যেন একটা পোড়ো মতন, সেটাও ভেঙ্গে পড়লে আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না!

"এবার চল রে বাপু!" ট্র্যাভিস ওকে ধাক্কা দিয়ে বলল। এগিয়ে গেল ওরা দুজন। ট্র্যাভিসকে যে কী ভাবে সামলাবে জ্যাক ঠিক ভেবে পায় না। ওর কথামত না চললে ট্র্যাভিস আবার ভারি রেগে যায়। জ্যাকের বয়েই গেছে কারো মেজাজ সইতে কিন্তু ট্র্যাভিস আবার এই এলাকাটা বেশ ভাল চেনে আর ওর সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগে জ্যাকের। শিকাগো শহরে থাকতে তো আর এই সব করার সুযোগ হয়নি কখনও। তাছাড়া এই এলাকাতে ট্র্যাভিস ছাড়া ওর বয়সের ছেলে খুব একটা নেই। তাই ট্র্যাভিসের সঙ্গে আলাপ হয়ে প্রথম প্রথম ওর ভালই লেগেছিল। এখন অবশ্য একটু বিরক্তিকর ঠেকছে ওর ব্যবহার। যেমন ওই যে বেচারা বুড়োটা, যে নিজের কুকুরটাকে খুঁজছ্ তার সম্পর্কে এক ঝুড়ি বাজে কথা বলার কী দরকার?

জ্যাকরা যখন শিকাগোতে ছিল তখন ওর অনেক বন্ধু ছিল কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর ওরা এই গ্রাম জঙ্গল এলাকায় একটা ছোট বাড়িতে এসে উঠেছে। আসলে এক ঘন্টার দূরত্বেই ওর দাদু দিদা থাকেন। ওদের ওখানে থাকা যাচ্ছে না কারণ মা যে ডেন্টিস্টের অফিসে চাকরিটা পেয়েছেন সেটা আবার এদিকে। স্কুল খুললে নিশ্চয়ই জ্যাক অনেক বন্ধু পেয়ে যাবে কিন্তু এখন গরমের ছুটি চলছে বলে মুশকিল। তাই এখন বন্ধু চাইলে ট্র্যাভিস ছাড়া গতি নেই।

"উফফ, আমি ভাবতেই পারছি না যে তুই ওই বুড়ো হকিন্সের সঙ্গে কথা বললি! এবার ও আর তোকে ছাড়বে না, দেখতে পেলেই গল্প জুড়ে দেবে।"

জ্যাক বলল, "ওর কুকুরটা তো হারিয়ে গেছে। আমি ভাবলাম বুড়ো মানুষ যদি কিছু সাহায্য করতে পারি তাই..."

"হ্যাঁ, কুকুর হারিয়েছেই বটে!" ট্র্যাভিস ঠোঁট উল্টালো, "তুই শুনতে চাস ওর কুকুর কী ভাবে 'হারাল'? বুড়ো নিজের লড়ঝরঝরে গাড়িটা দিয়ে ওকে চাপা দিয়ে দিয়েছিল, বুঝলি? জেসি বেচারা মরে গেছে, আর সব দোষ ওই বুড়োরই!"

"বলিস কী রে! সত্যি?" জ্যাক আকাশ থেকে পড়ল।

ট্র্যাভিস রাগ দেখাল, "আবার নয় তো কী! ওই রকম ভয়ঙ্কর কথা আমি বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারি বলে মনে হয় তোর?"

"এ বাবা! কী ভয়ানক! আমার মনে হয় সেই জন্যেই হয়তো লোকটা পাগল হয়ে গেছে!"

"পাগল তো ওর হওয়ারই কথা। ব্যাটা নিজের কুকুরটাকে মেরেছে।"

"নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা ছিল। ইচ্ছে করে কেউ নিজের কুকুরকে মারে নাকি?"

ট্র্যাভিস প্রতিবাদ করল না, শুধু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "শুনেছি বুড়ো সেদিন খুব তাড়ায় ছিল। খেয়াল করেনি ঠিক মত। কুকুরটা ওর বাড়ির সামনের জমিটায় শুয়েছিল আর হকিন্স দিল ওর ওপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে"।

"সত্যি খুব ভয়ঙ্কর!" জ্যাক শুনে বলল।

ট্র্যাভিস কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বলল, "লোকে বলে জেসিকে নাকি মাঝে মাঝেই বুড়োর বাড়ির আশেপাশে দেখা যায়। হয়তো সে তার মনিবকে দেখতে আসে।"

সেটা শুনে জ্যাকের বুকটা ধ্বক করে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে তাকিয়ে দেখল কুকুরটাকে সত্যি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে। নাহ সে ভয় পাবে না মোটেই! ট্র্যাভিস ইচ্ছে করে ওকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে ওই সব গল্প দিচ্ছে!

"আমি ও সব হাবিজাবি গল্পে বিশ্বাস করি না!" সে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "ভূত বলেই কিছু নেই – তাও আবার কুকুরের ভূত!"

ট্র্যাভিস কাঁধ ঝাঁকাল, "আমি যা শুনেছি তাই বলছিলাম।"

এর পর জ্যাকের বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত দুজনে আর কোন কথা বলল না।

"ঠিক আছে, আমি তাহলে চললাম," ট্র্যাভিস বলল।

জ্যাক বললে হয়তো ও আরো কিছুক্ষণ থেকে যেত কিন্তু ওর ইচ্ছে করছিল না ট্র্যাভিসের সঙ্গে আর সময় কাটাতে।

"তোর বাড়িটা ঠিক কোথায়?"

ট্র্যাভিস গাছের সারির ফাঁক দিয়ে দেখালো, "ঐ দিকে, ডাকোটা রোডে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা শর্টকাট আছে।"

"আচ্ছা, তাহলে পরে আবার দেখা হবে," বলে জ্যাক বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

ট্র্যাভিস হাত নেড়ে গাছের সারির দিকে হাঁটা দিল।

###

রাতে খাবার টেবিলে জ্যাকের মা আবার ওর বন্ধু সমস্যা নিয়ে ওর পিছনে লাগলেন। মার সঙ্গে কোন এক মহিলার পরিচয় হয়েছে কাজের জায়গায়। সেই মহিলার নাকি জ্যাকের বয়সী একটা মেয়ে আছে তাই মা তার সঙ্গে জ্যাকের বন্ধুত্ব করানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন!

"আমি এখন আর কেজিতে পড়ি না মা যে তোমাকে আমার জন্যে বন্ধু জোগাড় করে দিতে হবে! তাছাড়া ওই মেয়েটাই বা আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইবে কেন?"

"আমি ওর মাকে বলেছি তুমি কত ভাল ছেলে..."

"থাক অনেক হয়েছে! আর একদম না!"

"কিন্তু জ্যাক, তোমার তো বন্ধু দরকার।"

"আমার বন্ধু আছে তো, তোমাকে বলেছি না?"

"হ্যাঁ, ট্র্যাভিস। ওর সঙ্গে একদিন আমার আলাপ করিয়ে দিও। তবে তোমার কথা শুনে ওই ছেলেটাকে তো একটু বখাটে বলেই মনে হয় আমার। সারাদিন শুধু জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোনও কাজ নেই!"

"তাতে কী? এখন তো স্কুলের ছুটি বলে আমিও তো তাই করি।"

মা মুখ নিচু করে বললেন, "আমার হয়তো হুট করে এখানে চলে আসাটা ঠিক হয়নি। স্বার্থপরের মতন কাজ হয়েছে। আসলে আমি তোমার দাদু-দিদার কাছে থাকতে চাইছিলাম কিন্তু তোমার প্রতি মনে হয় অবিচার করে ফেলেছি। শিকাগো শহর তোমার খুব প্রিয় ছিল সেটা আমি জানি।"

"ঠিক আছে, সে তো আমি পরেও আবার যেতে পারি। তখন বাবার বাবার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করব"।

বাবার কথা তুললেই মার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় সেটা জ্যাক জানে। তাই ওর কথাটা শুনে মা খাবার টেবিল থেকে উঠে নিজের শোওয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। জ্যাক মনে মনে সেটাই চেয়েছিল, একলা থাকতে। ওর জীবনটা কী রকম বোরিং আর বন্ধুহীন হয়ে গেছে সেই কথাটা বার বার মার কাছ থেকে শুনতে ওর মোটেই ভাল লাগে না।

পরদিন মা কাজে চলে যাওয়ার পর জ্যাক সাইকেল নিয়ে রিজার্ভয়ার রোডে গিয়ে হাজির। ট্র্যাভিসকে কোথাও দেখতে না পেয়ে সে ঠিক করল বুড়ো হকিন্সের সঙ্গে কথা বলবে। বেচারা বুড়ো লোকটার জন্যে কষ্টই হচ্ছিল ওর। কুকুরের মৃত্যুর ব্যাপারটা কিছুতেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। বুড়ো হকিন্স যদি তার কুকুরটাকে নিয়ে কিছু গল্প বলতে চায় তাহলে ও শুনতে রাজি। এমনিতেও তো আর কিছু করার নেই। তবে বুড়োর বাড়ি পৌঁছনোর আগেই কে যেন ওর নাম ধরে ডাকল। নির্ঘাত ট্র্যাভিস, এখানে আর কেউ তো ওর নাম জানে না।

"কোথায় তুই?" গাছের আড়াল দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল জ্যাক।

"এই তো এখানে!" ট্র্যাভিস বেশ আস্তেই বলল কথাটা।

জ্যাক সাইকেলটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে ট্র্যাভিসের গলার স্বর যেদিক থেকে আসছিল সেদিকটায় গেল। কাছেই ছিল সে, মাটিতে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে! জ্যাককে দেখে সে ঠোঁটে আঙ্গুল দিল।

"কী ব্যাপার?" জ্যাকও ফিসফিস করে বলল।

ট্র্যাভিস গাছগুলোর দিকে ইশারা করে বলল, "নিচে এসে বোস। আমি দেখতে পাচ্ছি! ওই যে ওইখানে..."

জ্যাক হাঁটু গেড়ে বসে ট্র্যাভিস কী দেখছে সেটা দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু শুধু সারি সারি গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। তারপর মাথা ঘুরিয়ে অন্য দিকে দেখতে গিয়ে মনে হল কী যেন একটা সাঁ করে সরে গেল, যেন দেখা দেবে না বলে।

তারপর হঠাৎই কুকুরটাকে দেখতে পেল জ্যাক, জঙ্গলের মধ্যে একটা খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে সাদা কালো ছোপ ছোপ, মুখ থেকে গোলাপি জিভটা বেরিয়ে রয়েছে।

"ওই তো, ওটাই জেসি!" ট্র্যাভিস বলল, "যে ভূতুড়ে কুকুরের কথা বলছিলাম তোকে!"

জ্যাকের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। এও কী সম্ভব? কুকুরটা যেন ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে! জ্যাকের একবার মনে হল এটাও নিশ্চয়ই ট্র্যাভিসের কারসাজি, জ্যাককে ভয় পাওয়াবার চেষ্টা করছে। জ্যাক

যদি ভয় পেয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে পালায় তাহলে ট্র্যাভিসের বেশ একটু সুবিধা হবে। স্কুল খুললে সে সবাইকে মনের সুখে বলতে পারবে যে জ্যাক আসলে ভিতুর ডিম! নাহ, জ্যাক সেটা তো হতে দিতে পারে না!

"ওকে তো আর দশটা সাধারণ কুকুরের মতনই লাগছে," বলে জ্যাক উঠে দাঁড়াল।

"চুপ করে বোস বোকারাম!" ট্র্যাভিস ফিসফিস করে বলল, "যখন বেঁচে ছিল তখনও জেসি বেশ হিংস্র ছিল তাই অ্যাক্সিডেন্টে মরে গিয়ে যে সে বাধ্য হয়ে গেছে সেই রকমটা আশা না করাই ভাল!"

জ্যাক বিরক্ত হয়ে বলল, "ওই কুকুরটা যদি ভূত হয় তাহলে আমিও ভূত!"

বলে ট্র্যাভিসকে পিছনে ফেলে কুকুরটার দিকে এগোতে লাগল জ্যাক। কুকুরটা ওকে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল।

"আরে ভূতুড়ে কুকুরদের নিয়ে কিছুই জানিস না তুই!" ট্র্যাভিস চিৎকার করে বলে উঠল, "মারা পড়বি! জেসি কামড়ে তোর পা ছিঁড়ে দেবে!"

জ্যাক কাছে আসছে দেখে কুকুরটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল। একটা চাপা হিংস্র গর্জন বেরিয়ে এল জন্তুটার গলা থেকে। জ্যাক ভালই জানে যে জঙ্গলের মধ্যে একটা অচেনা কুকুরের সামনে পড়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভূত হোক বা না হোক কুকুরটা যে ওকে দেখে খুশি নয় সেটা তো বেশ বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু ট্র্যাভিস ওকে বোকা বানাবে সেটা তো কোনও মতেই হতে দেওয়া যায় না।

কুকুরটার কাছে গিয়ে আস্তে করে একটা হাত বাড়াল সে। কুকুরটা দু পা পিছিয়ে গিয়ে আবার দাঁত খিঁচালো।

"এই ডগি!" জ্যাক বলল, "তুই কী ভূত নাকি? তোকে দেখে তো মনে হচ্ছে না যে তুই গাড়ি চাপা পড়েছিলি..."

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই কুকুরটা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর পা-টা কিছু নয় একেবারে সোজা ঘাড়ের ওপর! ওর আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জ্যাক কোন রকমে হাত দিয়ে ওকে আটকাতে চেষ্টা করল কিন্তু কোনও লাভ হল না। ভয়ঙ্কর রাগি জন্তুটার দাঁত ওর কাঁধে কেটে বসল। প্রচন্ড ব্যথায় হয়তো পড়েই যেত জ্যাক কিন্তু ভয় ওকে দাঁড় করিয়ে রাখল। ছাড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করল জ্যাক কিন্তু কুকুরটা ওকে কিছুতেই ছাড়ছিল না।

"জেসি! ওকে ছেড়ে দে!" ট্র্যাভিস দৌড়ে এল হাত নাড়তে নাড়তে, "যা, যা, জেসি ছেড়ে দে!"

জ্যাককে চমকে দিয়ে ট্র্যাভিসের কথা শুনে জেসি ওকে ছেড়ে দিল। ট্র্যাভিস মাটিতে পা দিয়ে মেরে মেরে আওয়াজ করতে লাগল। কুকুরটা সরে গেল, জিভ বার করে ঠোঁট চাটল, তারপর পিছন ফিরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

"কত করে বললাম ওর কাছে যাস না, তা আমার কথা শুনবি কেন!" ট্র্যাভিস রেগে বলল, "কী ভেবেছিলি তুই? ও তোর সঙ্গে খেলা করবে? আদর করে পা চাটবে?"

জ্যাক কামড় খাওয়া কাঁধটাকে অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরে টলতে টলতে রাস্তায় উঠে এসে বলল, "বাপরে! ওটা মোটেই ভূতুড়ে কুকুর নয়! জ্যান্ত পাগলা কুকুর একটা!"

ট্র্যাভিস ঠোঁট উল্টাল, "হ্যাঁ, তোকে বলেছে! কী করে জানলি শুনি?"

"ভূতেদের আবার দাঁত থাকে নাকি? ভূতেরা কামড়ে রক্ত বার করে দেয় না মোটেই!"

"রক্ত কোথায়?" ট্র্যাভিস শান্ত গলায় বলল, "তোর জামাটাও তো ছেঁড়েনি।"

"অ্যাঁ!" জ্যাক হাঁটা থামিয়ে কাঁধটাকে দেখল। সত্যি তো, সে ভেবেছিল কামড়ে রক্তারক্তি কান্ড হয়ে গেছে কিন্তু কাঁধে কামড়ের কোন চিহ্নমাত্র নেই! ব্যথাটাও কুকুরের সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে!

ট্র্যাভিস কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল, "কিরে? ভূত দেখলি নাকি?"

###

জ্যাকের মা কাজ থেকে ফিরে এসে দেখলেন যে সে বাইরের ঘরের একটা চেয়ারে বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে রয়েছে।

"কী হয়েছে? কী ভাবছ? মুখখানা অমন কালচে দেখাচ্ছে কেন?" মা জিগ্যেস করলেন।

জ্যাক সোজাসুজি মাকে প্রশ্ন করল, "মা, তুমি ভূতে বিশ্বাস করো?"

মা ওর পাশেই বসে পড়ে বললেন, "কেমন ভূত? হ্যালোইন বা ভূত চতুর্দশীর ভূত?"

"না, মরে যাওয়ার পর মানুষ ভূত হয়ে ফিরে আসে – বা মরে যাওয়া কুকুর যাদের দেখতে পাওয়া যায়?"

মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "জ্যাক, এই পরিবেশটার জন্যেই তোমার ওই রকম চিন্তা সব মাথায় আসছে তাই না? সারাদিন বাড়িতে একা থেকে ভয় পেয়ে তুমি ওই সব হাবিজাবি ভাবনা ভাবছ!"

"হয়তো হাবিজাবি নয়। ওই হকিন্স আছে না, যে রাস্তার ওইদিকটায় জঙ্গলের কাছে থাকে?"

"ছি, ছি, মিস্টার হকিন্স বলো জ্যাক! বয়স্ক মানুষকে একটু সম্মান দিয়ে কথা বলতে শেখো! সব সময় আপনি বলবে!"

"আচ্ছা বাবা মিস্টার হকিন্স! ওনার একটা কুকুর ছিল – জেসি। সে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। আজ আমি তাকে জঙ্গলে দেখলাম"।

"কী আজেবাজে কথা বলছ!"

"আজেবাজে নয়! ট্র্যাভিস ওকে আগে দেখতে পেয়ে আমাকে ডাকল তখন আমিও দেখতে পেলাম।"

মা হেসে ফেললেন, "আমার মনে হয় তোমার ওই ট্র্যাভিস বন্ধুর কল্পনা শক্তি খুব প্রখর! ওই সব উল্টোপাল্টা কথায় বিশ্বাস করতে নেই তুমি ভালই জানো।"

"মা, আমার কথাটা শোনো! কুকুরটা আমাকে কামড়ে দিয়েছিল এইখানে..."

"সেকি তোমাকে কুকুরে কামড়েছে," মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "সেটা আগে বলবে তো! এখন ইঞ্জেকশান নিতে হবে!" তারপর ওর কাঁধটা ভাল করে দেখে বললেন, "কই কিছুই তো দেখছি না!"

"চলে গেছে! প্রথমে যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছিলাম, তার পর কুকুরটা চলে যেতেই ব্যথাও চলে গেল!"

"উফফ সত্যি জ্যাক! কী আষাঢ়ে গল্প!" মা ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তুমি যদি মনে করো আমি ওই সব গল্পে ভয় পেয়ে যাব তাহলে ভুল ভেবেছো। ভুলে যেও না আমি এই এলাকাতেই বড় হয়েছি। এখানকার চাষাদের বানানো সব বোকা বোকা ভয়ের গল্প আমার জানা আছে। ভূতুড়ে কুকুরই বটে! বানিয়েছো ভালো! নাও এবার হাত ধুয়ে এসে আমাকে রান্নাঘরে সাহায্য করো।"

জ্যাক একদিকে খুশিই হল যে মা ভেবেছেন ওর কথা সব মিথ্যে, বানানো ঘটনা কিন্তু অন্য দিকে সে নিজে তো ভালই জানে যে কুকুরটাকে সে দেখেছে আর তার কামড়ও খেয়েছে।

###

পরদিন সকালে মা অফিসে চলে যাওয়ার পর জ্যাক বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখল ট্র্যাভিস ওদের বাড়ির সামনে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

"জেসিকে দেখতে যাবি নাকি আবার?" ট্র্যাভিস হেসে জিগ্যেস করল।

"নাহ, আমি মিস্টার হকিন্সের সঙ্গে কথা বলব"।

"দুর ওই বুড়োটার সঙ্গে কথা বলে কী হবে?" ট্র্যাভিস বিরক্ত হল, "তার তো দিন না রাত সেই খেয়ালই নেই!"

"আমি ওনার বাড়িতেই যাবো," জ্যাক দৃঢ় ভাবে বলল।

ট্র্যাভিস তাতে বেশ রেগেই গেল, "ঠিক আছে তুই ওই বুড়োর বকবক শোন, আমি জেসিকে খুঁজতে যাচ্ছি"।

"সে তোর যা ইচ্ছে।"

দুজনে হনহন করে হেঁটে চলল যেন দুজনেরই খুব জরুরি কোনও কাজ আছে। মিস্টার হকিন্সের বাড়িটা দেখা যেতেই ট্র্যাভিস জঙ্গলের দিকে ঘুরে গেল।

"কুকুরটাকে দেখতে পেলে তোকে ডাকব, কেমন?"

"কোনও দরকার নেই! আমি আর ওই কুকুরটাকে দেখতে চাই না। আমাকে কামড়ে দিয়েছিল ব্যাটা"।

"কোথায়?" ট্র্যাভিস মুচকি হেসে বলল, "আমি তো কামড়ের দাগ দেখছি না!"

হাসতে হাসতেই সে গাছের সারির পাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

মিস্টার হকিন্স তার বাড়ির সামনে চেয়ার নিয়ে বসেছিলেন রোজকার মতন। জ্যাককে দেখে চিনতে পারলেন মনে হল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আমার কুকুরটাকে খুঁজে পেয়েছ কী? আমার জেসিকে?"

জ্যাক ওনার কাছে গিয়ে বলল, "সেটা নিয়েই আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আমার মনে হয় আমি ওকে দেখেছি"।

মিস্টার হকিন্স আনন্দে পায়ে চাপড় মেরে হেসে উঠলেন। জ্যাক তখন দেখল ওনার বেশ কয়েকটা দাঁত নেই। বললেন, "আমি জানতাম ও ফিরে আসবেই! কোথায় সে? জঙ্গলে বুঝি? সব সময় জঙ্গলে পালিয়ে যেতেই ভালবাসত"।

জ্যাক ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ, জঙ্গলে। কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই। মানে প্রশ্নটা একটু অদ্ভুত শোনাবে হয়তো...আচ্ছা মিস্টার হকিন্স আপনার কুকুরটা কী জীবিত?"

মিস্টার হকিন্সের মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল, "মানে? কী বলতে চাইছ তুমি? তুমিই তো বললে ওকে দেখেছ আবার এখন জিগ্যেস করছ ও জীবিত কিনা। একটু আগেই তো তুমি বললে তুমি ওকে দেখেছ!"

"হ্যাঁ জানি, আমি সত্যি ওকে দেখেছি। কিন্তু আমাকে একজন যে বলল..." জ্যাক থেমে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কী ভাবে বলবে...নাহ সোজাসুজি বলাই ভাল মনে হয়।

"আমি শুনলাম আপনি নাকি জেসিকে আপনার গাড়ির তলায় চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন, আর, আর ...ও নাকি মারা গিয়েছিল"।

মিস্টার হকিন্স কিছু বললেন না। শুধু জ্যাকের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে নিজের হাতের আঙুলগুলো দেখতে লাগলেন। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "জেসিকে আমি খুব ভালবাসতাম, আমি কী ওর কোনও ক্ষতি করতে পারি?"

জ্যাক বলল, "হ্যাঁ জানি, কিন্তু কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছিল কী?"

"ঘটে থাকতেও পারে!" মিস্টার হকিন্স মাথাটা একদিকে হেলিয়ে খসখসে গলায় বলে চললেন, "একবার আমি গাড়িতে যখন উঠলাম তখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। বউকে বলেছিলাম শহর থেকে ওকে তুলে নিয়ে আসব। ঠিক খেয়াল ছিল না," এতটা বলে উনি থেমে গেলেন।

"কত বছর আগের কথা এটা?" উনি যাতে কথা বলা বন্ধ না করেন তাই জ্যাক বলল।

"তা হবে বছর পনেরো আগেকার কথা। আমার বউ সেলমা তখন বেঁচে।"

পনেরো বছর আগে! নাহ বুড়োটার মাথাটা গেছে। অতদিন আগে ঘটনা হতেই পারে না!

হঠাৎ মিস্টার হকিন্স টানটান সোজা হয়ে বসলেন, পরক্ষণেই আবার কুঁকড়ে গেলেন। দুহাতে মাথা চেপে ধরে বললেন, "হায় ভগবান! কেন যে আমি পিছনে তাকালাম না। কেন আমি খেয়াল করলাম না। ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন!"

জ্যাকের খারাপই লাগছিল বুড়ো ভদ্রলোকের জন্যে। সে কাছে গিয়ে ওনার হাতটা ধরে বলল, "যা ঘটেছিল সেটা একটা দুর্ঘটনা ছিল, তাই না মিস্টার হকিন্স? আপনি বুঝতে পারেননি কুকুরটা পিছনে শুয়ে ছিল"।

মিস্টার হকিন্সের দু গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছিল, "ওদের দুজনের কাউকেই আমি দেখতে পাইনি! ছেলেটা কুকুরটাকে বড্ড ভালবাসত। ওর সঙ্গে মাটিতেই শুয়ে থাকত। এ তল্লাটে আর তো কোনও বাচ্চা ছিল না। জেসিই ছিল ওর একমাত্র বন্ধু। আমি দুজনকেই চাপা দিয়ে ফেলেছিলাম, ছেলেটাকে আর কুকুরটাকে। অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই সব শেষ। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন!"

জ্যাকের সারা শরীর কাঁপতে লাগল। নাহ, মিস্টার হকিন্স একজন আধ পাগলা ছিটিয়াল লোক, উনি কী বলছেন তার ঠিক নেই!

তাও জ্যাক জিগ্যেস করল, "কার কথা বলছেন আপনি মিস্টার হকিন্স? ছেলেটার কী নাম ছিল?"

মিস্টার হকিন্স চোখের জল মুছে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওর নাম ছিল ট্র্যাভিস। ডাকোটা রোডের ধারে থাকত। তবে জেসির সঙ্গে দেখা করতে রোজ আসত।"

জ্যাক ছিটকে সরে গেল, পড়েই যাচ্ছিল প্রায়, "না, না, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন আপনারা দুজনেই!"

ও পিছন থেকে কে যেন বলল, "যা বাবা! আমি কেন ঠাট্টা করতে যাবো?"

জ্যাক পিছন ফিরে দেখল ট্র্যাভিস ওই সাদা কালো ছোপ দেওয়া কুকুরটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ওর ঠোঁটে সেই পরিচিত অদ্ভুত হাসিটা। ওকে তাকাতে দেখে বলল, "তুই যদি আমাদের সঙ্গে খেলতে চাস তাহলে আমি জেসিকে বলে দিতে পারি তোকে আর না কামড়াতে।"

"না, না!" জ্যাক চিৎকার করে বলল, "তুই মৃত হতে পারিস না! পারিস না!"

"না, না, আমি তো মরিনি," মিস্টার হকিন্স বললেন, "প্রায় মরতেই বসেছি কিন্তু এখনও মরিনি!"

"নাহ, আপনাকে বলছি না – ওকে বলছি!" জ্যাক ট্র্যাভিসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই তো ট্র্যাভিস দাঁড়িয়ে রয়েছে জেসিকে নিয়ে!"

মিস্টার হকিন্স ওর আঙুল অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখে বললেন, "খোকা আমার মনে হয় তুমি খুব বেশিক্ষণ রোদে ছিলে। একটু জল খাবে, দেবো?" বলে উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

জ্যাক তখন মিস্টার হকিন্সের বাড়ি ছেড়ে ঘাসে নেমেছে, "চলে যা তুই ট্র্যাভিস, আমাকে একলা থাকতে দে!" বলে মিস্টার হকিন্সকে চমকে দিয়ে সে দৌড়তে লাগল।

ট্র্যাভিসের চিৎকার ভেসে এল পিছন থেকে, "একা একা খেলায় কোন মজা নেই। তোর যখন একলা লাগবে তখন এদিকে আসিস। আমি আর জেসি এই জঙ্গলে তোর জন্যে অপেক্ষা করব!"

জ্যাক কান বন্ধ করে নিল। জোরে জোরে ছুটতে ছুটতে সে জঙ্গলটাকে দূরে ফেলে নিজের ছোট বাড়িটাতে এসে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

লেখক পরিচিতিঃ

মার্কিন শিশু সাহিত্যিক এলেন উইটলিঙ্গার কিশোরদের জন্যে প্রচুর বই লিখেছেন যার মধ্যে 'স্যান্ড পাইপার', 'ব্লাইন্ড ফেইথ', 'প্যারট ফিশ' ইত্যাদি প্রমুখ। ওনার উপন্যাস 'হার্ড লাভ'এর জন্যে উনি মাইকেল এল প্রিন্টস পুরষ্কার আর ল্যাম্বডা সাহিত্য পুরষ্কার পেয়েছেন। ওনার বেশ কিছু উপন্যাস নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির 'বেস্ট বুক্স' লিস্টে উঠেছে। সেই সব উপন্যাস ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ডাচ, ড্যানিশ, টারকিশ, ইটালিয়ান, ক্রোইয়েশিয়ান এবং কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এলেন এককালে বাচ্চাদের লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করতেন এখন স্বামীর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যে থাকেন।

ভূতুড়ে কুকুর লেখাটা নিয়ে এলেন বলেছেন, "গত বছর আমার কুকুর উডিকে বাড়িতে আনার পর থেকে আমার মাথায় কেবল কুকুরের গল্প ঘুরছে তাই এই ভূতের গল্পেও কুকুর ঢুকে গেছে সেটা আর আশ্চর্যের কী?"

এলেন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে ওনার ওয়েবসাইট www.ellenwittlinger.com এ যেতে পারো।

ছবি - পুস্পেন মণ্ডল

দেশবিদেশের গল্প::

কী ভাবে এল গাছপালা আর জল (দক্ষিন আফ্রিকা)

মল্লিকা ধর

এটি আফ্রিকার দক্ষিনাংশের সান (san) জাতির উপকথা। গল্পটি অপূর্ব। এই গল্পে আছে একেবারে প্রথমে সৃষ্টিকর্তা ক্যাগেন সব পশু পাখি তৈরি করে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু না বানালেন কোনও পুকুর, না কোনও নদী, না কোনও ঝর্না বা কোনও প্রস্রবণ। কোনও ঘাস জমি নেই, কোনও ফলের গাছ নেই, চারদিকে শুধু ধূ ধূ বালির মরু, তীব্র সূর্য আগুন ঢেলে তাতিয়ে তোলে তা সারাদিন। পশুপাখিরা সবাই পশুপাখি মেরেই মাংস ভক্ষণ করে আর তৃষ্ণা মেটায় রক্তে। কী ভয়ঙ্কর রক্ত লাল সেই সব দিন। কারোর জীবনের ই কোনো নিরাপত্তা নেই।

এক ছিল বিরাট হাতি, সে এই সব দেখে ব্যথিত। সে বলল, "এই রকম চলতে পারে না, পারে না, পারে না"। পশুপাখিরা কাছে এগিয়ে আসে, কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তাহলে"?

মহান হৃদয় হাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আমি মরে গেলে আমার দেহের পশম থেকে গজাবে ঘাস। আমার শিরা উপশিরা থেকে হবে তরমুজের লতা তাতে রসটসটসে তরমুজ ফলবে। আমার হাড় গুলি থেকে হবে ফলের গাছ। রসালো ফল হবে তাতে। আর কাউকে মাংস খেতে হবে না। রক্ত পান করতে হবে না। প্রচুর খাবার আর পানীয় পাবে সব পশুপাখি"।

আগ্রহে উদগ্রীব হয়ে সব পশুপাখি হাতির দিকে চেয়ে থাকে, একজন বলে, "কবে, সে কবে? আহা কবে?"

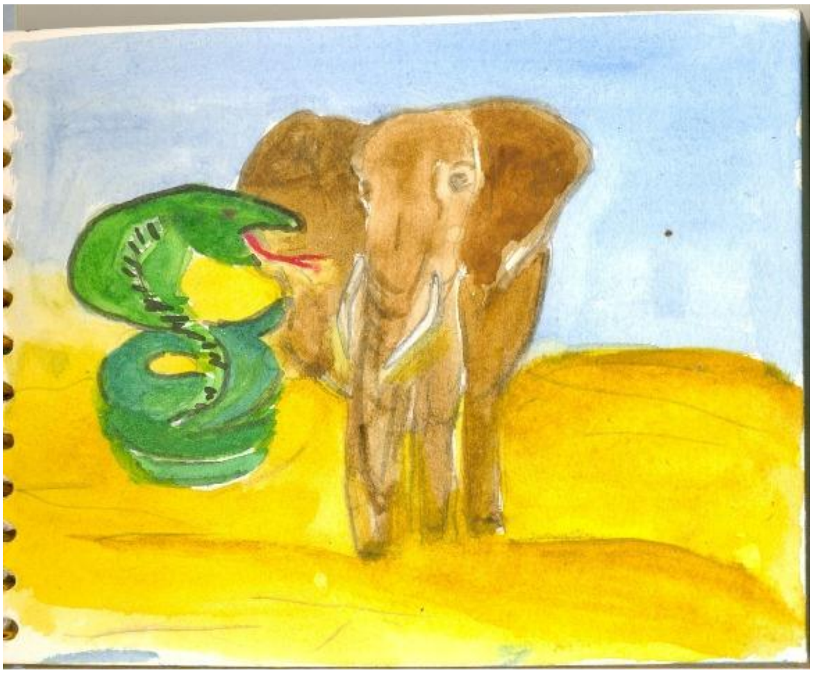

হাতি বলে, “কী জানি? আমরা হাতিরা তো অনেকদিন বাঁচি। দেখা যাক কী হয়!”

সবাই আশায় আশায় চলে যায়, ভাবতে ভাবতে যায় একদিন মরু সবুজ হবে, কত ঘাস, কত ফল, মাটিতে কত রসালো তরমুজ! এত তৃষ্ণা আর থাকবে না, ক্ষুধা থাকবে না, রক্তলোলুপ এই সব ভয়ঙ্কর দিনের অবসান হবে। কিন্তু সে কবে?

এক ছিল মস্ত সাপ। সে হাতিকে এসে বলল, “হাতি সত্যি তুমি তোমার নিজের জীবন দিয়ে আমাদের জীবন সুন্দর করতে চাও? আমাদের রক্ষা করতে চাও”?

হাতি বলে, “হ্যাঁ সত্যি। এই বীভৎস যন্ত্রণা আর চোখে দেখতে পারি না। এর অবসান চাই”।

সাপ বলল, “আর এক বার ভেবে দ্যাখো । সকলের জীবন সুন্দর হবে কিন্তু তার জন্য চরম মুল্য দিতে হবে তোমাকে”।

হাতি বলে, “আমি ভেবে দেখেছি অনেকবার, আমি তৈরী”।

সাপ বলে, “তবে তাই হোক”। বিদ্যুতের মতন চমকে ওঠে সাপের ফণা। গভীর দংশন করে সে হাতিকে। সব টুকু বিষ ঢেলে দেয়। হাতি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যন্ত্রণায় নীল হয়ে যেতে থাকে তার বিরাট দেহ। কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যু হয় হাতির।

হাতির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মত। দলে দলে পশুপাখিরা এসে হামলে পড়ে হাতির মৃতদেহের ওপর। পেট ভরে মাংস খায়, তৃষ্ণা মিটিয়ে রক্ত পান করে তারা, খায় আর পান করে। খেতে খেতে দিন ফুরায় প্রায়, আর কিছুই পড়ে থাকে না, চামড়া, হাড় আর শিরা উপশিরা ছাড়া। এক সময় সূর্য নামে পাটে , পরিতৃপ্ত উদরে পশুপাখিরা ঘুমাতে যায়। বহুদিন পরে পেট ভরে খেতে পেয়েছে তারা, মিটাতে পেরেছে তৃষ্ণা।

পরদিন সকালে একে একে জেগে উঠতে থাকে পশুপাখিরা। আবার তপতপে গরমের দিন, আবার ক্ষুধা আবার তৃষ্ণা। আবার সেই যন্ত্রণা। সকলে উন্মত্তের মতন “হা খাবার হা পানীয়” শুরু করে দিল। সাপ বলে, “আরে তোমরা এত অধীর হয়ো না। মনে আছে হাতির প্রতিশ্রুতির কথা?” পশুপাখিদের স্মৃতিশক্তি বেশী না, অনেকেরই কিছু মনে নেই, শুধু কয়েকজন তোতলাতে তোতলাতে বলে, “ হ্যাঁ কী যেন ......হাতি

বলেছিল সে মরে গেলে তার হাড় থেকে ফল গাছ হবে...... তাই বলেছিল না? কিন্তু হাতি তো মরেনি। সাপ তুমি তাকে মেরেছ।" সাপ ফোঁস করে ওঠে, "এখন আমার নামে দোষ, না? সুবিধাটুকু পাওয়া হয়ে গেলে এরা সব ভুলে যায় । আয় কে খেতে চাস আমার রক্ত? সাহস থাকে তো এগিয়ে আয়"।

সাপের ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে সবাই পিছু হটে, সাপের বিষ দাঁতের কথা কে না জানে! সাপ কে কেউ ঘাঁটাতে চায় না।

অনাহারে আর বিনা পানীয়তেই কেটে যায় একটি দিন, ক্রমে সূর্যাস্ত হয়। রাতের বেলা একে একে পরিচিত তারারা ফোটে আকাশে। তার সাথে দেখা যায় নতুন এক তারা, সেই তারা এগিয়ে আসতে থাকে। ভয়ে শিউরে ওঠে সব প্রাণী , বলে, "ওই যে হাতির আত্মা। আমাদের ধ্বংস করতে আসছে।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে পশুপাখিরা, নতুন তারাটি এগিয়ে আসতে আসতে ক্রমে স্থির হয় হাতির দেহাবশেষের উপর। সহসা হাতির হাড়গুলি খাড়া হয়ে ওঠে, শিকড় গজিয়ে ছড়িয়ে যায় মাটির গভীরে, উপরে ডালপালা গজায়, পাতাপত্তর হয়। ফলের গাছ হয়ে যায় ওরা। হাতির শিরা উপশিরা থেকে তরমুজের লতা হয়, রসালো তরমুজ ধরে তাতে। আর হাতির গায়ের পশম থেকে হয় মস্ত মস্ত লোম, হাতি ঘাসের জঙ্গল বলে যা এখন পরিচিত।

পরদিন সকালে পশুপাখিদের আনন্দ দেখে কে! দলে দলে হরিন, খরগোশ, গরু, ভেড়া, জেব্রা, ঘোড়া আর বাকি সবাই বেরিয়ে পড়ে খেতে। মাঠ ভরা সবুজ ঘাস, আহা! শুধু কিছু কিছু প্রাণী চিতা, হায়না, সিংহ, নেকড়ে, পেঁচা এই রকম কিছু প্রাণী বলল, তারা মাংস ছাড়া বাঁচতে পারবে না। তারা চলে গেল রাত্রির অন্ধকারে রাতে শিকার ধরে খাবে। শকুন বলল, যে তারও মাংস লাগবে কিন্তু সে নিজে মারবে না, এমনি এমনি কেউ মরে গেলে তবে খাবে। খাবারদাবারের ব্যবস্থা তো হয়ে গেল, কিন্তু পানীয়? কী ভীষণ তৃষ্ণা ! আবার সাপ কে তারা বলে, "পানীয় চাই, পানীয় চাই। তেষ্টায় মরে গেলাম"।

সাপ বলে, "ফলে রস আছে, তরমুজেও। ঘাসেও। সে সবে তেষ্টা মেটে না তোমাদের?"

কিন্তু কেউ শোনে না, আহা, তৃষ্ণা! আবার তাকাতে থাকে এদিক ওদিক, নধর কোনো প্রাণীর মিঠা রক্তে তারা তৃষ্ণা মেটাবে ।

সাপ বাধা দেয়, বলে, " না না না, আর নয়। মহান হাতি নিজের জীবন দিল তোমাদের জন্য, তবু তোমাদের সন্তুষ্টি নেই। দাঁড়াও , দেখি কি করা যায়।" সাপ মাটিতে গর্ত করে নেমে গেল পাতালে, সেখান থেকে ফণা আর লেজের ঝাপটা দিয়ে ঠেলে ঠেলে পাতালের জল নিয়ে এল উপরে, দেখা দিল ঝর্না আর প্রস্রবণ। নীচু নীচু জায়গা জলে ভরে গিয়ে হল পুকুর, দিঘী, হ্রদ, নদী বয়ে গেল উপত্যকার মাঝ দিয়ে।

খাদ্য ও পানীয়র সমস্যা মিটে গেল। এখন পৃথিবী ঘাসে, পাতায়, লতায়, গাছে সবুজ, স্নিগ্ধ, জলের অভাব এখন আর নেই। সকলে সুখী।

সাপ রইল না, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সে ফিরে গেল স্বর্গে। সে কাউকে বলেনি যে হাতিকে সে মর্মান্তিক ভালোবাসতো, তাকে ছাড়া সে থাকবে কেমন করে?

রয়ে গেছে হাতিঘাসের জঙ্গল, রয়ে গেছে সেই জলকুণ্ড যেখানে প্রথম পাতালের জল নিয়ে এসেছিল সাপ। আর রয়ে গেছে এই গল্প।

ছবি - পিয়ালী বন্দোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা। লেখালেখির সূত্রপাত স্কুল জীবন থেকেই। ছোটোবড়ো প্রত্যেকের জন্যই লেখেন। প্রথম সারির সমস্ত পত্রিকায় নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয়। 'অশেষ আকাশ' এবং 'অনন্ত আগামী' লেখিকার প্রকাশিত দুটি বই। বাংলা ব্লগেও নিয়মিত লেখালেখি করেন।

দেশবিদেশের গল্প::

গোলাপকুমার

দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়

(জাপানের প্রচলিত রূপকথা 'মোমোতারো' অবলম্বনে রচিত। জাপানি ভাষায় মোমো শব্দের অর্থ গোলাপি, তাই এই নামকরণ করা হল। মূল গল্প অপরিবর্তিত ।)

অনেক-অনেক বছর আগের কথা। এক জঙ্গলের ধারে ছোট্ট বাড়িতে থাকত এক বুড়ো আর বুড়ি। বুড়ো সকাল বেলা জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেত। বুড়ি ব্যস্ত থাকত ঘর সংসারের কাজ নিয়ে। মাঝে-মাঝে ময়লা জামাকাপড় কাচতে বুড়ি যেত নদীর ধারে। বুড়ি প্রতিদিন বুড়োকে বলতো, "শোনো সন্ধে নামার আগেই জঙ্গল থেকে ফিরে এসো কিন্তু।" বুড়োও মিষ্টি হেসে বুড়িকে বলতো, "তুমিও নদীতে সাবধানে যেও, পা পিছলে পড়ে যেওনা আবার!" একদিন বুড়ি নদীতে গিয়েছে কাপড় কাচতে। থপথপাথপ আওয়াজ করে কেচেই চলেছে। নদীর ধারেই ছিল একটা মস্ত গোলাপজামের গাছ। সেখান থেকে টুপ করে একটা ফল খসে পড়ল বুড়ির কোলে। বুড়ির বেশ খিদে পেয়েছিল। সে ঝটপট মুখে পুরে দিল ফলটা। "আহ কী মিষ্টি!" বুড়ির মনে হল গাছ ভর্তি ফল, তাও আবার এত মিষ্টি যদি বুড়োর জন্যও একটা নিয়ে নেওয়া যেত। বুড়ি সুর করে বলল, "তেঁতো ফল-তেঁতো ফল গাছে যেন ঝোলে/ মিঠে ফল-মিঠে ফল এসো মোর কোলে!" বলা মাত্র আরেকটা মস্ত গোলাপজাম বুড়ির কোলে এসে পড়ল। বুড়ি খুশি হয়ে সেই ফল নিয়ে বাড়ি চলে গেল। সন্ধেবেলা বুড়ো কাঠ কেটে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল। বুড়ি বলল, "এই দেখো তোমার জন্য মিষ্টি ফল এনেছি!" বুড়ো সেটাকে কাটতে যেতেই ফলটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল আর সেখান থেকে বেরিয়ে এল চাঁদপানা এক ছেলে। বুড়ো-বুড়ি তো অবাক। ছেলেটা বেরিয়ে এসেই দারুণ লাফালাফি শুরু করল। বুড়ি গরম জলে তাকে স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরিয়ে দিল। ছেলেটার গায়ের রঙ একদম গোলাপি। তাই বুড়ো তার নাম দিল গোলাপকুমার।

গোলাপকুমার এক থালা ভাত খায় আর একটু বেড়ে ওঠে। দু থালা ভাত খায় আরও একটু বেড়ে ওঠে। দেখতে-দেখতে গোলাপকুমার খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল। বুড়ো-বুড়ি তাকে যা শেখায় সে ঝটপট শিখে নেয়। বুড়ো আর বুড়ি দুজনেই খুব ভালবেসে ফেলল গোলাপকুমারকে।

সেই গ্রামের শেষে থাকত এক দুষ্টু দৈত্য। সে প্রায়ই গ্রামের এসে লুটপাট করত। লোকজনকে মারত। সে ছিল ভয়ানক শক্তিশালী। তার ভয়েতে সবাই চুপ করে থাকত। গোলাপকুমার সেটা জানতে পেরে বেজায় খেপে গেল। সে বুড়ো-বুড়িকে বলল ওই দৈত্যকে মেরে তবেই তার শান্তি। বুড়ো আর বুড়ি তো কেঁদেই আকুল। তারা অনেক বোঝাল গোলাপকুমারকে। বলল, গোলাপকুমার এখনও অনেক ছোট, সে দৈত্যর সঙ্গে পেরে উঠবে না। কিন্তু তার সেই এক জেদ। দৈত্য না মেরে সে বাড়ি ফিরবে না। বুড়ো-বুড়ি হাল ছেড়ে দিল। গোলাপকুমার বুড়িকে অনুরোধ করল তার জন্য গোটাকতক চালের পিঠে তৈরি করে দিতে। সেই কথা মত বুড়ি একশ খানা চালের পিঠে বানিয়ে দিল। সেই চালের পিঠে ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু যা খেলে গোলাপকুমার একশ মানুষের শক্তি পাবে। বুড়ো তাকে নতুন জামাকাপড়, মাথার টুপি আর তার নিজের কাঠ কাটার কুঠার দিল। সেসব নিয়ে বুড়ো-বুড়িকে প্রণাম করে গোলাপকুমার চলল দৈত্য মারতে।

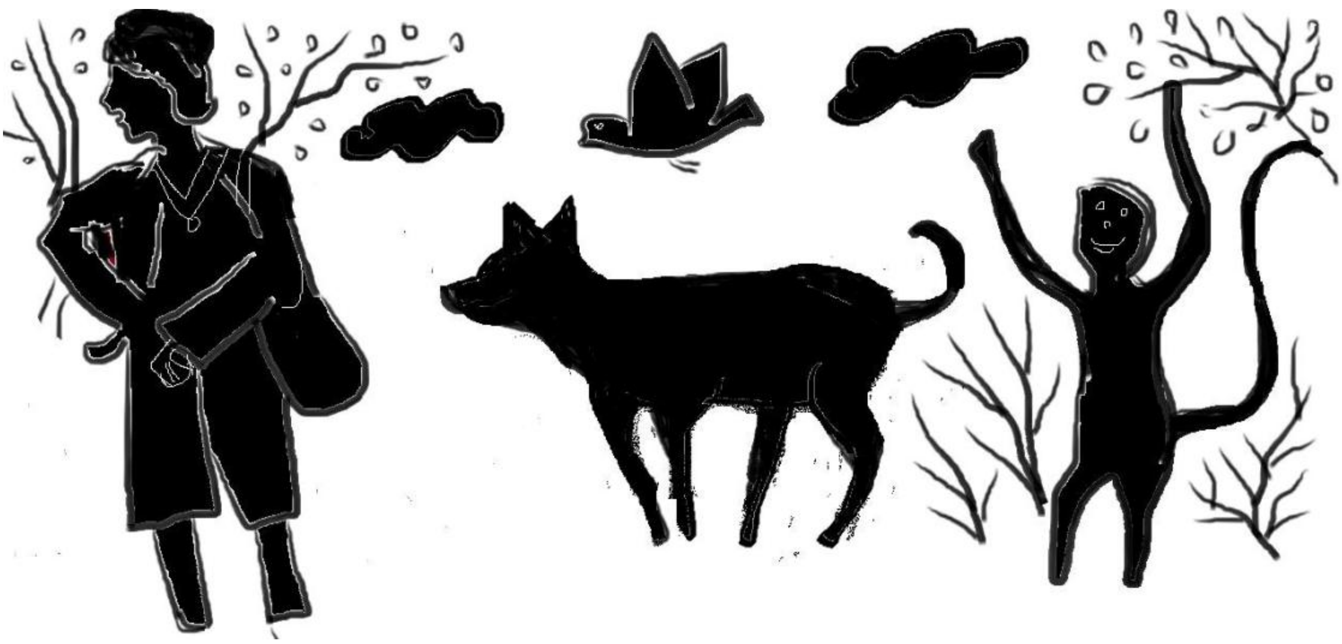

পথে তার সঙ্গে এক কুকুরের দেখা হল। সে বলল, “গোলাপকুমার তুমি কোথায় যাচ্ছ?” গোলাপকুমার বলল, “আমি যাচ্ছি দৈত্য মারতে।” “তোমার ঝুলিতে কী আছে?” “আমার ঝুলিতে আছে সুস্বাদু চালের পিঠে।” “গোলাপকুমার তুমি যদি আমায় একটা পিঠে দাও আমি তোমার সঙ্গী হতে পারি।” গোলাপকুমার রাজি হয়ে গেল। সে কুকুরকে একটা পিঠে দিল আর কুকুরটা তার সঙ্গী হল। খানিকদূর যাওয়ার পর দেখা হল এক বাঁদরের সঙ্গে। সে বলল, “গোলাপকুমার তুমি কোথায় যাচ্ছ?” গোলাপকুমার বলল, “আমি যাচ্ছি দৈত্য মারতে।” “তোমার ঝুলিতে কী আছে?” “আমার ঝুলিতে আছে সুস্বাদু চালের পিঠে।” “গোলাপকুমার তুমি যদি আমায় একটা পিঠে দাও আমি তোমার সঙ্গী হতে পারি।” গোলাপকুমার রাজি হয়ে গেল। সে বাঁদরকে একটা পিঠে দিল আর বাঁদরটা তার সঙ্গী হল। খানিকদূর যাওয়ার পর দেখা হল এক পায়রার সঙ্গে। সে বলল, “গোলাপকুমার তুমি কোথায় যাচ্ছ?” গোলাপকুমার বলল, “আমি যাচ্ছি দৈত্য মারতে।” “তোমার

ঝুলিতে কী আছে?" "আমার ঝুলিতে আছে সুস্বাদু চালের পিঠে।" "গোলাপকুমার তুমি যদি আমায় একটা পিঠে দাও আমি তোমার সঙ্গী হতে পারি।" গোলাপকুমার রাজি হয়ে গেল। সে কুকুরকে একটা পিঠে দিল আর কুকুরটা তার সঙ্গী হল। এইভাবে গোলাপকুমার কুকুর, বাঁদর আর পায়রাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। পর্বত, উপত্যকা, জঙ্গল পেরিয়ে তারা একটা নদীর সামনে উপস্থিত হল। নদীর ওপারে এক দ্বীপ। আর সেই দ্বীপেই থাকে সেই দুষ্টু দৈত্য। নদীর তীরে নৌকো বাঁধা ছিল। গোলাপকুমার আর তার সঙ্গীরা তাতে চেপে বসল। শুধু পায়রা তাদের সঙ্গে-সঙ্গে উড়তে থাকল। নৌকো ছুটে চলল দুরন্ত গতিতে। খানিক দূর যাওয়ার পর পায়রা বলল "আমি সেই দৈত্যের দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি।" গোলাপকুমার ও তার সঙ্গীরা সেই দ্বীপে পৌঁছে দেখল সেখানে একটা বিরাট দরজা। গোলাপকুমার হাঁক পাড়ল, "কেউ আছেন?" কেউ সাড়া দিল না। তখন সেই বাঁদরটা দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে দরজা খুলে দিল।গোলাপকুমার কুঠার উঁচিয়ে হুংকার দিল "কোথায় সে দৈত্য? আজ তাকে শেষ করে দেব আমি!" দৈত্য ঘুমোচ্ছিল। সে তো চিৎকার শুনে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর গোলাপকুমারের মত ছোট্ট ছেলেকে দেখে হেসেই কুটোপাটি। গোলাপকুমার লাফিয়ে এসে তার পায়ের কাছে মারল এক কোপ। দৈত্য উলটে পড়ে গেল। আর সেই সুযোগে পায়রা তাকে ঠোক্কর মারল। বাঁদর আঁচড়ে দিল আর কুকুর কামড়ে দিল। দৈত্য পুরো কাবু হয়ে গেল। সে কাঁদতে-কাঁদতে গোলাপকুমারের পায়ের কাছে এসে পড়ল। "আমাকে তুমি ছেড়ে দাও গোলাপকুমার। আমি তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা করছি। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি আর কোনওদিন কোনও খারাপ কাজ করব না। এতদিন তোমাদের গ্রাম থেকে যা লুট করেছি সব দিয়ে দেব।" গোলাপকুমার খুশি হল। "ঠিক আছে তুমি যখন কথা দিচ্ছ আমি তোমায় ছেড়ে দিলাম।" তারপর দৈত্যের ফেরত দেওয়া সব ধনসম্পত্তি একটা ঝোলায় নিয়ে ফিরে চলল। ঝোলাটা এত বড় ছিল যে গোলাপকুমারের সেটা কাঁধে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। অনেক কষ্টে সে বাড়ি পৌঁছল। বুড়ো আর বুড়ি তো ভীষণ খুশি। তারা বলল, "গোলাপকুমারের মত ছেলে হয় না।" গ্রামের প্রত্যেকটা লোক তাই বলল। গোলাপকুমার কিছু ধন সম্পত্তি বুড়ো বুড়িকে দিল আর বাকিটা গ্রামের লোকেদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। গ্রামের সকলে ধন্য-ধন্য করল গোলাপকুমারকে। বুড়ো বুড়ি আর গোলাপকুমার সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল। সেদিন থেকে ওই গ্রামে সকলে চালের পিঠে খাওয়া শুরু করল এবং সেখানে একটা প্রবাদ চালু হয়ে গেল, "ছেলে হবে গোলাপকুমারের মত, নইলে নয়!"

ছবি - দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

লেখক পরিচিতিঃ দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ দিন ধরেই লেখালেখির সাথে যুক্ত। ছোটোদের জন্যই লিখতে ভালোবাসেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও ওয়েবজিনে নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

গল্প রেল

গল্পের অডিও

গল্প শুনতে চাও? নিচের ভিডিও লিংক দুটোয় ক্লিক করো –

১) গল্পঃ স্মৃতিধরের দিল্লী যাত্রা
রচনাঃ সুচিত্রা ভট্টাচার্য
পাঠঃ কথকতা

https://www.youtube.com/watch?v=3QPBI0J_22I

২) গল্পঃ রচনার রহস্য
রচনাঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
পাঠঃ দ্বৈতা গোস্বামী

https://www.youtube.com/watch?v=tKZw6zFDEoQ

পুরোনতুন গল্প::

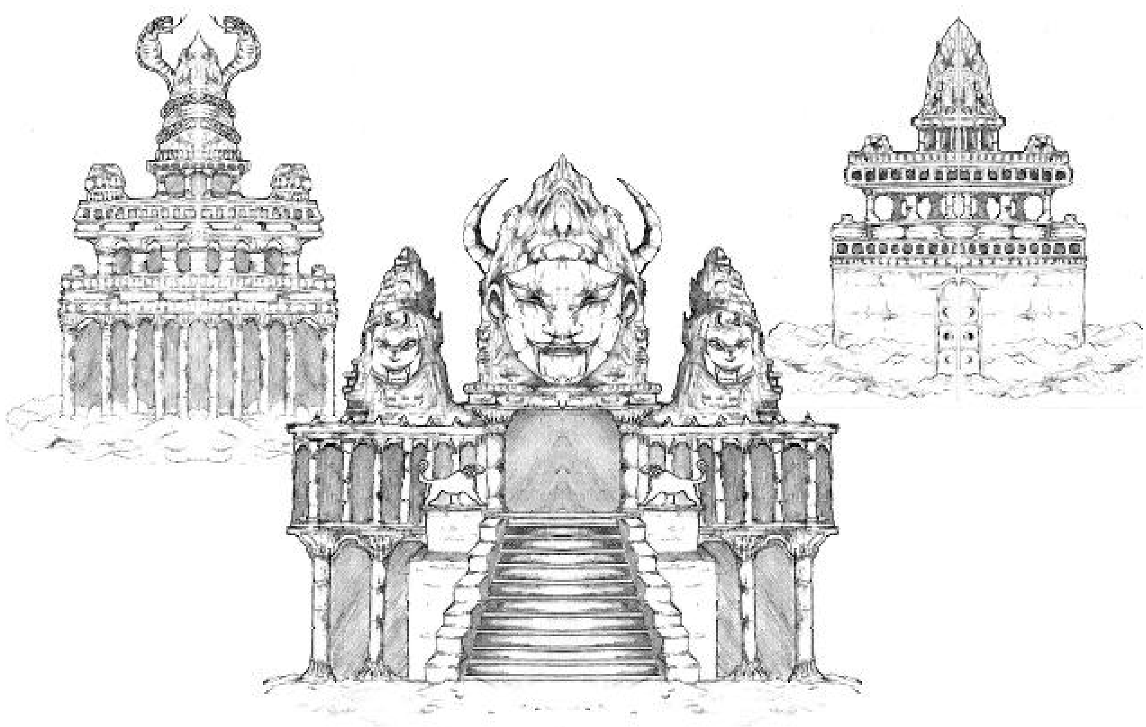

ত্রিপুর

অদিতি ভট্টাচার্য্য

দেবতা আর অসুরদের মধ্যে ছিল ভয়ানক শত্রুতা, যুদ্ধ লেগেই থাকত। তাতে কখনো দেবতারা জয়ী হতেন, কখনো বা অসুররা। একবার এরকমই এক ভীষণ যুদ্ধে দেবতারা অসুরদের পরাস্ত করলেন। অসুররা বুঝল যে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে গেলে তাদের আরো শক্তিশালী হতে হবে। তখন অসুরদের রাজা ছিল তারকাসুর। তার তিন ছেলে – তারকাক্ষ, কমলাক্ষ আর বিদ্যুন্মালী। ব্রহ্মার কাছে বরলাভ করার জন্যে তারা তিনজন কঠোর তপস্যা শুরু করল। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয় কিন্তু তাদের তপস্যা আর শেষ হয় না, বরং তা কঠোর থেকে কঠোরতর হয়। অবশেষে একদিন ব্রহ্মা প্রসন্ন হলেন। তপস্যারত তিন ভাইয়ের সামনে তিনি আবির্ভূত হলেন তাদের ঈপ্সিত বর প্রদান করার জন্যে।

তারকাক্ষ, কমলাক্ষ আর বিদ্যুন্মালী তো খুব খুশী, তাদের তপস্যা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে। তারা ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বলল, "প্রভু, যদি আপনি আমাদের তপে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে এই বর দিন যেন আমরা সর্বভূতের অবধ্য হই, ত্রিভুবনের কেউই যেন আমাদের কখনো হত্যা করতে না পারে।"

ব্রহ্মা কিন্তু এই বর দিতে রাজী হলেন না, বললেন, "অমরত্ব লাভের অধিকারী সবাই হয় না। তোমরা অন্য কোনো বর প্রার্থনা করো।"

তিন ভাই তখন গভীর পরামর্শ শুরু করল। অনেক ভাবনা চিন্তার পর তারা ব্রহ্মাকে বলল, "ভগবান, আমরা তিনজন তিনটি নগরে বাস করতে ইচ্ছুক। এই তিনটি নগর এমন হবে যাতে অবস্থান করে আমরা ত্রিলোকে বাধাহীনভাবে বিচরণ করতে পারব। এই নগর তিনটিতে আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু থাকবে এবং দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রাক্ষস – কেউ এদের বিনষ্ট করতে পারবে না। এমন কী কোনো দৈব অস্ত্র বা

ব্রহ্মশাপও এই তিনটি পুরের কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। হাজার বছর পরে একদিন কিছুক্ষণের জন্যে আমরা তিনজন মিলিত হব, তখন আমাদের ত্রিপুরও এক হবে। সেই সময় যদি কোনো দেবতা একটি মাত্র বাণে ত্রিপুর ভেদ করতে পারেন তবেই আমাদের মৃত্যু হবে।”

ব্রহ্মা “তথাস্তু” বলে চলে গেলেন।

মনোমতো বর পেয়ে তারকাক্ষদের তিন ভাইয়ের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রইল না। এ তো প্রায় অমরত্ব লাভেরই সমান হল। ত্রিপুরকে একটি মাত্র বাণে বিদ্ধ করা কি যে সে কাজ! তারকাক্ষরা নিশ্চিত যে কেউই এ কাজ করতে পারবে না। তারা ময় দানবকে নিযুক্ত করল নগর তিনটি নির্মাণের কাজে। স্থপতি হিসেবে ময় দানবের খুব খ্যাতি ছিল। তাছাড়া তপোবল তারও কিছু কম ছিল না, অনেকরকম মায়া, জাদুবিদ্যা জানত সে। ময় একটি সোনার, একটি রুপোর আর একটি লোহার পুর তৈরি করল। সোনার পুরটি রইল স্বর্গে, রুপোরটি অন্তরীক্ষে আর লোহারটি পৃথিবীতে। এই তিনটি বিরাটাকার পুরেই বহু সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, অট্টালিকা, ফুলে ফলে ভরা বাগান, চওড়া চওড়া রাজপথ, তোরণ ইত্যাদি তৈরি হল। দেবতাদের দ্বারা পরাজিত, বিতাড়িত অসুর, দানবেরা দলে দলে এই ত্রিপুরে আশ্রয় নিতে লাগল। তাদের পক্ষে এত নিরাপদ স্থান আর কোথাও ছিল না। ময় দানবের মায়ার প্রভাবে তারা যখন যা চাইত তাই পেত।

তারকাক্ষের এক পুত্র ছিল, তার নাম হরি। সেও ব্রহ্মার তপস্যা করেছিল। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে বর দিতে চাইলে সে বলল, “আমি আমাদের ত্রিপুরে এমন পুকুর তৈরি করতে চাই যাতে স্নান করলে মৃত অসুররাও প্রাণ ফিরে পাবে।”

ব্রহ্মা হরিকে সেই বরই দিলেন। হরি তো মহা আনন্দিত হয়ে ত্রিপুরের প্রতিটা পুরেই একটি করে মৃত সঞ্জীবনী পুকুর তৈরি করল।এরপর চতুর্দিকে অসুরদের অত্যাচার ক্রমশই বাড়তে লাগল। যদি বা কোনো অসুর মারা যায়, অন্যরা তাকে এনে মৃত সঞ্জীবনী পুকুরের জলে স্নান করায় আর অমনি সে জীবিত হয়ে ওঠে। অসুরদের আর কোনো ভয়ই রইল না। তারা যা খুশী তাই করে বেড়াতে লাগল। ত্রিভুবনে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল।অসুরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর অস্ত্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন ত্রিপুরের ওপর। কিন্তু ব্রহ্মার বরে বজ্র ত্রিপুরের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারল না। তখন নিরুপায় হয়ে দেবরাজ সহ সব দেবতারা ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন এবং ত্রিপুর বিনাশের নিবেদন করলেন।

ব্রহ্মা বললেন, “আমার বর পেয়ে অসুররা সাহসী হয়ে উঠেছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। এদের বিনাশ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কেউ যদি একটি মাত্র বাণে ত্রিপুরকে বিদ্ধ করতে পারে তবেই তা সম্ভব। মহেশ্বরই একমাত্র এই কাজ করতে পারবেন, তোমরা তাঁর শরণাপন্ন হও।”

দেবতারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে মহেশ্বরের কাছে গেলেন এবং তাঁর স্তব করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন।

ব্রহ্মা অসুরদের অত্যাচারের কথা জানিয়ে বললেন, “একমাত্র আপনিই ত্রিপুর ধ্বংস করে অসুরদের হাত থেকে জগত সংসারকে রক্ষা করতে পারেন পিনাকপাণি। আপনি প্রসন্ন হোন, ত্রিপুর বিনাশ করুন।”

“ব্রহ্মার বর লাভ করার পর অসুরদের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি একা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহী নই। তোমরা সব দেবতারা এক হও, আমি আমার অর্দ্ধেক বল তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে অসুরদের পরাজিত করো,” দেবতাদের বললেন মহেশ্বর।

"আপনার অর্দ্ধেক বলও আমরা সকলে মিলে ধারণ করতে অসমর্থ। আপনিই বরং আমাদের সকলের সম্মিলিত শক্তির অর্দ্ধেক গ্রহণ করুন এবং শত্রু দমন করুন," দেবতারা আর্জি জানালেন, "ত্রিপুর এক হওয়ার সময় শীঘ্রই আসছে। এই সুযোগ অসুরদের বিনাশ করার।"

মহেশ্বর সম্মত হলেন। তিনি দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির অর্দ্ধেক গ্রহণ করলেন। এর ফলে তিনি সকলের চেয়ে বেশী বলশালী হলেন এবং মহাদেব নামে খ্যাত হলেন।

মহাদেব অসুরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করবেন, বিশ্বকর্মা এলেন তাঁর জন্যে রথ নির্মাণ করতে। সে এক অসামান্য রথ প্রস্তুত হল। পৃথিবী, হিমালয় পর্বত, গ্রহ, নক্ষত্র, নাগরাজ বাসুকি, সপ্তর্ষি মণ্ডল, নানান নদী ইত্যাদি দিয়ে রথের বিভিন্ন অংশ তৈরি হল। চন্দ্র আর সূর্য রথের চাকা হলেন। ইন্দ্র, বরুণ, যম আর কুবের হলেন রথের চার ঘোড়া। সুমেরু পর্বত হল রথের ধ্বজদণ্ড আর বিদ্যুৎ সহ মেঘ হল ধ্বজা। বিষ্ণু, অগ্নি, সোম মহাদেবের বাণ হলেন। ব্রহ্মা হলেন সারথি।

রথ দেখে মহাদেব প্রসন্ন হলেন। তিনি রথে আরোহণ করলেন এবং ব্রহ্মাকে বললেন রথ অসুরদের কাছে নিয়ে যেতে। অন্যান্য দেবতারাও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। দেখতে দেখতে ঘোর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মহাদেব ধনুকে শর যোজনা করে অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় সেই মুহূর্ত এল। ত্রিপুরের তিনটি পুর আলাদা আলাদাভাবে বিচরণ করতে করতে এক হল। দেবতারা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। মহাদেব একটুও সময় নষ্ট না করে সেই দিব্য বাণ নিক্ষেপ করলেন ত্রিপুরের উদ্দেশ্যে। অসুরদের আর্তরবে চতুর্দিক ভরে গেল, ত্রিপুর শত শত অসুর সহ দগ্ধ হয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপিত হল।

তথ্যসূত্র - কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ, রাজশেখর বসু।

ছবি - অভিনব সাহা

লেখক পরিচিতিঃ লেখক সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। কর্মসূত্রে আরব দুনিয়াতেও থেকেছেন। ভ্রমণ, ছবি তোলা, এমব্রয়ডারির পাশাপাশি লেখালিখিতেও সমান উৎসাহী। নানান ওয়েব ম্যাগাজিন এবং পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। প্রকাশিত গল্প সংকলন 'গল্পের খোঁজে।'

পুরোনতুন গল্প::

বাঙালীর দুর্গোৎসব

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋগ্বেদের রুদ্র ও রুদ্রাণী পৌরাণিক যুগে এসে হয়েছেন শিব এবং শিবানী। এই শিব-শিবানীর সূত্র ধরেই এসেছেন পার্বতী, হৈমবতী ও উমা। পরবর্তীকালে এরাই 'দুর্গা' নামে সুপ্রসিদ্ধা। দেবী দুর্গা সর্বভারতীয় হলেও উমা বাঙালীর একান্ত আপনার হয়ে গেছেন। আশ্বিন মাসের শুক্লাপক্ষে উমার তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে আগমন এবং দশমীর প্রভাতে পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন – এই প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হয় বাঙালীর দুর্গোৎসব। শরৎকালের শুক্লা তিথির প্রতিপদ থেকে শুরু হয় দেবীপক্ষ। আর তখন থেকেই মাতৃপূজার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে বাঙালী সমাজ।

শরৎকালের দুর্গোৎসব কবে শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ন অনুসারে এই পূজার প্রবর্তক শ্রী শ্রী রামচন্দ্র। শরৎকালের এই দুর্গা পূজাকে বলা হয় 'অকাল বোধন'। রাবন বধের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র এই অকালবোধনের আয়োজন করেছিলেন। তবে বাংলাদেশে এই পূজার প্রচলন নিয়ে যে জনশ্রুতি আছে তা হল অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজসাহী জেলার তাহেরপুরের বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ বংশীয় জমিদার রাজা কংসনারায়ন আট লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রথম এই পূজা করেছিলেন। এটি আজ থেকে প্রায় সারে চারশ বছর আগের ঘটনা। শরৎকালের আগে এই পূজা অনুষ্ঠিত হত বসন্তকালে— যা বর্তমানে 'বাসন্তী পূজা' নামে পরিচিত।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিজাত ফসল ঘিরে নানা উৎসবের প্রচলন আছে এদেশে। শরৎকালে কৃষিজাত পুরুষ্টু ফসলে মাঠ ভরে ওঠে। তাই অনেকের মতে শরতের দুর্গোৎসব হল ফসল ঘরে তোলার প্রাক-মুহূর্ত অনুষ্ঠান।

তৈত্তিরিয় আরণ্যকের অন্তর্গত বিভিন্ন উপনিষদে দেবী দুর্গার যে বর্ণনা আছে তা থেকে বলা যায় যে দুর্গার আবির্ভাব পৌরাণিক যুগেরও আগে। বৈদিক যুগে সাহিত্যে যেমন দুর্গার কথা আছে তেমন প্রাক্ বৈদিক যুগে অর্থাৎ, অনার্য যুগেও তাঁর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বৈদিক-উত্তর পৌরাণিক যুগে দুর্গার সঙ্গে চণ্ডী মিলেমিশে এক হয়ে যান। অস্ট্রিক শব্দ 'চাণ্ডী' থেকে 'চণ্ডী' শব্দের উৎপত্তি। চাণ্ডী ছিলেন অস্ট্রিক মানুষদের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করা দেবী। তাই ধরে নেওয়া যায় চাণ্ডী ছিলেন অনার্য দেবী। দ্বাদশ শতকে লেখা 'কালবিবেক' গ্রন্থে দুর্গা পূজাকে শবরদের পূজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আদিতে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল আরণ্যক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। দলবদ্ধভাবে শিকার করা সে যুগে জীবন ধারণের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হত। দুর্গার মূর্তি কল্পনাতেও আমরা এর ইঙ্গিত পাই। মূর্তির বাহনগুলি সে যুগের মানুষের শিকারী জীবনের স্মারক। বসন্তকাল শিকারের উপযুক্ত সময়। তাই কারও কারও মতে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসব ছিল শিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎসব। পরবর্তীকালে মানুষ যখন শিকারের পথ থেকে সরে এসে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন আরণ্যক অর্থনীতির গুরুত্ব তাদের জীবনে ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে। ফলে শিকারকেন্দ্রিক উৎসবগুলি কৃষিভিত্তিক উৎসবে পরিণত হয়। বসন্তকালের দুর্গোৎসবের কাল-পরিবর্তনের কারণও সম্ভবত এটাই।

বসন্তকালের দুর্গাপূজার আর শরৎকালের দুর্গাপূজার মন্ত্র এবং উপাচারে কোনো তফাৎ নেই। তবে বসন্তকালের পূজায় কোনো বোধনের বিধান না থাকলেও শরৎকালের দুর্গাপূজায় বোধনের প্রয়োজন হয়। তবে দুর্গোৎসবের সাজ সাজ রব শুরু হয়ে যায় মহালয়া থেকেই।

মহালয়াঃ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নাম মহালয়া। অর্থাৎ মহা আলয় বা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। এই দিনটি হল পিতৃপক্ষের শেষ দিন। এর পরেই শুরু হয় দেবীপক্ষ। অর্থাৎ মায়ের আগমনের সন্ধিক্ষণ। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে একই ছত্রতলে এনে এবং খুশি ও তৃপ্ত করে শুরু হয় মাতৃবোধনের আয়োজন। মানুষে মানুষে সকল দ্বন্দ্বের অবসান কামনার সঙ্গে প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের খুশিও প্রার্থনা করা হয় এই দিনে। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি ও জীবজগতের প্রতি সুগভীর মমতা, সহানুভূতি, প্রেম ও ভালোবাসার এক অপূর্ব ভারতীয় ঐতিহ্য নিহিত আছে মহালয়ার ক্ষণের মধ্যে।

বোধনঃ কেন এই বোধন? একই পূজায় সময়ভেদে ভিন্নরূপ কেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে দেবতাদের দিন রাতের হিসেব থেকে। মানুষের মতো দেবতারাও দিনে জেগে থাকেন আর রাতে ঘুমোন। তবে দেবতাদের ক্ষেত্রে দিন ও রাতের হিসেবটা একটু অন্যরকম। সূর্য যখন উত্তরায়নে তখন দেবতাদের দিন অর্থাৎ, দেবতারা তখন জেগে আছেন। এই সময়ে তাঁদের পূজা করার জন্য বোধনের প্রয়োজন হয় না। আর সূর্য যখন দক্ষিণায়নে তখন দেবতাদের রাত অর্থাৎ, দেবতাদের তখন ঘুমোনোর সময়। এই সময় কোনো দেব-দেবীর পূজা করতে হলে বোধনের মাধ্যমে তাঁকে জাগ্রত করে নিতে হয়— এটাই শাস্ত্রের বিধান। শরৎকালে সূর্য দক্ষিণায়নের পথে থাকে, তাই দেবতারা তখন নিদ্রা যান। এই কারণে শারদীয় দুর্গা পূজায় বোধনের আয়োজন করতে হয়। বোধনের মন্ত্র উচ্চারিত হয় ষষ্ঠীর সন্ধ্যাকালে।

কলা বৌ স্নানঃ "সপ্তম্যাং পত্রিকা পূজা রম্ভাদিনব পত্রিকা"। বিভিন্ন পুরাণে সপ্তমী তিথিতে দুর্গা পূজার সাথে কলা বৌ বা নবপত্রিকা পূজার বিধান দেওয়া আছে। তাই সপ্তমীর সকালে কলা বৌ স্নান দুর্গা পূজার এক বিশেষ অঙ্গ। পূজার ক'দিন এই কলা বৌ গণেশের ডান পাশে অধিষ্ঠান করে বলে অনেকেরই ধারণা কলা বৌ গণেশের বৌ। যদিও এই ধারণা ঠিক নয়। ঘোমটার আড়ালে কলা বৌ প্রকৃতপক্ষে গণেশ-জননী দুর্গারই আরেক রূপ। কারও কারও মতে পৃথিবী-মাতাই হলেন এই নবপত্রিকা বা কলা বৌ। আরও একটি মত হল, কলা বৌ আসলে শস্য-বধূ। ভারত কৃষিনির্ভর দেশ। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে ধর্মের সঙ্গে কৃষির একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। নবপত্রিকা তারই প্রতীক। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল ভেষজ নির্ভর। নবপত্রিকায় যে ন'টি গাছ-গাছড়া থাকে তার প্রতিটিই ভেষজগুণ সম্পন্ন। এই ন'টি গাছ-গাছড়া হল— হলুদ, জয়ন্তী, কচু, কলা, বেল, ডালিম, অশোক, মান ও ধান। সারা বছর অসুখ-বিসুখের হাত থেকে রক্ষা পেতে ভেষজ ওষুধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় নবপত্রিকা। ধানকে আবার ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসেবেও ধরা হয়। গুরুজনেরা কনিষ্ঠদের আশীর্বাদ করার সময় ধান-দূর্বা ব্যবহার করে থাকেন। কারণ হিন্দুদের কাছে ধান-দূর্বা হল ঐশ্বর্য ও নম্রতার প্রতীক।

নবপত্রিকার ন'টি গাছকে আবার দেবী রূপেও কল্পনা করা হয়। রূপগুলি হল, উমা (হলুদ গাছ— উমারূপে সর্ব বিঘ্ন নাশের জন্য পূজা করা হয়। দেবী হরিদ্রাবর্ণ বলে হলুদ গাছে তাঁর অধিষ্ঠান), কার্ত্তিকী (জয়ন্তী গাছ— সর্বজয়ের অধিষ্ঠাত্রী কার্ত্তিকীরূপে পূজা করা হয়। দেবী জয়রূপিনী), চামুণ্ডা (মানকচু গাছ— চামুণ্ডারূপে পূজা করা হয়। দেবী মানদায়িনী), শিবা (বেল গাছ— সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্য পূজা করা হয়। শিব ও শিবানীর প্রিয় অধিষ্ঠান ক্ষেত্র), শোকরহিতা (অশোক গাছ— সর্বশোক নাশের জন্য দুর্গারূপে পূজা করা হয়), রক্তদন্তিকা (ডালিম গাছ— ডালিমের বীজ যেমন রক্তবর্ণ অসুর বিনাশকালে দেবী সেরূপ রক্তদন্তবিশিষ্টা হন), কালিকা (কালকচু গাছ— সর্বসিদ্ধির জন্য এইরূপে পূজা করা হয়), ব্রহ্মাণী (কলা গাছ— সর্বশান্তি বিধানের জন্য ব্রহ্মাণী দুর্গারূপে পূজা করা হয়), লক্ষ্মী (ধান গাছ— ঐশ্বর্যের প্রতীক। জীবের প্রাণরক্ষাকারিণী লক্ষ্মীরূপে পূজা করা হয়)।

সন্ধিপূজাঃ সন্ধিপূজা দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অঙ্গ। এই পূজার আয়োজন করা হয় অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে। অষ্টমী তিথির শেষ এক দণ্ড এবং নবমী তিথির প্রথম এক দণ্ড অর্থাৎ, মোট দু'দণ্ডের মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন করতে হয়। বর্তমান হিসেব মতো এক দণ্ড = ২৪ মিনিট। রাম-রাবণের যুদ্ধ চলাকালীন রাবণ বধের উদ্দেশ্যে দেবীর কৃপা লাভের জন্য দশরথ পুত্র রামচন্দ্র অকালবোধন করেছিলেন। প্রচলিত উপাখ্যান অনুসারে এই অকালবোধনের পর রামচন্দ্র দেবীর কৃপা লাভ করেছিলেন এবং সপ্তমী তিথিতে দেবীশক্তির প্রভাবে তাঁর অস্ত্রসম্ভার হয়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর। সপ্তমী-অষ্টমী দু'দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে রামচন্দ্রের অস্ত্রে রাবণের দশটি মাথাই খণ্ডিত হয়। কিন্তু কোনো এক অলৌকিক শক্তিবলে সেই মাথা পরক্ষণেই রাবণের দেহে পুণরায় সংযোজিত হয়। তাই যুদ্ধ গড়ায় নবমী তিথি পর্যন্ত। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর এই দিন রাবণের পতন হয়।

সন্ধিপূজাতে দেবী প্রতিমাতে আবির্ভূতা হন — এরকম লৌকিক বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এই সময় দেবী দুর্গাকে চামুণ্ডা বা কালী রূপে কল্পনা করা হয়। তাই পূজার আয়োজনও করা হয় সেইমত। দেবীর

চামুণ্ডারূপ ধারণ নিয়ে শ্রী শ্রী চণ্ডীতে কথিত আছে দৈত্য শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে বিনাশ করার জন্যই দেবী দুর্গার এই নামকরণ।

বিজয়া দশমীঃ নবমী পূজার শেষে বাঙালীর হৃদয়ে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। উমা আজ চলে যাবে পতিগৃহে উমা এখন আর শুধু মেনকা-কন্যা নন, সমস্ত বাঙালী পরিবারের কন্যা। তাই তাঁর চলে যাবার মুহূর্তে সবারই মন ভারাক্রান্ত। মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে সেই এক বছর পরে। এয়োস্ত্রীরা অশ্রুসজল নয়নে দেবী বরণের সাথে সাথে মাকে বিদায় জানায়। তাদের আকুল মিনতি – মা আবার আগামী বছর এসো। পাশাপাশি দেখা যায় দশমী তিথিতে 'বিজয়া দশমী' পালিত হতে। এদিন থাকে না জাত-পাতের বাছবিছার, থাকে না কোনো শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ। পরস্পর পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাই। একে অপরকে করাই মিষ্টিমুখ।

রামায়নে বর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধের শেষদিন ছিল শরৎকালের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি। এই দিন রাবণ রাম কর্তৃক নিহত হন। রাবণের পতনের পর স্বাভাবিক কারণেই রামবাহিনী বিজয় উৎসবে মেতে ওঠে। দশমী তিথির 'বিজয়া' উৎসব এই রাবণ-বিজয় উৎসবেরই অঙ্গ। অবশ্য এর ভিন্নতর ব্যাখ্যাও আছে।

দেবী বরণঃ দশমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় স্ত্রী লোকাচার 'দেবী বরণ'। মা-দুর্গা চলে যাচ্ছেন। মেয়ে উমা চলে যাচ্ছেন পতিগৃহে। চির আয়ুষ্মতী উমাকে বিদায় জানাতে পাড়ার সধবা রমণীরা আসেন পূজা-প্রাঙ্গনে। একে একে তাঁরা উমাজ্ঞানে মা-দুর্গার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন এবং সেই অক্ষয় সিঁদুর নিজেদের সিঁথিতে ধারণ করেন। মা-দুর্গার মুখে তুলে দেওয়া হয় মিষ্টি আর পান। এরপর এয়ো-স্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। এই সিঁদুর পরিয়ে দেওয়াকে বলা হয় 'সিঁদুর খেলা'। দেবী বরণের সঙ্গে শেষ হয় বাঙালীর দুর্গোৎসব।

দেবী দুর্গা আদ্যাশক্তিরই এক রূপ। প্রাক বৈদিকযুগ থেকে দেবী পূজিতা হয়ে আসছেন। দেশমাত্রিকা বা পৃথিবী-মাতারূপেও তিনি অধিষ্ঠিতা এবং পূজিতা। পূজার একটি মন্ত্রে দেবীকে প্রণাম জানাতে গিয়ে বলা হয়েছে— 'দেশবাসিনীভ্যঃ নমঃ' বা 'দেশবাসিন্যৈঃ নমঃ'।

~~~~~~*~~~*

ছবি — দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

লেখক পরিচিতিঃ কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় লেখক এবং শিক্ষাবিদ। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। তাঁর লেখা বইগুলি পাঠক মহলে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের আজীবন সদস্য। বর্তমানে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ সভাপতি। জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। এছাড়াও তিনি আরও অনেক পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। আকাশবানী কলকাতা কেন্দ্রে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে থাকেন। দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২০০৫ সালে 'গোপাল ভট্টাচার্য স্মৃতি' পুরস্কার প্রদান করেন। লেখকের সম্পর্কে আরও জানতে হলে এই ব্লগে যেতে হবে Blogsite: kbbwriter.wordpress.com

ছড়া-কবিতা::

ম্যাজিক ল্যাম্প

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

পড়ার ম্যাজিক, খেলার ম্যাজিক
মনের মতো ইচ্ছে ম্যাজিক
মেঘ মুলুকে বৃষ্টি হয়ে
রামধনু রঙ ঝরছে ম্যাজিক
সবার মুখে একটি নাম
"ম্যাজিক ল্যাম্প, ম্যাজিক ল্যাম্প"

দেশ বিদেশে ঘোরার ম্যাজিক
জাদু- মাদুর চড়ার ম্যাজিক
পাখির ডানায় ওড়ার ম্যাজিক
সবার মনে একটি নাম
"ম্যাজিক ল্যাম্প, ম্যজিক ল্যাম্প"

সবুজ ফড়িং , নীল জোনাকি
অবাক ছেলে দেখছ না কি?
শিশির ধোয়া ভোরের বেলা
স্বপ্ন শহর আঁকছ নাকি?
আঙ্গুল ছুঁয়ে আঁকার ম্যাজিক

শুধুই ভালো থাকার ম্যাজিক
সবার কাছে একটি নাম
"ম্যাজিক ল্যাম্প, ম্যাজিক ল্যাম্প"

রাস্তাঘাটে কাগজ কুড়োয়
ছোট্টবেলা এমনি ফুরোয়
ভাতের হোটেল, বাসন ধুয়ে,
সিঁড়ির নীচে পড়ছে শুয়ে
অন্ধকারে, গুমটি ঘরে
ইচ্ছে গুলো শুকিয়ে মরে
ওদের দেবে খুশির খাম?
ম্যাজিক ল্যাম্প? ম্যাজিক ল্যাম্প?

সত্যি করে আনবে ম্যাজিক?
সবাই তবে মানবে ম্যাজিক
সবার সেরা একটি নাম
“ম্যাজিক ল্যাম্প, ম্যাজিক ল্যাম্প”

ছবি – লেখক

ছড়া-কবিতা::

অপু-দুগ্গা'র পুজো

মহাশ্বেতা রায়

" 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি...'
বল তো দিদি , আসবে কবে দুগ্গাপুজোর ছুটি?"

"খালি দেখছি ছুটির চিন্তা, পড়াতে নেই মন-"
"আচ্ছা দিদি, জানিস কি তুই, কোথায় কাশের বন?

সেই যেমনটা দেখেছিলাম 'পথের পাঁচালী' তে-
ছুটেছিল দুগ্গা-অপু রেলগাড়ি দেখতে..."

"ধুর পাগ্লা , এই শহরে কোথায় সে সব পাবি..."
"আচ্ছা দিদি, আমার সাথে ছাদে একবার যাবি?

দেখ্ না কেমন আকাশেতে গোল একখান চাঁদ-
চল না দেখি চাঁদের হাসি ভাঙছে কেমন বাঁধ?"

"দেখ ভাই, তুই এবার কিন্তু খুব বকাটা খাবি !
কালকে না তোর ক্লাস টেস্ট? তুই ঠিক গোল্লা পাবি !"

"আচ্ছা দিদি, একটা কথা - সত্যি কিন্তু বলিস-
সবার থেকে এত্ত দূরে সত্যি ভাল আছিস?

কার সাথে তুই ঝগড়া করিস, কার সাথে স্কুল যাস ?
কার সাথে তুই ফেরার পথে আইসক্রিম কিনে খাস?

একলা একলা স্কুলে যেতে ভাল্লাগেনা আমার,
চোখে কেমন জল এসে যায়, গলার কাছে ভার..."

"অপুরে, তুই দেখছি রয়েই গেলি বোকাটা
আমি তো তোর সাথেই থাকি বুঝিসও না সেটা?

সেই যে সেদিন হঠাৎ করে বৃষ্টি দুপুরবেলা,
কাদাজলে তোর সাথে তো আমিই করলাম খেলা,

আর যেদিন তুই ফাংশনেতে দারুণ গেয়েছিলি-
সবার থেকে জোরে আমি দিলাম হাত্‌তালি,

ছবি আঁকিস যখন নিয়ে রং-পেন্সিল- তুলি
একেক সময় দু-চারটে টান আমিও দিয়ে ফেলি,

আসলে তো থাকি আমি তোর মনের ভিতর
সকাল-বিকেল-দিন-রাত্তির-পুরো-বছরভর..."

"হ্যাঁ রে দিদি, ঠিক বলেছিস, তাই তো আমি ভাবি-
ইচ্ছে হলেই কেন দেখি মনভরানো ছবি -

সেই ছবিতে ছুটছি আমি তোর হাতটা ধরে-
কাশের বনে, ধানের ক্ষেতে, নদীর ধারে ধারে,

অনেক দূরে ট্রেন চলে যায় কু-ঝিকঝিক-ঝিক-
নদীর জলে চাঁদের আলো করে যে ঝিকমিক-

সেই জায়গার নাগাল খুঁজে পায়না গুগ্‌ল্‌ ম্যাপ্‌
পায়না বাবার স্মার্টফোনের নতুন ট্র্যাভেল অ্যাপ্‌ !

শুনতে পাচ্ছি বুকের ভিতর গুনগুনানো সুর-
তোর হাত ধরেই, মনের মাঝে , নিশ্চিন্দিপুর।"

"এই তো কেমন সব বুঝেছে আমার ভাই সোনা-
এবার তবে মন দিয়ে কর একটু পড়াশোনা !

আর ক'টা দিন পরেই পুজো, ঠিকই পাবি ছুটি-
পিকলু, রুনি, টুবুর সাথে করিস হুটোপুটি-
পড়লে মনে আমার কথা চোখ যদি হয় নদী-
ভাবিস, কোথায় গেল শোলোক বলা দুগ্‌গাদিদি...?

দেখিস খুঁজে ঢাকের বাদ্যি-আলোর মালার ফাঁকে
মন্ডপে মন্ডপে সে যে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ।।"

ছবি – দ্বৈতা

ছড়া-কবিতা::

প্রজাপতির খোকা

সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী

গোলাপফুলের পাতায় বসে একটা শুঁয়োপোকা
ডাকলে 'পোকা' রাগ করে সে – প্রজাপতির খোকা!
"নাই বা আছে রঙ বাহারি দুই খানি মোর ডানা
নাই বা পারি ধরতে উড়ে মস্ত আকাশ খানা,
খাচ্ছি পাতা এই বাগানে ফুর্তি করে বেশ,
কদিন পরেই দেখবে আমার অবাক করা বেশ।
তখন তো আর ওমনি করে সিঁটকোবে না নাক?
বলবে – 'আমার ফুল বাগিচায় সারাটি দিন থাক!'
চাইবে এসব সত্যি জানি, একটু সবুর করো,
চোখ ধাঁধিয়ে মন রাঙ্গাতে হপ্তা কয়েক আরো!"

ছবি – দ্বৈতা

ছড়া-কবিতা::

বছর নামচা

ঋতজিৎ মজুমদার

জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী - বছর হল শুরু,
পরীক্ষার কথায় বুক করে দুরুদুরু।
মার্চ এপ্রিল – বসন্তকাল, দোলের মজা হবে,
পরীক্ষার কথাটিও মনের ভিতর রবে।
মে জুন – ছুটি এখন, খেলা আর খেলা,
ইস্কুলটা খুললে পরেই পড়াশুনার মেলা।
জুলাই আগস্ট – সাবধান, হাফ-ইয়ার্লি কাছে,
পুজোর কথা মনে হতেই আনন্দে বুক নাচে।
সেপ্টেম্বর অক্টোবরে পুজো এসে গেলো,
বাঁধনছাড়া আনন্দ তাই, খাও দাও আর খেলো।
নভেম্বর ডিসেম্বর – বছর হলো শেষ,
একটু কোথাও বেড়িয়ে এলে জমবে ভালো বেশ।।

ছড়া-কবিতা::

বাঘিয়াবাদের গপ্পো

মধুমিতা ভট্টাচার্য

বাঘ রাজাকে দেখে এলাম বাঘিয়াবাদ গিয়ে
রাজ্য শাসন করেন তিনি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে
কোনও রকম দুষ্কর্ম হওয়ার তো নেই উপায়
চোর ডাকাতের শাস্তি ভীষণ, শূলের ওপর চাপায়
কেউ যদিবা তহবিলে এদিক সেদিক করে
পিঁপড়ে সেনার হাতেই তাকে দেন যে তিনি ছেড়ে
কুটুস পুটুস কামড় খেয়ে এমনি সে হয় নাকাল
কক্ষনো আর ভুলেও কোনো কাজ করেনা বেচাল।

হায়না ভায়া কুখ্যাত এক আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন
মারেন, কাটেন, ধমকি মারেন যক্ষণ তক্ষণ
রাজ্যের লোক অতিষ্ঠ তার অত্যাচারের ফলে
প্রতিবাদে একদিন সব বসলো সদলবলে -
ধর্ণা দিয়ে, ব্যাঘ্ররাজের গুহার সামনে যত
বাঘিয়াবাদের জীবজন্তু জুটল কয়েক শত
সবাই হাঁকে ইনকিলাবের জঙ্গলী তর্জমা
রাজা মশাই চমকে উঠে বলেন, “থামা থামা"
মিশকালো হাত কই রে আমার? গুঁড়োবি যে বড়?
হলুদ কালো এমন ডিজাইন দেখেছিস আর কারো?
চলছে নাকো, চলবে নাতো...চেঁচিয়ে ফাটাস গলা
খরগোশটাও লাফায় সাথে! এই সেদিনের পোলা?

বুঝলাম ওই হায়নাটাকে নিয়েই যত গোল
তাতেই হয়ে উত্তেজিত করছিস শোরগোল!
দেখতো তবে আমার মাথায় কত্তো জনের দায়
রাজ্য শাসন ভাবিস তোরা মুখের কথা? হায়!

তোরাই কিন্তু দলে ভারী, হায়না তো নেই বেশি
যদিও জানি ওদের নাচায় শত্তুর বৈদেশী।
লোহার মতন শক্ত যখন করবি দাঁত আর থাবা
গায়ের জোরে তোদের সাথে জিতবে তখন কে বা!
একতারই আরেকটি নাম শক্তি আগাগোড়া
বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র, জেনে রাখিস তোরা।

শুনে সবাই উত্তেজনায় চেঁচায় হাল্লা বোল
হায়না গুলোর দাঁতের পাটি চিমটে দিয়ে তোল!
হুড়মুড়িয়ে জুটে তখন একসাথে দল বাঁধে
কারো হাতে ঢাল-তলোয়ার, কেউ বা ধনুক কাঁধে,
হায়না ধরার কল রয়েছে বানর সেনার হাতে
পট্‌পটাপট বন্দী হবে ডন-হায়না তাতে।
ছাতা, লাঠি, জুতোর পাটি, খুন্তি, বেলন, কাঁটা,
তেলে বেগুন ব্যাঘ্র রাজার, চোখ দুখানি ভাঁটা!
হেঁকে বলেন শয়তানী সব বন্ধ হবে তোদের
জ্বলছে আগুন সবার মনে দারুণ প্রতিশোধের!
দূর থেকে সেই মোর্চা দেখে হায়না ভয়ে কাঁপে
বন-বন-বন ঘুরল মাথা প্রবল রক্তচাপে!
কাঁদল ভায়া 'হায় কি হোল' বলে বারংবার
যেই না দিলেন ব্যাঘ্র রাজা ভীষণ হুহুঙ্কার!
পড়ল ধরা আজব কলে হায়না হাতেনাতে
আচ্ছা রকম গণধোলাই চলল দিনে রাতে।

খতম হোল অত্যাচারী ডন-হায়না শেষে
সত্যের জয় কায়েম হলো ব্যঘ্র রাজার দেশে।
নয়কো এসব গল্পকথা, আজগুবি এক ছল,
বাঘিয়াবাদে গিয়েই দেখো হায়না ধরার কল।

ছবি - তন্ময় বিশ্বাস

ছড়া-কবিতা::

মা ও মেয়ে

সঙ্গীতা দাশগুপ্ত রায়

পরী মা'র পরী মেয়ে মেঘেদের দেশে
সারাদিন খুনসুটি করে হেসে হেসে
কভু আঁকে লাল ফুল কভু আঁকে ঝড়
কখনো বা আলো দিয়ে আঁকে খেলাঘর
ছোট হাতে ছোট তুলি, আঁচড়ের টানে
পরী খুকু আকাশেতে রামধনু আনে
প্রজাপতি এক ডুবে সাঁতরায় তাতে
দুই ডানা জুড়ে রং মেখে নেয় সাথে
সূয্যি যদি বা রেগে ভুরু কোঁচকায়
পরী হাসে মিঠি হাসি, কপট তাকায়
গোধূলির আলো বলে কাছে আয়, শোন
পরী গায় আশাবরী, বেসুরে আপন
সাঁঝ নামে মা'র ডাকে "ওলো পরী... কই!
পরী বলে "মাগো আমি তোর বুকে রই।"

ছবি - দ্বৈতা গোস্বামী

ছড়া-কবিতা::

ছুটির গন্ধ

শ্যামাচরণ কর্মকার

মেঘের গায়ে ছুটির গন্ধ
খুব খুশি তার মনে
আকাশ নীলে মেলল পাখা
আজ কে বারণ শোনে?

উরুৎ ফুড়ুৎ উড়ল পাখি
উড়িয়ে দিয়ে ডানা
দিক-বিদিকে ছুটির গন্ধ
কে শোনে আজ মানা?

কাশের বনে হিমেল বাতাস
খেয়েই লুটোপাটি
বলল- ও কাশ, ফুল, পাতা, ঘাস
আজ ছুটি ভাই ছুটি।

ছুটির গন্ধে গান ছড়াল
মৌমাছি ফুলবনে
শুনছে সে গান পদ্ম, শালুক
শিউলিরা একমনে।

ছুটির গন্ধ অমনি তখন
পুজোর গন্ধে মেশে
গন্ধ ছড়ায় কুমোরপাড়ায়
দুর্গা ওঠে হেসে।

ছুটির গন্ধে, পুজোর গন্ধে
ভাসল শহর-গাঁ
ছুটি -ছুটি পুজোর ছুটি
মণ্ডপে তে পা।

শব্দ রেল:: আবৃত্তি পাঠের অডিও

শব্দ রেল

আবৃত্তি পাঠের অডিও: রক্তকরবী

ম্যাজিক ল্যাম্পের জন্য রক্তকরবী আবৃত্তির পাঠশালার কিশোর-কিশোরীদের আবৃত্তি পাঠ। শুনতে হলে ক্লিক করো নিচের ভিডিও লিঙ্কে –

https://www.youtube.com/watch?v=dAHzWoml-I0

ছড়ার লড়াইঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য বনাম অমিতাভ প্রামাণিক

সমাধানকর্তা - অরুণাচল দত্ত চৌধুরী

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

সুখী মেয়ের গল্প

একটা খালি ফ্রুটির প্যাকেট কুড়িয়ে নিয়ে
যত্ন করে জল ভরেছি চামচে দিয়ে
মাকে ওরা রোজ রাতে দেয় সাতটা রুটি
যত্ন করে ঠোঙায় ভরে তারই দুটি
সঙ্গে দিয়ে আদর করে বলল, মা রে,
মাইনে পেলে ডিম খাওয়াব শুক্রবারে
আমি তো রোজ ইশকুলে যাই, নামতা জানি
রুটির সাথে ফ্রুটির চুমুক একটুখানি
টিফিনবেলা; খানিক দেব জয়দাদাকে
কাউকে খেতে দেখলে কেমন তাকিয়ে থাকে।
স্কুলের শেষে একটি ছুটে পৌঁছে বাড়ি
ভাত চড়াব (বেজায় ভালো রাঁধতে পারি)
সন্ধেবেলা মা বাড়িতে ফিরলে পরে
দুজন মিলে খাবার খাব আরাম করে
জানলা ভাসা পথের নিয়ন আলোর ধারে
বসিয়ে আমায় মা ঘুমোবে অন্ধকারে
খুলব খাতা পড়বে তাতে কালির আঁচড়
স্কুলের খাতায় লিখছি 'এসে' 'বিদ্যাসাগর'।

অমিতাভ
প্রামাণিক

অসুখী মেয়ের যন্ত্রণা

এই রে! হঠাৎ পেটটা ওঠে গুড়গুড়িয়ে।
'এসে'-র আগেই এনার্জি সব যায় ফুরিয়ে।
এমন কেন? খেলাম যে কী, এমন হবে?
রোজই রুটি খাই, তা থেকে? অসম্ভব এ।
খাইনি ডিমও, হয়ত পাবো শুক্রবারে,
কিন্তু এমন হচ্ছে কেন, শুধাই কারে?
ইস্কুলে রোজ বলছে আগে সাবান দিয়ে
হাত ধুলে কেউ বসবে না সব রোগ বাধিয়ে।
তাও ধুয়েছি খাবার আগে, তাও এ রকম
তোলপাড় এই পেটের ভিতর, ফুরাচ্ছে দম!
ব্যথার কারণ না হয় যদি শুকনো রুটি,
তবে কি সেই কুড়িয়ে পাওয়া সবজে ফ্রুটি?
তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা একটু তরল
ব্যাকটেরিয়ার আস্তানা, তাই এমনি গরল?
ঘুমাচ্ছে মা, ডাকবো? নাকি এমন সাঁঝে
বেরিয়ে গিয়ে চাইবো ওষুধ? পেটব্যথা যে!

দেবজ্যোতি
ভট্টাচার্য

জিদ্দি মেয়ের গল্প

থাকগে না! যাক! পেট ব্যথা তো এমনি কত
হচ্ছে রোজই রাত্রিবেলা মায়ের মত
মা তো কোথায় মুখটি ফুটে সে'সব কথা
কয়না, তবু বুঝতে পারি হচ্ছে ব্যথা
মুখ বেঁকে যায়, তবুও তাতে ফুটিয়ে হাসি
বলবে মাণিক, তোকেই শুধু ভালোবাসি
যেদিনকে তুই বিরাট হবি, মস্ত মেয়ে
যেদিন সবাই উঁচিয়ে মাথা দেখবে চেয়ে
নিজের জোরে খাবার দিবি হাজার মুখে

সেদিন আমার বুকটা কেমন ভরবে সুখে
থাকগে না যাক, পেট ব্যথা তো অমনি কত
থাক হতে থাক দিক না ব্যথা ইচ্ছে যত
বইটা খুলে ডুব দিয়েছি, রাত্রি হল
মাগো আমি বিরাট হব, তাইনা? বলো?

######

ওরে অমিতাভ অ্যান্টনি, ভোলা ময়রার উক্তি মনে পড়ছে রে--
ওরে বাজা বাজা ধাত্তেরেকেটে ধাকেটে তাকেটে
কতাগদিঘেনে ধা---

অমিতাভ প্রামাণিক

ওরে ও ময়রা ভোলা
কেন তোর বুদ্ধি ঘোলা?
পেটব্যথা যার, সে বুঝি সয়েই যাবে?
যেহেতু মায়েও ব্যথা
সয়ে নেয় আঁকড়ে ক্যাঁথা,
মেয়েও করবে তা, আর গাল ভিজাবে?
ওরে ও বিদ্যাসাগর,
ব্যথা বুঝিস না তুই ওর,
এভাবেই চলবে বুঝি তোর এই শো, ঠিক?
আমি নই ঠিক অ্যান্টনি
মাছ কিন্তু জ্যান্ত নি,
যাই দিয়ে আসি ওরে অ্যান্টি-বটিক।
পারিস তো রোখ আমাকে!
কলজে তো ফট তামাকে।
কেটে পড়, আসবো জেনে – ধাঁ!
যেতে যেতে নেশার ঝোঁকে
বলবি যা শেখাই তোকে
– ধাত্তেরেকেটে ধাকেটে তাকেটে কতা গদিঘেনে ধা –

দেবজ্যোতি
ভট্টাচার্য

হার মানলাম। বিজয়ী হও, আনন্দ হোক মেডেল নিয়ে
আমি এখন ব্যস্ত আছি কন্যেটিকে দেখতে গিয়ে
ঝুপড়ি ঘরের অন্ধকারের সকল বাধা ছাপিয়ে গিয়ে
এই বছরে মাধ্যমিকে পাশ করেছে মেডেল নিয়ে
অর্থনীতির, যুক্তিবাদের সকল হিসেব তুচ্ছ করে
দুঃখী মায়ের লক্ষ্মী মেয়ে দেখবি এবার কেমন লড়ে
পেটের ব্যথায় রৌদ্রে জলে বুকের আগুণ ঠিকই জ্বলে
ঠোঁটদুটোকে শক্ত করে পাঁচ আখরের মন্ত্র বলে
"জিতব আমি।" তারই জোরে সকল বাধা তুচ্ছ করে
মাটির বুকে পা রেখে সে বিশাল আকাশ শাসণ করে
দুঃখী মায়ের সোনার মেয়ে দু চোখ ভরে দেখব তাকে
মেডেলটা তোর দান করে দিস ছোট্টো আমার লক্ষ্মী মা'কে।

অমিতাভ
প্রামাণিক

সবে তো এখন কলির সন্ধ্যে এখনই বৎস পালাস কোথা?
মেয়ের মেডেল, এই আনন্দে বুদ্ধি তোর কি হচ্ছে ভোঁতা?
বাচ্চা মেয়েটা কেমন ট্রিকসে কী করে হঠাৎই হলো রে ডাগর?
পাশ করে গেল মাধ্যমিক সে লিখতে লিখতে 'বিদ্যাসাগর'!
বয়েই গিয়েছে এভাবে জিততে! যুদ্ধ না হলে ফেরত পদক।
আছি, কবে নেই! এই অনিত্যে মেডেল ফেডেল শুধুই তোর হোক।
তবু বলি, শুধু সুড়সুড়ি দিয়ে লেলিয়ে দিবি না মেয়েকে অমন।
বমি-পেটব্যথা বসলে বাধিয়ে ওষুধটা দিবি কমাতে বমন।
তোর মা আমারও মাতৃসমা সে কেন সে কুড়াবে প্যাকেট, ফ্রুটির?
বেড়ে ওঠ্, বাছা, সন্ধি-সমাসে, আলো করে থাক পর্ণকুটির।

দেবজ্যোতি
ভট্টাচার্য

এমন মা'বাপ আছেন অনেক পড়োনি খবর কাগজে?
পেটে ভাত নেই, শিরে ছাত নেই, শুধু ঘিলু আছে মগজে
সেই ছেলেমেয়ে জয়েন্টে ফার্স্ট দুঃখী মায়ের ছেলে
সত্যি বলছি ধন্য হতাম অমন ছাত্র পেলে।

দেখি আর ভাবি সাফল্যচাবি লুকিয়ে থাকেনা ব্যাংকে
বুকের ভেতর থাকলে আগুন জিতবে জীবন অংকে
শুধু একটাই ভয় থাকে প্রাণে শেকড়কে সে কি ভুলবে?
উঁচু থেকে আরো উঁচু হতে হতে আকাশেই মাথা তুলবে
পায়ের মাটিটা ভুলে যায় যদি লাভ কী তেমন ছাত্রে
সে হবে কেবল জল ঢেলে যাওয়া ভাঙা বাসনের পাত্রে
সেই মেয়েটার মায়ের স্বপ্ন সবার দুঃখে কাঁদবে
মেয়েখানা তার, ভালোবাসবার বাঁধনে দুনিয়া বাঁধবে
তেমন মেয়ের তেমন ছেলের দেখো সন্ধান করে
ছোটো থেকে যারা বড়ো হয়ে গিয়ে ছোটোদের বড়ো করে

অমিতাভ প্রামাণিক

এতই যদি জানিস বাছা,
পুচ্ছটি তোর উচ্চে নাচা।
লুটিয়ে কেন পড়ছে কাছা ভুঁয়ে?
রাখিস লিখে কাগজ-পাতায়
লক্ষ টাকা ঢুকলে মাথায়,
স্বপ্ন দেখিস ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে।
ছাত্র কি আর অমনি মেলে?
কিম্বা বিকোয় চৈত্র সেলে?
বাজার-হাটে, স্টার হোটেলে থাকে?
পায় সে খেতে যা তার খাবার?
পয়সা আছে তার মা-বাবার?
এ প্রশ্নটা করবো আবার কাকে?
বুদ্ধি কিছু থাকলে ঘটে
দেখতি সকল শিশুই বটে
সৃষ্টিমুখর, ও সঙ্কটে হিরো।
সে ঠিক জানে কোথায় কখন
করলে অ্যাটাক খেল সমাপন।
শত্রুকে বধ করবে এমন বীর ও।
তুই যদিও পেলি না থৈ
কোথায় দুধ আর ভ দই,
জানি তুই তো ওদের মতই ছানা।

তোরও হউক বুদ্ধি অঢেল,
মাধ্যমিকে করিস না ফেল!
যত্ন করে রাখিস মেডেল খানা।

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

"পায় সে খেতে যা তার খাবার?"
জানতে চাইছ কোথায় আবার?
জবাবখানা বলতে বলবি কাকে?
জালপথের এই খেলার ঘরে
লাভ নেই সেই প্রশ্ন করে
করতে হবে সেই মেয়েটার মা'কে।
অফিস, বাড়ি, চিকেন কারি
নতুন শাড়ি গয়না গাড়ি
তোর বা আমার, সবার জীবন জোড়া
ওরই মাঝে সময় করে
আসিস নেমে পথের পরে
তাকিয়ে দেখিস কেমন আছে ওরা।
দেখবি যখন রুক্ষ চুলে
তেল পড়েনি, উঠছে দুলে
পিঠের পরে মলিন স্কুলের থলে
দাঁড়িয়ে পাশে আদর করে
জিগেস করিস সোহাগভরে
"খেয়েছিস মা? বল দেখি মন খুলে?"

অমিতাভ প্রামাণিক

এই তো পথে এলি ত্যাজিয়া জলকেলি এই তো বুঝে গেলি আসল পথ।
তবুও বলি তোরে সোহাগে, করজোড়ে, শুধু জিগেস করে চলে কি রথ?
চলে না যার, তাকে যদি পথের বাঁকে শুধাস, "তোর নাকে গন্ধ পাস?"
হ্যাঁ, না, সে যাই বলে, ভাষার গ্যাঁড়াকলে জেনে নে তার তলে কী উচ্ছ্বাস।
ওদের কোলে তুলে পুস্প দিলে চুলে থাকে কদিন ভুলে, ফের তো সেই
ট্রাফিক সিগনালে দেখেছি শীতকালে বিড়ি ফোঁকে আড়ালে প্রত্যেকেই।

ওদের হাতে খাতা বই শেলেট ছাতা ওদের গায়ে কাঁথা জুটছে কই?
এত যে কোলাহল হচ্ছে, কেন বল, দাদা-দিদির দল উড়ায় খই?
যাক, এসব ছেড়ে চল না খুঁটি গেড়ে জুটিয়ে কিছু ধেড়ে খোকা রঙিন,
বসি ওদের মাঝে রোজ সকাল সাঁঝে। কিছু তো ভালো কাজে কাটাই দিন।
মাথায় দিয়ে পিলো কে যেন বলেছিল, না দিতে একতিলও ভিক্ষা, ঠিক?
চ’ ঢালি পাতে তার ডাল ও সম্বার হিঁদুস্তানি আর কর্ণাটিক।

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

বেজায় ভালো ভাই আমিও তাই চাই চলো না মাঝে মাঝে বসুক ক্যাম্প
স্বপ্ন ফিরি করি, চলোনা খুঁজে ফিরি আঁধারে ঢেকে থাকা লিটল চ্যাম্প
বিদ্যা, টাকা, রুটি সবাই দিলে দুটি মুছবে কিছু মুখে দুখের স্ট্যাম্প
তাদের ভালোবেসে দাঁড়িয়ে পাশে এসে উঠবে জ্বলে কীগো ম্যাজিক ল্যাম্প?

অমিতাভ প্রামাণিক

আহা, বেশ বেশ বেশ।
বাহা বেশ তো!
বাহা বেশ তো ছেলে লম্পো জ্বেলে করবে দেশোদ্ধার
ক্যাম্প বসিয়ে চ্যাম্প নাচিয়ে হল্লা হাজারবার
যেমন সবাই করে
যেমন সবাই করে বিপুল জ্বরে রাতদিন হাঁসফাঁস
তুইও ছোঁড়া বদের গোড়া ছিঁড়তে এলি ঘাস
বলি হচ্ছেটা কী?
বলি হচ্ছেটা কী, ছাগল নাকি? দিলেই কাঁঠালপাতা
খাটাল ফেলে ব্যাটাচ্ছেলে ছুটবে নিয়ে খাতা?
অত সস্তা হলে
অত সস্তা হলে ভূমন্ডলে থাকতো শুধু সাধু
বমন করে কমন্ডলুর জল ছেটাতো দাদু
তা তো হচ্ছে না রে
তা তো হচ্ছে না রে তিস্তাপারে ঝুলেই আছে ধোঁয়া
ভুলেই থাকি, শুলেই দেখি ঢেকুর ওঠে চোঁয়া
বুঝি বদহজমে

বুঝি বদহজমে আসছে কমে আয়ু ইহকালের
বাঁধবে কে ভাই বলতো গলায় ঘন্টাটা বেড়ালের?
আছি তুই আর আমি
আছি তুই আর আমি, এ পাগলামি চল ছেড়ে যাই সেথা
এ সব বড়াই কবির লড়াই শুধুই আদিখ্যেতা
ছাড়্ তো হারা এবং জেতা
এর তো নেই ক্রেতা-বিক্রেতা।

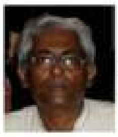
অরুণাচল দত্ত চৌধুরী

রিভিউ ও সমাধান – অরুণাচল দত্ত চৌধুরী

সুখী মেয়ের গল্প

"ফ্রুটির প্যাকেট কুড়িয়ে" শুরুর গল্পটাতে
ঝাপসা কিছু অশ্রুকণা আসন পাতে
একটা মেয়ের বাড়তে থাকার গল্পকথা
সেই মেয়েটার অবাক লড়াই অভিজ্ঞতা
সত্যি এ'টাও, হয়নি সে খুন ভ্রূণবেলাতে
তার মা তাকে বিশ্বমেলায় চায় মেলাতে।
মা'ও খাটে খুব। এ'গল্পে নেই নাটক টিভি।
মা আর মেয়ে, খুব ভীতুদের সাহস দিবি?
চাইছি সবাই তুই মেয়েটি বাড়বি ডাগর
রচনা নয়, নিজেই হবি বিদ্যাসাগর।

অসুখী মেয়ের যন্ত্রণা

"অসুখী এক মেয়ের" গল্প একটু জোলো
রাগ কোরো না,আমার সে'টাই মনে হল।
প্রায় অযথা লড়াই করার উৎসাহতে
একটু বোধহয় গড়িয়ে গেল অন্য স্রোতে।
তা'সত্ত্বেও এ"গল্পটা তেমন কিছু ফেলনা নয়।
স্বাস্থ্য কথাও সত্যি বললে জানতে হয়।

চাই সে মেয়ে হোক এ'কবির বাধ্য গো
আমরাও সব খাবার আগে হাত ধোবো।

 # জিদ্দি মেয়ের গল্প

হার না মানা "জিদ্দি মেয়ের গল্প" বুকে
এ'বার মেয়ে সাজছে জেদের তির ধনুকে।
মায়ের ইচ্ছেডানায় এখন ভর দিয়ে সে
যাবেই উড়ে অবাক কোনও স্বপ্নদেশে।
দেখছে পাখির চোখ সে শুধুই, নয় অন্যথা।
তুচ্ছ অভাব, হার মেনে যায় তুচ্ছ ব্যথা।
বাধ্য হয়ে ভাবব সবাই তুই যা ভাবাস।
আমরা মেয়ের সাহস দেখে দিচ্ছি সাবাস!

 # এ' লড়াই কচ্ছ খোলা

কে এলেন? ময়রা ভোলা
সেই পুরনো কবিগানের সচিৎকার ফ্লেভার
তা'তেও পজিটিভই
কবিকে সাবাস দিবি
স্বাস্থ্যকথা ফের উঠেছে... অ্যান্টি-তামাক এ'বার।
নাই হলাম মন্ত্রমুগ্ধ
তামাক ফেলে খাচ্ছি দুগ্ধ
ছন্দের এই যে লড়াই কিঞ্চিৎ নিম্নগামী
যে'টুকু লড়াই বাকি
এমনই চলবে নাকি
এ'ভাবেই চললে লড়াই, মানে মানে কাটব আমি

আবার আকাশে চোখ তুলে চায় একটি সরল বৃক্ষ
হত দরিদ্র শাখা প্রশাখায় যে ছোঁবে অন্তরীক্ষ
যেহেতু গাছটি চেনে দুঃখকে, সে চাইছে তাকে দেখে
সূর্যশিকারি হোক দুঃখীরা, যত আছে প্রত্যেকে।

আমরা সত্যি হয়েছি অবাক তার এই সঙ্কল্পে
কবিকে বলেছি সাহস যোগাও, মন ভরছে না অল্পে।

জানতে চাই না বেশি
কে ঘিলু, কেই বা পেশী
হোক এই রেষারেষির যতি
মেঘ থাক কিম্বা রোদই
বন্ধু সবাই যদি
দাঁড় বাই... পেরোই নদী। ক্ষতি?

খাবার? সে তো অঢেল ঢালা
দুঃখীজনের অবোধ থালা
পায় না তাকে, এ'টা ক'জন বোঝে
বুঝল যারা সেই ক'জনই
গুপ্ত ভালোবাসার খনি
মলিন মেয়ে তাই তো তাদের খোঁজে
কাবলিওলা যেমন হেসে
শুধিয়েছিল করুণ হেসে
"খোঁকি, কী চাই, আঙুর নাকি মেওয়া?
খোঁজ পেলে সেই ভালোবাসার
অবাক ঝুলি হবেই উজাড়
"বাবা" "মেয়ে"র নীরব দেওয়া নেওয়া

করবে বিদ্রুপ, থাকবে নিশ্চুপ। সমাজ এইরূপ সবখানে।
হয়ো না দেবদূত প্রাণের বিদ্যুৎ ছড়াও অচ্ছুত সব প্রাণে।
আলোর পথরেখা বানাও একা একা পথেই হবে দেখা। তাই রীতি।
ভাষণ বিস্ফোট থামাও একজোট চুলোয় যাক ভোট রাজনীতি।

 # ফল ঘোষণা

এইবারে সমাধান। বলব রেজাল্টখান কেউ যেন করিস না রাগ গো
এই ফল ঠিকঠাক করে নিস পরিপাক মেনে নিস যার যার ভাগ্য

ছন্দে প্রসাদগুণে দিব্য লেগেছে শুনে দু'জনেরই আছে বহু রেস্ত।
দেবজ্যোতি এক চুল এগিয়ে, তা' নয় ভুল। অমিতাভ? সে লড়েছে বেশ তো।

ছবিঃ তন্ময় বিশ্বাস

বিজ্ঞান::

টরেটক্কার অজানা ইতিহাস

বিমান নাথ

আজকাল মোবাইল ফোন আর ইন্টারনেটের দৌলতে আমরা প্রায় ভুলেই গেছি যে এক সময় পৃথিবীতে টেলিগ্রাফ বলে যোগাযোগের একটা উপায় ছিল। এক সময় কোথাও তাড়াতাড়ি খবর পাঠানোর দরকার থাকলে টেলিগ্রাফ অফিসে ছুটে যেত লোকজন। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই সংকেত পাঠানো হত তার টরেটক্কার মত আওয়াজ শুনে সাধারণ লোকজন অবাক হত এই দুটো শব্দ দিয়ে কীভাবে সব খবর চালান হচ্ছে। খবরের একটা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বয়ান তৈরী করার মধ্যেও কৌশল ছিল। এখনও কেউ কোনও কথা অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত করে বললে আমরা মজা করে বলি 'টেলিগ্রাফিক ভাষা'-য় বলছে।

আজকালকার মত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে নয়, নিছক একটা বৈদ্যুতিক তার-এর মধ্য দিয়ে টেলিগ্রাফ-এর খবর পাঠানো হতো দেশের এক দিক থেকে অন্য দিকে, এমন কি অন্য দেশেও। তার জন্য একটা ভাষাও তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু ইলেকট্রিক তারের মধ্য দিয়ে শুধু দু'ধরণের সংকেত পাঠানো যেতে পারে: কম সময়ের অথবা বেশি সময় ধরে চলা বিদ্যুৎ প্রবাহ। ইংরেজী বর্ণমালার প্রত্যেকটিকে এই হ্রস্ব-দীর্ঘ সময়ের প্রবাহ দিয়ে বোঝানোর ব্যবস্থা ছিল। যেমন V অক্ষরটাকে তিনটি হ্রস্ব এবং তারপর একটি দীর্ঘ সময়ের সংকেত দিয়ে বোঝানো হত। এই সংকেত বানিয়েছিলেন অ্যামেরিকার স্যামুয়েল মর্স, ১৮৩৮ সাল নাগাদ।

মজার কথা হল এই মর্স কোড্-এর একটা ভারতীয় সংস্করণ কিছুদিনের জন্য চালু ছিল। সেই সংকেতের কথা শুনলে রীতিমত আঁতকে উঠতে হয়। আক্ষরিক অর্থেই মনে হয়ে ইলেকট্রিক শক্ লেগেছে যেন। কারণ টরেটক্কার আওয়াজের বদলে এই সংকেতে কম আর বেশি সময়ের শক্ লাগত হাতে, আর তাই দিয়েই খবর চালাচালি হত!

গল্পটা প্রথম থেকেই বলি। কাহিনির নায়ক এক তরুন আইরিশ, যিনি ১৮২৯ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিদ্যার পাঠ শেষ করে ভাগ্যান্বেষণে ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন। নাম উইলিয়াম ব্রুক ও'শাখ্নেসি (William Brooke O'Shaughnessy)। এখানে আসার পর বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেনের পদে নিযুক্ত হলেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, তখনকার হিন্দু কলেজে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপকের পদেও যোগ দেন তিনি।

তখনকার দিনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশগুলো এতো দ্বিধাবিভক্ত ছিল না। পদার্থবিদ আর রসায়নবিদের মধ্যে এটো পার্থক্য ছিল না। আর বিজ্ঞানী বলতেও সে রকম কোনও পেশা ছিল না। এখনকার গবেষণা সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের মত তখনকার দিনের শখের বিজ্ঞানীরা পেটেন্ট জোগাড় করা বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটতেন না। আর ভারতে ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা অবসর সময়ে বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। সিপাহী বিদ্রোহের আগে তাঁদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাঁরা ভারতীয়দের মধ্যে কাউকে দক্ষ খুঁজে পেলে তাঁকে উঁচু পদে বহাল করতে অপারগ ছিলেন না। এদের মধ্যে একজন ছিলেন উইলিয়াম ও'শাখ্নেসি।

প্রথমে তিনি গাঁজা-র ভেষজ গুণ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, এবং এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। গাঁজার উপযোগিতা নিয়ে এই প্রথম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জগতে কেউ কাজ করেছিল। তিনি নানান ছোটখাটো জন্তুর ওপর প্রয়োগ করে, বিভিন্ন রোগীর পথ্য হিসেবেও দেখিয়ে ছিলেন যে গাঁজা ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে রোগের উপশম হয়েছে, যেমন বাতের ব্যথা।

তার পর ১৮৩৯ সালে এক সময় বিভিন্ন অ্যাসিড দিয়ে ব্যাটারি তৈরী করার পর তিনি বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। এর দুই বছর আগে ইংল্যাণ্ডে চার্লস্ হুইট্স্টোন্ এবং উইলিয়াম কুক্ এই দুজন মিলে দূর-দূরান্তে বিদ্যুৎ প্রবাহের সঞ্চালন নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁরাই টেলিগ্রাফ-এর সত্যিকারের আবিস্কর্তা। তাঁরা একটা পেটেন্টও করিয়ে নিয়েছিলেন। এর এক বছর পর অ্যামেরিকায় স্যামুয়েল মর্স টেলিগ্রাফ পদ্ধতি কীভাবে আরও কার্যকরী করা যায় এই নিয়ে গবেষণা করেন।

এই সব খবর হয়তো ও'শাখ্‌নেসি-সাহেবের কানে এসেছিল। প্রথমে তিনি সাড়ে তেরো মাইল লম্বা একটা তার-এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে কাজ শুরু করেন। কিন্তু তার পরেই তিনি টেলিগ্রাফ নিয়ে গবেষণাকে একটা একেবারে অন্য স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল হুগলী নদীর ওপর দিয়ে তার নিয়ে গিয়ে এপার থেকে ওপারে টেলিগ্রাফ পদ্ধতিতে খবর পাঠাবেন। কিন্তু হুগলী নদীর ওপর জাহাজ আসাযাওয়া করতো, তাই তার ওপর দিয়ে এরকম তার খাটানো সম্ভব ছিল না।

তখন তিনি একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি ভাবলেন নদীর জলকেই একটা তার-এর মত ব্যবহার করে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুত প্রবাহ পাঠানোর চেষ্টা করবেন। বিশপ কলেজের ঘাট-এর কাছে ইলেকট্রিক তারের একটা অংশ ডুবিয়ে দিয়ে, তার প্রায় ১.৮ মাইল দূরে স্যর জন রয়েড্ সাহেবের বাড়ির বাগানে আরেকটা তার ডুবিয়ে সেই প্রবাহ মাপার চেষ্টা করলেন। কি আশ্চর্য, একদিক থেকে পাঠানো বিদ্যুত প্রবাহ মাঝখানের এতোটা দূরত্ব কোনও তার ছাড়াই অতিক্রম করে চলে এলো। তাঁর নিজের ভাষায় [1]: ... it made no perceptible difference whether the tide was ebbing or flowing; in several trials even the damp mud conveyed the signal unaltered in force or character. এর পর তিনি দূরত্বটা বাড়িয়ে প্রায় আড়াই মাইল পর্যন্ত টেলিগ্রাফের খবর জলের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে এমন একটা পরীক্ষার কথা তাঁর আগে কেউ ভাবে নি। স্যামুয়েল মর্স ১৮৪২ সালে এমন একটি পরীক্ষা করেছিলেন বটে, ওয়াশিংটন ডি সি শহরের পোটোম্যাক খালের জল দিয়ে, কিন্তু সেটা ছিল হুগলী নদীর ওপর ও'শাখনেসি সাহেবের পরীক্ষার প্রায় তিন বছর পর। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে হুগলী নদীর জলে বিদ্যুত প্রবাহ পাঠানোর পরীক্ষাই বোধহয় 'বেতার'-এ খবর পাঠানোর প্রথম প্রচেষ্টা।

এই পরীক্ষার পর ও'শাখনেসি আরেকটা পরীক্ষা করলেন, সেটাও ছিল পৃথিবীতে প্রথম। তিনি ভাবলেন যদি নদীর জলের তলা দিয়ে একটা তারকে এপার-ওপার করা যায়, তাহলে কেমন হয়? প্রথমে একটা ইলেকট্রিকের তারকে কাপড় দিয়ে ঢেকে আলকাতরা দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন যাতে তারটা জলের সংস্পর্শে না আসে। তারপর পুরো জিনিসটাকে একটা বেতের

[1] Memoir of Surgeon-Major Sir William O'Shaughnessy Brooke: In connection with the early history of telegraph in India (1889)

খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে, নদীর জলের তলা দিয়ে এক দিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এর প্রায় সাত বছর পর, ১৮৪৬ সালে স্যামুয়েল কোল্ট (যিনি রিভলবার পিস্তল আবিস্কার করেছিলেন) নিউ ইয়র্ক শহরের ম্যানহাটান এবং ব্রুকলিনের মধ্যে জলের তলা দিয়ে তার টেনে নিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। তারও পাঁচ বছর পর অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের তলায় প্রথম টেলিগ্রাফের তার বসানো হয়। এই underwater cabling-এর প্রথম প্রয়োগ কিন্তু কলকাতায় হয়েছিল।

ও'শাখনেসি সাহেবের এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবর পেয়ে তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ডালহাউসি এর উপযোগিতা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে দিল্লী-বোম্বে আর কলকাতার মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন চালু করার নির্দেশ দিলেন। এই কাজে ও'শাখনেসির ডান হাতের লোক ছিলেন শিবচন্দ্র নন্দী নামের এক বাঙালী। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। প্রতি পদে তাঁদেরকে নতুন পন্থার কথা ভাবতে হয়েছিল, কারণ যেসব পদ্ধতি মর্স সাহেব বা ইংল্যাণ্ডের হুইটস্টোন-কুক্ অনুসরণ করেছিলেন, বা যে সব উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন, সে সব জিনিস ভারতে পাওয়া যেত না, বা সহজলভ্য ছিল না। ও'শাখনেসি-র তখন এক মাত্র চিন্তা ছিল কী ভাবে টেলিগ্রাফ পদ্ধতিকে ভারতের আবহাওয়া, পরিবেশ ইত্যাদির উপযোগী করে তোলা যায়। তাই এক এক সময় এমন পদ্ধতি ব্যবহার করতেন যা তাঁর সমসাময়িকদের কাছে প্রথমে হাস্যকর মনে হয়েছিল। যেমন তিনি মাঝেমাঝে তার-এর বদলে লোহার রড্ ব্যবহার করতেন।

সেই সময়কার Scientific American-এর একটা প্রতিবেদন থেকে এই কর্মযজ্ঞের একটা আভাস পাওয়া যায় [2] : ...the thickness of the wire allows of their being placed on the post, Without any occasion for the straining and winding apparatus, whereas the tension of wires exposes them to fracture, occasions expense in construction, and much difficulty in repairs; the thick rods also admit of rusting to take place, without danger, to an extent which would be fatal to a wire. On several occasions, one village forge, carried by two coolies, has been found sufficient for welding a mile of rods in a working day. The rods, moreover, are not likely to be injured by crows or monkeys. Swarms of kites and crows perch on the lines through the swamps but they cause no harm; the correspondence flies through their claws without interruption, though on one occasion a flash of lightning struck the wet rod, and killed some scores of them. The importance of this discovery of the superiority of rods over wire will be fully appreciated in a country like India, where the line must often run through a howling wilderness, tenanted by savage beasts, or more savage men.

সংকেত পাঠানোর ব্যাপারেও ও'শাখনেসি-র মাথায় একটা অদ্ভুত আইডিয়া ছিল। মর্স কোডের হ্রস্ব-দীর্ঘ সংকেতের মত তিনিও একটা কোডের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহকে শব্দে বা আওয়াজে রূপান্তরিত করার মত যন্ত্র ছিল না। যেমন ছিল মর্স সাহেবের

[2] A new kind of telegraph lines?, Scientific American, Nov 27 1852

পদ্ধতিতে, আর যার ফলে ঐ 'টরে টক্কা' আওয়াজ দিয়ে খবর পাঠানো যেত। তাঁর পদ্ধতিতে তার-এর মধ্য দিয়ে যে বিদ্যুত প্রবাহ পাঠানো হচ্ছে, সেটার 'শক্' খেয়ে বুঝতে হত প্রবাহটা হ্রস্ব না দীর্ঘ। তিনি অবশ্য একে 'শক' না বলে বলতেন 'strong, but not disagreeable sensations' ।

অবশ্য কয়েক বছর পরে এই পদ্ধতি বদলে মর্স কোড্ ব্যবহার করা শুরু হয়। ততদিনে ও'শাখনেসি সাহেব দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ডালহাউসির চেষ্টায় তিনি স্যর উপাধি পান। কিন্তু ডালহাউসি চলে যাওয়ার পর, সিপাহী বিদ্রোহের পর যে অফিসারের দল ভারতে এসেছিলেন তাঁরা এমন একজন খামখেয়ালী অফিসার-বিজ্ঞানীকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করেন। বরং তার কাজের বিরূপ সমালোচনা করা হত।

এক সময় সবার অগোচরে এই বিজ্ঞান সাধক যখন মারা গেলেন, তখন কেউ তাঁর খবর রাখে নি। এখনও তাঁর অবদানের কথা, কলকাতায় বসে তিনি যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, সেই সব কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি।

বিজ্ঞান::

ওল গাছে ফুল এবং একটি হুজুগ

সৌম্যকান্তি জানা

সকাল সকাল পয়লা মে-র খবরের কাগজ খুলতেই চক্ষু ছানাবড়া। কাটোয়ার খাজুরডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মন্ডলহাট ঘোষপাড়ায় জনৈক নাড়ু পালের বাড়ির পাশে ঝোপের মধ্যে ওল গাছে গজিয়েছে ফুল, আর তা নিয়ে এলাকায় পড়ে গেছে হৈচৈ। শুরু হয়ে গেছে পুজো-পাঠ। জমে গেছে মেলা। মিলছে অঢেল দর্শনী।

চোখ কচলে খবরটা বার দুয়েক পড়লাম। ওল গাছে প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা বেগুনি রঙের একটা ফুল গজিয়েছে। ফুলের আকার অনেকটা শিবলিঙ্গের মতো। সুতরাং এলাকার মঙ্গল অনিবার্য। এলাকার এক পুরোহিতের পরামর্শে নাকি শুরু হয়েছে পুজো। আবার নিন্দুকেরও যে অভাব নেই তাও মালুম হল ওই সংবাদ পড়েই। যেহেতু নীল হল বিষের রঙ, তাই গোটা তল্লাটে নাকি এবার বিষ ছড়াবে। তবে নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে 'অলৌকিক' এই ঘটনা নিয়ে জমজমিয়ে চলছে পুজো ও মেলা।

খবরটা পড়ে আমার রাগ কিংবা হতাশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হলাম না। যে দেশে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চে বলা হয় গণেশের মাথায় হাতির মাথা জুড়ে দেওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে ভারতে প্লাস্টিক সার্জারির উদ্ভব হয়েছিল, ভারতেই পীথাগোরাসের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে, বৈদিক যুগে নাকি ভারতেই বিমান আবিষ্কৃত হয় যাতে চেপে ভারতীয়রা গ্রহান্তরে পাড়ি দিত এবং মঙ্গল গ্রহে গিয়ে যুদ্ধ করত, সে দেশে ওলের ফুলকে শিবলিঙ্গ-জ্ঞানে পুজো করা এমন কী আর আজব ঘটনা!

আসল ব্যাপার হল ওল গাছে ফুল আসার ঘটনা আদৌ আজব বা অলৌকিক ঘটনা নয়। খবরে যা ফুল বলা হয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞানে তা অবশ্য ফুল নয়, পুষ্পমঞ্জরী (Inflorescence)। ওল পরিবারে (Family)-র বৈশিষ্ট্যই হল স্প্যাডিক্স (Spadix) জাতীয় পুষ্পমঞ্জরী। এক্ষেত্রে মঞ্জরীদন্ড হয় বেশ মোটা ও রসালো এবং এর উপর খুব ঘন সন্নিবদ্ধভাবে ফোটে বৃন্তহীন অসংখ্য ফুল। নিচের দিকে ফোটে স্ত্রী ফুল, মাঝে থাকে পুরুষ ফুল। আর উপরে থাকে অসংখ্য বন্ধ্যা ফুল। গোটা পুষ্পমঞ্জরী ঢাকা থাকে স্পেদ (Spathe) নামক একপ্রকার আবরণ দিয়ে। কুঁড়ি অবস্থায় পুরো পুষ্পমঞ্জরী স্পেদ দিয়ে ঢাকা থাকে। আর ফোটার সময় স্পেদ খুলে যায়। তখন সমগ্র পুষ্পমঞ্জরী বাইরে বেরিয়ে আসে ও স্পষ্ট দেখা যায়। খোলা স্পেদ দেখতে লাগে ঠিক ঘন্টার মতো। স্পেদ সাধারণত রঙ্গিণ হয়। ওলের ক্ষেত্রে বেগুনি, খয়েরি বা হালকা সবুজ রঙের হয়। আবার হলুদ রঙের হয় কচুর ক্ষেত্রে। স্পেদের ভেতর দিকে থাকে বিশেষ খাঁজ বা গুটি যা পতঙ্গ ফাঁদ হিসেবে কাজ করে।

ওলের ক্ষেত্রে স্প্যাডিক্স পুষ্পমঞ্জরী বেশ বড়ো হয়। স্পেদ খুলে যাওয়ার পর স্প্যাডিক্সকে দেখতে লাগে ঠিক যেন শিবলিঙ্গ। বোধহয় এই কারণেই ওলের গণ (Genus) হল Amorphophallus, গ্রিক শব্দে যার অর্থ আকারবিহীন পুরুষাঙ্গ। আমাদের পরিচিত যে ওল আমরা খাই তার বিজ্ঞানসম্মত নাম Amorphophallus paeoniifolius (A. campanulatus). আবার ওলেরই এক জাতভাইয়ের পুষ্পমঞ্জরী বিশ্বের দীর্ঘতম শাখাবিহীন পুষ্পমঞ্জরী। তার নাম Amorphophallus titanium. লম্বা হয় ৩ মিটার বা তারও বেশি। ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম সুমাত্রা অঞ্চলে বর্ষা অরণ্যের মধ্যে স্বাভাবিক উদ্ভিদ হিসেবে এই ওল দেখা যায়।

ওলের যে অংশ আমরা খাই তা আসলে মাটির নিচে থাকে কান্ড। খাদ্য সঞ্চয় করে তা পুষ্ট ও গোলগাল হয়। উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষায় এইরকম কান্ডকে বলে গুঁড়িকন্দ (Corm)। মাটির উপরেও থাকে কান্ডের কিছুটা বায়বীয় অংশ যা সাধারণ কান্ডের মতোই। তার উপর জন্মায় পাতা। সব মিলিয়ে মাটির উপরের অংশ দেখতে অনেকটা ছাতার মতো। ওল বর্ষজীবী উদ্ভিদ। গাছ জন্মাবার ৮/৯ মাস পরেই মাটির উপরের কান্ড ও পাতা হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়। এর পর খাওয়ার জন্য মাটি খুঁড়ে ওল অর্থাৎ গুঁড়িকন্দ বের করা হয়। যদি না মাটি খুঁড়ে ওল তোলা হয় তবে পরের বছর ঐ কন্দ থেকে আবার বায়বীয় কান্ড ও পাতা গজায়। তবে প্রজাতিভেদে ওল গাছে ফুল আসে এক থেকে তিন বছর অন্তর। চাষ করা ওল যেহেতু লাগানোর ৮/৯ মাস পর খোঁড়া হয়ে যায় তাই ফুল জন্মাবার সুযোগ থাকে না। তাই আমরা ওলের ফুলের সাথে পরিচিত নই। কিন্তু বন্য ওল থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই ফুল জন্মায়। তবে ফুল বলতে যা বুঝি তা হল ওই পুষ্পমঞ্জরী।

ওল হল সহবাসী উদ্ভিদ, অর্থাৎ ওল গাছের পুষ্পমঞ্জরীতে আলাদা আলাদাভাবে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফোটে। তবে এই ফুল খুব ছোটো আর বৃতি ও দলমন্ডলবিহীন। স্ত্রী ফুল বলতে আছে শুধু গর্ভপত্র, আর পুরুষ ফুল বলতে শুধু পুংকেশর। পুষ্পমঞ্জরীর একেবারে নিচে কিছুটা জায়গা জুড়ে থাকে স্ত্রী ফুল। তার উপরে কিছুটা জায়গা জুড়ে পুরুষ ফুল। তারপর আগা পর্যন্ত অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে বন্ধ্যা ফুল। এই ফুলে থাকে কেবল বন্ধ্যা পুংকেশর। এই অংশকে বলে অ্যাপেন্ডিক্স।

ওল গাছে একই পুষ্পমঞ্জরীতে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল জন্মালেও সচরাচর নিষেক সফল হয় না। কারণ মূলতঃ স্ত্রী ফুলের অগ্রিম প্রস্ফুটন। পুরুষ ফুল যখন ফোটে তখন স্ত্রী ফুলের আর নিষিক্ত হওয়ার ক্ষমতা থাকে না। আর তাছাড়া স্পেদ প্রস্ফুটিত হয় দেরিতে। ফলে কীটপতঙ্গরা সফল পরাগমিলন ঘটানোর সুযোগ পায় না। এই সব কারনেই চাষ করা ওলে ফুল ফুটলেও বীজ হয় না। তবে বন্য ওলে ফুল ও বীজ দুটোই হতে দেখা যায়।

ওল গাছে পরাগযোগের বাহক হল পোকামাকড়। অধিকাংশ ওলের পুষ্পমঞ্জরীর গন্ধ পচা মাংসের মত। স্পেদ খুলে গেলে পচা মাংসের গন্ধে মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড় উড়ে আসে। কিন্তু তারা আটকা পড়ে স্পেদের ভেতরে থাকা বিশেষ একধরনের ফাঁদে। স্পেদ খোলার আগেই স্ত্রী ফুলের প্রস্ফুটন হয় ও তার সক্ষমতা থাকে। কিন্তু পোকারা ধরা পড়ার পর পুরুষ ফুল ফোটে। পুরুষ ফুলের পরাগধানী থেকে প্রচুর পরাগরেণু আটকে থাকা পোকাদের গায়ের উপর ঝরে পড়ে। পরাগরেণু মাখা যেসব পোকা স্পেদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তারা যখন অন্য সদ্য ফোটা পুষ্পমঞ্জরীর স্পেদের মধ্যে প্রবেশ করে তখন আগের ফুলের পরাগরেণু দিয়ে ওই পুষ্পমঞ্জরীর স্ত্রী ফুলকে নিষিক্ত করে। এভাবেই ওল সহবাসী উদ্ভিদ হওয়া সত্ত্বেও স্বনিষেক প্রতিহত করে ইতর নিষেক ঘটায়।

ওল গাছে ফুল আসার ঘটনা আরও অসংখ্য গাছে ফুল আসার মতোই খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এতে কোনও অস্বাভাবিকতা বা অলৌকিকতা নেই। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে স্বাভাবিক ঘটনাকে অলৌকিকতার তকমা লাগায় কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ। সেই সুযোগসন্ধানীদের দলে খাজুরডিহির কিছু মানুষ যেমন রয়েছে, রয়েছে দেশের তাবড় তাবড় নেতা-মন্ত্রীও। বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ নাহলে সামাজিক এই আঁধার কাটবে না। এজন্য চাই যথার্থ শিক্ষা। যথার্থ শিক্ষাই পারে এইসব অলৌকিকতার কারবারীদের কোণঠাসা করতে।

ছবিঃ আন্তর্জাল

বিজ্ঞান::

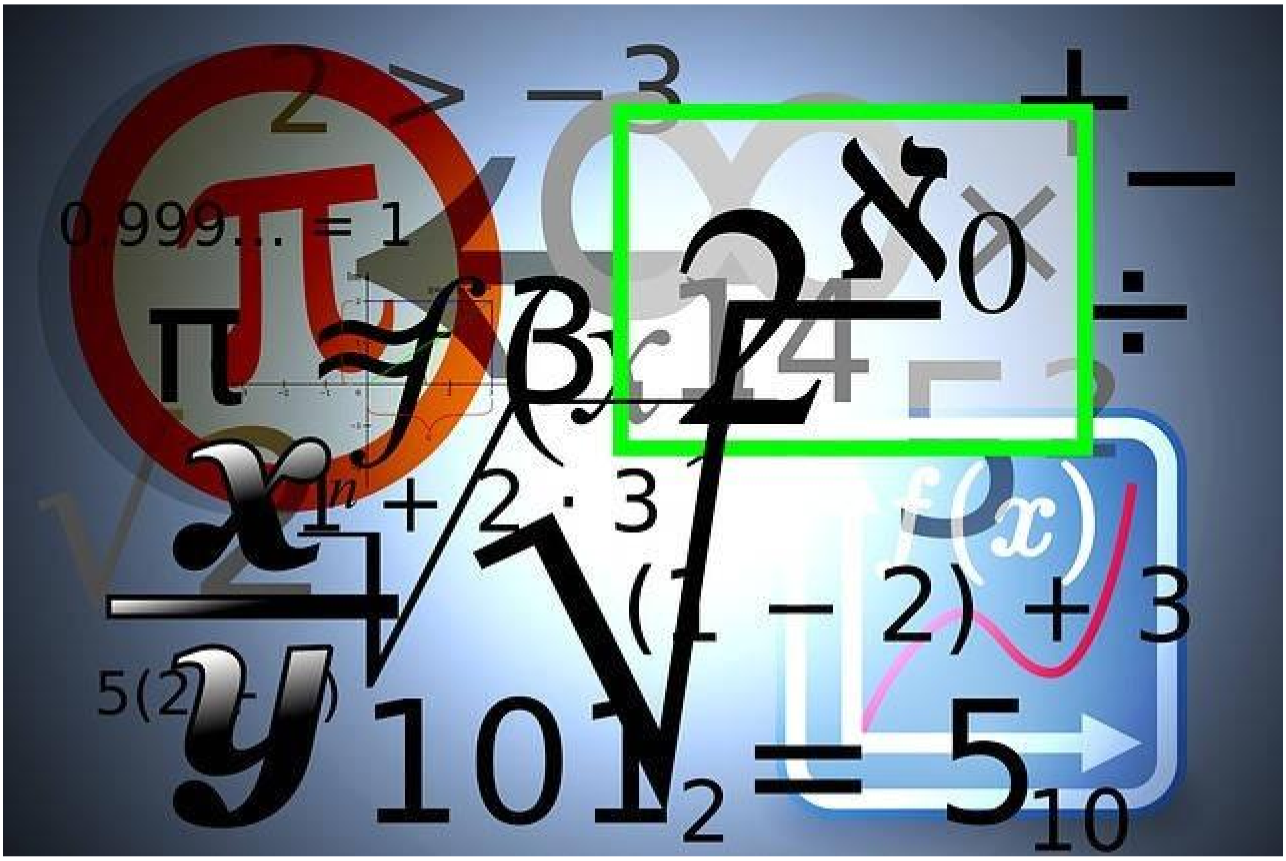

এ-এম যেখানে জি-এম-এর চেয়ে বড়

সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

আজ এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করছি যা সাময়িক পত্রের বিনোদন বিভাগের চেয়ে কলেজ গণিতের পাঠ্যপুস্তকেই হয়ত বেশী মানানসই হতো। বস্তুত যে উপপাদ্যটি আমি আলোচনা করতে বসেছি, তা অসমীকরণ তত্ত্বের একটি বুনিয়াদী ও বহুল ব্যবহৃত সূত্র।

কিন্তু আপাতত উপপাদ্য মাথায় থাক। আগে বলো দেখি, এ-এম কি জি-এম এর চেয়ে বড় হয়?

কর্পোরেট জগতের খবর বিশেষ রাখি না। তবে যতদূর মনে হয়, যে কোনও বাণিজ্যিক সংস্থায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এ এম) নিশ্চয়ই জেনারাল ম্যানেজারের (জি এম) চেয়ে পদমর্যাদায় বড় হবে না।

অঙ্কের জগতে কিন্তু এটা সম্ভব। সম্ভব শুধু নয়, এটাই দস্তুর। অর্থাৎ এ-এম সর্বদা জি-এম এর চেয়ে বড়!

হ্যাঁ, এরা যে অঙ্কের জগতের এ-এম আর জি-এম, বাস্তবিক কোনও কার্যবাহী প্রবন্ধক নয়। এদের পুরো নাম হল, অ্যারিথমেটিক মীন আর জিওমেট্রিক মীন, বাংলা করলে দাঁড়ায় যথাক্রমে সমান্তর ও গুণোত্তর মধ্যক।

এরা কী বস্তু, খায় না মাথায় মাখে জানতে হলে গুটিকয় কথা এসে পড়ে। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র ও শিক্ষকবর্গ আমায় মাপ করবেন, বিষয়টি সর্বজনগ্রাহ্য করতে আমাকে সমান্তর ও গুণোত্তর মধ্যক সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলতে হচ্ছে।

সমান্তর মধ্যক নিয়ে বিশেষ সমস্যা নেই। এটা হল কয়েকটি সংখ্যার গড় মান। সোজা কথায় সংখ্যা ক'টিকে যোগ করে যতগুলি সংখ্যা তা দিয়ে ভাগ দিলেই এই মধ্যকটি পাওয়া যায়। অর্থাৎ n সংখ্যক সংখ্যার যোগ ফল যদি S হয়, তাহলে ঐ সংখ্যাগুলির সমান্তর মধ্যক হচ্ছে (S/n), ব্যাস।

গুণোত্তর মধ্যক ঠিক এতোটা সরল নয়। দু'টি সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটা বোঝা অবশ্য খুব কঠিনও নয়। দু'টি সংখ্যার গুণোত্তর মধ্যক হল ঐ সংখ্যাদু'টির গুণফলের বর্গমূল। অর্থাৎ ধরুন আপনার একটি আয়তাকার জমি আছে যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে x এবং y , যেখানে এই x, y পরস্পর সমান নয়। এই জমিটির সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গাকার একটি জমি যদি পাওয়া যায়, তাহলে ঐ বর্গক্ষেত্রটির বাহুর দৈর্ঘ্য হবে x এবং y এর গুণোত্তর মধ্যক।

এইভাবে তিনটি সংখ্যার গুণোত্তর মধ্যক হবে ঐ সংখ্যা তিনটির ঘনমূল। তিনের বেশি সংখ্যক সংখ্যার জন্যেও একইভাবে গুণোত্তর মধ্যকের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলির গুণফলের, যতগুলি সংখ্যা তততম মূল নিতে হবে।

অর্থাৎ n সংখ্যক সংখ্যার গুণফল যদি P হয়, তাহলে $\sqrt[n]{P}$ হচ্ছে ঐ সংখ্যাগুলির গুণোত্তর মধ্যক।

একটু খটমট লাগছে কি? তা লাগবে বৈকি, জেনারাল ম্যানেজার বলে কথা! কিন্তু এর বেশী জটিলতা আর নেই। আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এইটুকুই যথেষ্ট। আশা করি, যে সূত্রটার কথা গোড়াতেই বলেছিলাম এবার সেটা বলা যেতে পারে। সূত্রটি হল এই –

সসীমরূপে বহুসংখ্যক ধনাত্মক সংখ্যার গুণোত্তর মধ্যক সর্বদা তাদের সমান্তর মধ্যকের চেয়ে কম হয়। গুণোত্তর মধ্যকটি বড়জোর সমান্তর মধ্যকের সমান হতে পারে, একমাত্র সেই ক্ষেত্রে যখন সব ক'টি সংখ্যা পরস্পর সমান।[1]

এই পর্যন্ত পড়েই যারা পাতা পাল্টাতে চলেছো, তাদের বলি উচ্চ গণিতের বিমূর্ত কচকচিতে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করার দুরভিসন্ধি কিন্তু আমার নেই। বিশ্বাস করো, আমার উদ্দেশ্য ঠিক এর বিপরীত। গণিতশাস্ত্রের এই প্রতিপাদ্যটি, যা বহু জটিল সমস্যার সমাধান জলের মত সহজ করে দেয়, আমি প্রমাণ করতে চাই অত্যন্ত সহজভাবে, কোন কূটতত্ত্বের সাহায্য ছাড়াই। আমি সহজ বাংলায় ব্যাপারটা বোঝাতে চাই, যাতে করে প্রমাণটা যেন ইতিহাস বা সাহিত্যের ছাত্রেরও বোধগম্য হয়। তাই অংক আপনার বিষয় না হলেও মনের জানলাটা একটু খুলে রাখতে অনুরোধ করবো। দেখো না, বোধহয় হতাশ হবে না।

কয়েকটা উদাহরণের মাধ্যমে পরিবেশটা একটু হালকা করা যেতে পারে। নীচের সারণীতে দেখো, ¾

ধনাত্মক সংখ্যা	এ-এম	জি-এম
১০১, ২৩, ৮.৬৬, ৬৬, ৫৫$\frac{২}{৩}$, ৯০.৬৭	৫৭.৪৯৯৪...	৪৩.৪২০৫...
১৪৪৭০৫, ৪.৮, ২৬৬, ৭০০১	৪৮৯৯৪.২	১১৩৯.৫৩৭১...
৩৮.৯৭২, ০.০০০৬, $\sqrt{১৭}$, π, e	৯.৭৯১১...	০.৯৬১৮...
১০০, ৯৯.৯, ১০০.০১, ১০০.১, ৯৯.৯৫, ৯৯.৯৯	৯৯.৯৯১৬৬৬...	৯৯.৯৯১৬৪৮...

প্রতিক্ষেত্রেই এ-এম জি-এম-কে টেক্কা দিয়েছে। এখানে গুটি চার-পাঁচ সংখ্যা নিয়ে দেখানো হয়েছে, কিন্তু যথেচ্ছ বেশী সংখ্যক সংখ্যার জন্যেও করে দেখা যেতে পারে। অবস্থার হেরফের হবে না।

সারণী থেকে একটা জিনিস বেশ পরিষ্কার, সংখ্যাগুলোর মানের ব্যবধান যখন বেশী, গুণোত্তর মধ্যক অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। ব্যাপারটা ঠিক সেরকম থাকে না, যখন সংখ্যাগুলি খুব 'কাছাকাছি'। শেষ উদাহরণটা

দেখো। এক্ষেত্রেও জি-এম এ-এম-এর চেয়ে কম বটে, কিন্তু প্রায় ধরে ফেলেছে। একেবারে ধরে ফেলে যখন সংখ্যাগুলো সব সমান!

ধরে ফেলে কিন্তু অতিক্রম করে না। এইটাই প্রতিপাদ্য। গাণিতিক পদ্ধতিতে বেশ কিছু আকর্ষণীয় উপায়ে এটি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এটা তো অঙ্কের ক্লাস নয়। তাই ন্যূনতম সাংকেতিক চিহ্ন ও বেশীটাই সাধারণ যুক্তি ব্যবহার করে ব্যাপারটা সিদ্ধ করা যায় কিনা দেখা যাক।

তো আমাদের প্রামাণ্য হল, n সংখ্যক ধনাত্মক সংখ্যার অ্যারিথমেটিক মীন, অর্থাৎ সমান্তর মধ্যক, তাদের জিওমেট্রিক মীন, অর্থাৎ গুণোত্তর মধ্যকের চেয়ে সর্বদা বড় হয়। এইতো?

সাদা বাংলায় প্রমাণের যুক্তিগুলো বলি। ¾

(১) প্রথমে, ওই সংখ্যাগুলোর মধ্যে সমান নয়, এমন যে কোন দু'টো সংখ্যাকে, ধরো a আর b, তাদের গড়, অর্থাৎ $\left(\frac{a+b}{2}\right)$ দিয়ে বদল করে দাও। কী দাঁড়ালো?

(২) সংখ্যা দু'টো সমান হয়ে গেল, তাদের যোগফল সমান রইল, কিন্তু তাদের গুণফল বেড়ে গেল, যেহেতু,

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a+b}{2}\right) - ab = \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \geq 0 \rightarrow \left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq ab,$$

কেননা এ আর কে না জানে দু'টো সংখ্যার বিয়োগফল যদি শূন্যের চেয়ে বেশী হয় অর্থাৎ ধনাত্মক হয়, তাহলে প্রথম সংখ্যাটা নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টার চেয়ে বড়।

(৩) বাকী সংখ্যাদের মধ্যে আবার দু'টো অসমান সংখ্যা পছন্দ করে একই প্রক্রিয়া চালাও। আবার যোগফল সমান রইল, কিন্তু তাদের গুণফল বেড়ে গেল।

(৪) এই করে যাও, যতক্ষণ না সব সংখ্যাগুলো সমান হয়ে যায়। যখন সবকটি সংখ্যা সমান হয়ে গেল, সে অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, সংখ্যাগুলোর যোগফল আসল সংখ্যাগুলোর যোগফলের সমান আছে, কিন্তু তাদের গুণফল আসল সংখ্যাগুলোর গুণফলের চেয়ে বেড়ে গেছে। অতএব গুণোত্তর মধ্যকের মানও বেড়ে গেছে।

(৫) বেড়ে কী হয়েছে? এখন যেহেতু সংখ্যাগুলো সব সমান, তাদের সমান্তর মধ্যক এবং গুণোত্তর মধ্যক সমান। এবং আমাদের প্রক্রিয়া অনুযায়ী যেহেতু সংখ্যাগুলির যোগফলে কোনও বৃদ্ধি হয় নি, অতএব সমান্তরমধ্যক একই আছে। গুণোত্তর মধ্যক বেড়ে সমান হয়েছে।

(৬) অতএব আদতে গুণোত্তর মধ্যক সমান্তর মধ্যকের চেয়ে কম ছিল। ঠিক কিনা?

এখন বলো, আমি কি কোনও দুর্বোধ্য গাণিতিক তত্ত্ব ব্যবহার করেছি?

---

[1] সসীমরূপে বহুসংখ্যক ধনাত্মক সংখ্যা, এই কথাটি মনে রাখতে হবে। অসীম সংখ্যক অথবা ঋণাত্মক সংখ্যার জন্য সূত্রটি খাটে না। সংখ্যা যেমন ইচ্ছে হতে পারে, পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ বা অমূলদ।

ছবিঃ আন্তর্জাল

বিজ্ঞান::

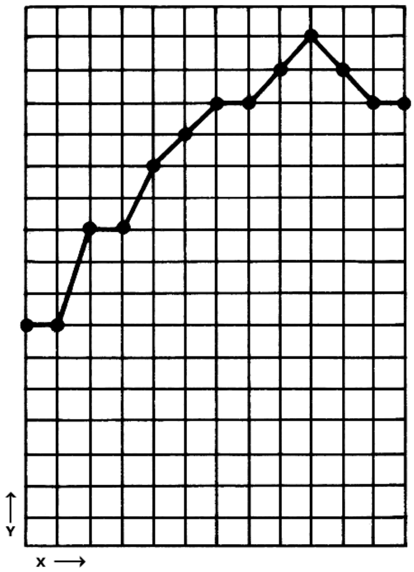

গ্রাফের বিন্দু-বিসর্গ

অমিতাভ প্রামাণিক

আমার মেয়ে অন্বেষার যখন ক্লাশ নাইন, একদিন এসে আমার কাছে গলে পড়লো – বাবা!

- কী?
- ম্যাথ্‌স্‌ পারছি না।
- এ আর নতুন কী! অঙ্ক শুনলেই তো তোমার গায়ে জ্বর আসে। কী পারছো না?
- গ্রাফ।
- গ্রাফ তো খুব সহজ। মানে ওর চেয়ে সহজ তো আর কিছু হতেই পারে না।
- আমি পারছি না। এই দ্যাখো ইকুয়েশন দেওয়া আছে। পয়েন্ট বের করতে হবে।
- করে ফেলো। এ আর কঠিন কী!
- ম্যাম বলেছে, মিনিমাম তিনটে পয়েন্ট বের করতে। তারপর সেগুলো গ্রাফবুকে বসিয়ে পয়েন্টগুলোর মধ্যে দিয়ে স্কেল দিয়ে স্ট্রেট লাইন ড্র করতে হয়।
- ম্যাম তো ঠিকই বলেছেন। ওয়েল, অ্যাকচুয়ালি দুটো পয়েন্ট বের করলেই চলে। তবে একটা পয়েন্ট যদি ভুল করো বাই চান্স, তিনটে বের করাই ভালো।
- না, না, আমাদের তিনটেই করতে হবে। না হলে ম্যাম মার্ক্স দেবে না।
- ঠিক আছে, তিনটেই করো। চারটে পাঁচটা করলেও দোষের না।
- আমি পারছি না। অনেক কষ্টে একটা বের করতে পেরেছি। আর বেরোচ্ছে না।
- সে কী! যেভাবে একটা বের করলে ওভাবেই আরও দুটো করে ফেলো।
- হচ্ছে না। তুমি প্লিজ হেল্প করো।
- কী ইকুয়েশন দেওয়া আছে?
- এই যে দেখো। থ্রী এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এইট।
- বেশ। তুমি কী করলে?

- আমি ওটাকে রি-অ্যারেঞ্জ করে লিখলাম 7y = 8 – 3x
- বেশ। তারপর?
- তারপর y = (8 – 3x)/7
- একদম ঠিক লিখেছ। সমস্যাটা কী তাহলে?
- পয়েন্ট বের করতে গিয়ে হচ্ছে না। এই দেখো, এক্স-এর জায়গায় জিরো, এক, দুই, তিন, চার দিয়ে ট্রাই করে মিললো না। তখন মাইনাস ওয়ান, মাইনাস টু দিয়ে ট্রাই করলাম। মাইনাস টু-তে এসে মিললো। একটা পয়েন্ট পেলাম (-2, 2)। আবার মাইনাস থ্রী, মাইনাস ফোর, মাইনাস ফাইভ, মাইনাস সিক্স দিয়ে ট্রাই করছি, কিছুতেই মিলছে না। কত ট্রাই করবো এ রকম ভাবে?

x	-2	?	?
y	2	?	?

কী করে চট করে পয়েন্ট বের করে ফেলা যায়, তা ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে দেওয়ার আমি ঠিক পক্ষপাতী নই। আমিও এই সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেছি। অনেক ইকুয়েশন সল্ভ করতে করতে নিজে নিজেই বের করে ফেলেছি একটা চটজলদি উপায়। সেটা এখানে লিখে দিচ্ছি শুধু একটাই কারণে। অঙ্ক এখন শুধু সল্ভ করার খেলাই তো নয়। উত্তর দিতে হবে ফটাফট। অনেক সময় মাত্র এক নম্বরের জন্যেও একটা মাইলস্টোন মিস হয়ে যেতে পারে। সুতরাং একটা কায়দা জানা থাকলে হয়ত সেই অসুবিধেটা হবে না।

না, কোনো ম্যাজিক না এটা। একখানা পয়েন্ট খেটেখুটে বের করতেই হবে। সেটা বেরিয়ে গেলেই বাকি হাজারখানেক পয়েন্ট বেরিয়ে আসবে জলপ্রপাতের মত।

কেমন করে? ওয়েল, দেখে নাও। ইকুয়েশনটা এমনভাবে লেখো যাতে এক্স আর ওয়াই দুটো ইকুয়াল চিহ্নের দুদিকে থাকে। মানে এক্ষেত্রে যেমন 7y = 8 – 3x. এখানে -3 হচ্ছে এক্সের কোয়েফিশিয়েন্ট আর 7 হচ্ছে ওয়াই-এর কোয়েফিশিয়েন্ট। (মনে রেখো, ইকুয়েশন চিহ্নের দুদিকে আছে এরা!)

এবার একটা যে পয়েন্ট বেরিয়েছে, ঐ যে (-2, 2), তার প্রথমটার সাথে ওয়াই-এর কোয়েফিশিয়েন্ট আর দ্বিতীয়টার সাথে এক্সের কোয়েফিশিয়েন্ট যোগ (বা বিয়োগ, যা করবে দুক্ষেত্রেই একই) করে দিলেই পরের পয়েন্ট বেরিয়ে যাবে। -2 এর সাথে 7 যোগ করলে হয় 5; 2-এর সাথে -3 যোগ করলে হয় -1, সুতরাং পরের পয়েন্ট হচ্ছে (5, -1)। এভাবে চালিয়ে গেলে ফটাফট পয়েন্ট আসতে শুরু করবে। 5-এর সাথে 7 যোগ করে 12, -1-এর সাথে -3 যোগ করে -4, তাই পরের পয়েন্ট (12, -4)। বিয়োগ করলেও হত। প্রথম পয়েন্ট দিয়ে শুরু করা যাক। -2 থেকে 7 বিয়োগ করলে -9; 2 থেকে -3 বিয়োগ করলে 5, তাই একটা পয়েন্ট হবে (-9, 5)। তারপরে (-16, 8), ইত্যাদি।

দুদিকেই যোগ করলে –

x	-2	-2 + 7 = 5	5 + 7 = 12	12 + 7 = 19
y	2	2 + (-3) = -1	-1 + (-3) = -4	-4 + (-3) = -7

দুদিকেই বিয়োগ করলে –

x	-2	-2 - 7 = -9	-9 - 7 = -16	-16 - 7 = -23
y	2	2 - (-3) = 5	5 - (-3) = 8	8 - (-3) = 11

কী করে হচ্ছে এটা? বলে দেওয়ার আগে নিজে একটু ভেবেচিন্তে দেখো। মনে রেখো, নিজে নিজে একটা নতুন নিয়ম বের করার আনন্দই আলাদা। সুতরাং, ভাবো আর একটু।

ও হ্যাঁ, এতটা বললাম যখন, আর একটু বলে নি। ক্লাশে সাধারণত শেখানো হয়, ওয়াই-টা ইকুয়াল সাইনের বাঁদিকে রেখে বাদবাকি অংশটা ইকুয়াল সাইনের ডানদিকে নিয়ে আসার কথা, যাতে পুরো এক্সপ্রেশনটা ওয়াই ইকুয়াল টু সামথিং করে লেখা যায়। তুমি একে একে এক্স-এর (ইন্টিজার) ভ্যালু বসিয়ে চেক করে দেখবে ওয়াই-এর ইন্টিজার ভ্যালু পাও কিনা। তাই তো?

শিক্ষকরা ভুল শেখান না। তবে একটু ভাবলে বুঝতে পারবে, এতে হয়ত অনেক সময় বেশি সময় লাগছে সল্ভ করতে। কেন? ওপরের উদাহরণে দেখো। ওয়াই-এর এক্সপ্রেশনটা এমন হয়েছে, যাতে ডানদিকে এসে গেছে (8 – 3x)/7। (8 –3x)এর মান 7-এর গুণিতক হলে তবেই তুমি একটা ইন্টিজার ভ্যালু পাবে, আর এক্স-এর একটা নাম্বার পেয়ে গেলে তুমি যদি এক এক করে বাড়িয়ে বা কমিয়ে ট্রাই করতে থাকো, তবে তার পরবর্তী নাম্বার আসবে আরো সাতটা নাম্বার পরে। (-2, 2) যে একটা পয়েন্ট অন্বেষা পেয়েছিল, সেই -2–এর থেকে 7-এর গুণিতকে ছোটো (বা বড়ো) নাম্বার ভিন্ন আর কোনো নাম্বারে মিলবে না। সেই জন্যেই অন্বেষা নাম্বার খুঁজে পাচ্ছিল না। অন্বেষা করছিল –

x	0	1	2	3	4	-1	-2	-3	-4
y	8/7	5/7	2/7	-1/7	-4/7	11/7	14/7=2	17/7	20/7

ওর চাই দুটোই পূর্ণসংখ্যা। এতক্ষণ খেটেখুটে ওর বেরিয়েছে মাত্র একখানা!

এটাকেই যদি এক্স-ওয়ালা অংশটা ইকুয়াল চিহ্নের বাঁদিকে রেখে সিমপ্লিফাই করতে, তবে ওটা হত এই রকমঃ x = (8 – 7y)/3। এখন তোমাকে ওয়াই-এর (ইন্টিজার) ভ্যালু ট্রাই করে যেতে হবে এক এক করে, যাতে (8 – 7y) এর মান 3-এর গুণিতক হয়। পর পর ম্যাক্সিমাম 3 খানা ট্রাই করলে একটা বাধবেই। আগের তুলনায় সময় কম লাগবে, যেহেতু 3, 7-এর চেয়ে ছোটো।

x	8/3	1/3	-6/3=-2	-13/3	-20/3	15/3=5	22/3	29/3	36/3=12
y	0	1	2	3	4	-1	-2	-3	-4

একই পরিশ্রমে তিনজোড়া পূর্ণসংখ্যা বেরিয়ে গেল তো!

তাহলে ফটাফট বিন্দু বের করার নিয়ম কী দাঁড়ালো? প্রথম বিন্দু বের করার জন্যে ইকুয়েশন রি-অ্যারেঞ্জ এমনভাবে করবে, যাতে এক্স আর ওয়াই-এর মধ্যে যার কোয়েফিশিয়েন্টের মান ছোটো, সেটা বাঁদিকে থাকে (কেননা সেটাই ডানদিকে ডিনোমিনেশনে আসবে)। তাতে প্রথম পয়েন্ট বের করতে পঞ্চাশ সেকেন্ডের বেশি লাগবে না। আর পরের আরো দুটো পয়েন্ট, যেমন শেখালাম সেই ভাবে বের করতে বড়োজোর আর দশ সেকেন্ড।

শুধুমাত্র কঠিন এক্সপ্রেশনের জন্যেই (মানে যাতে কোয়েফিশিয়েন্টগুলো 5–এর চেয়ে বড়) এই এক মিনিট। সহজ এক্সপ্রেশন থাকলে তো এসব ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না।

শিখে গেলে তো? এবার তাহলে এই নিয়ম কেন কাজ করছে, পরবর্তী অংশটা পড়ার আগেই তার হদিশ বের করো দেখি। তবেই বুঝবো তুমি বুদ্ধিমান।

না পারলে তবেই পড়ো এটা।

যে কোনো সরলরেখাকে প্রকাশ করা যায় $ax + by = c$ সমীকরণ দিয়ে। লক্ষ করে দেখো, এখানে x এবং y দুটোরই পাওয়ার এক, মানে x2 বা y3 জাতীয় এক্সপ্রেশন সরলরেখার সমীকরণে থাকবে না।

মনে করা যাক, আমাদের আলোচ্য সরলরেখার সমীকরণও $ax + by = c$, আর তুমি খেটেখুটে বের করে ফেলেছো একটা পয়েন্ট, ধরা যাক সেটা (p, q)। সমীকরণটার x আর y ইকুয়াল চিহ্নের দুপাশে লিখলে হয়ঃ
$ax = c - by$

সুতরাং আমার নিয়ম অনুযায়ী p-এর সঙ্গে y-এর কোয়েফিশিয়েন্ট (-b) আর q-এর সঙ্গে x-এর কোয়েফিশিয়েন্ট (a) যোগ দিতে থাকলে এই লাইনের ওপর অন্য বিন্দুগুলো হবে(p-b, q+a), (p-2b, q+2a), (p-3b, q+3a) ইত্যাদি এবং p-এর সঙ্গে y-এর কোয়েফিশিয়েন্ট আর q-এর সঙ্গে x-এর কোয়েফিশিয়েন্ট বিয়োগ দিতে থাকলে (p+b, q-a), (p+2b, q-2a), (p+3b, q-3a) ইত্যাদি।

প্রমাণ করবে কী করে? খুব সোজা।

যেহেতু ax + by = c লাইনটা (p, q) বিন্দু দিয়ে যায়, এই সমীকরণে x আর y-এর জায়গায় এদের মান যথাক্রমে p আর q বসিয়ে দিলে তুমি পেয়ে যাবে

pa + qb = c...(1)

1. pa + ab - ab + qb = c
2. a(p + b) + b(q – a) = c

দেখো, এটাও ax + by = c ফর্মেই আছে, যেখানে x আর y–এর মান যথাক্রমে (p+b) আর(q-a) অর্থাৎ (p+b, q-a) বিন্দুটি ax + by = c সরলরেখার ওপরে আছে।

(1)সমীকরণটাকে এ ভাবেও বদলানো যেত –

pa + qb = c

1. pa - ab + ab + qb = c
2. a(p - b) + b(q + a) = c

এটাও ax + by = c ফর্মে, যেখানে x আর y–এর মান যথাক্রমে (p-b) আর (q+a) অর্থাৎ (p-b, q+a) বিন্দুটি ax + by = c সরলরেখার ওপরে আছে।

(1)নং সমীকরণটার নীচে (+ ab – ab)-র বদলে + 2ab – 2ab বা + 3ab – 3ab ইত্যাদি এক্সপ্রেশন যোগ করলে বাকি বিন্দুগুলোও যে এই সরলরেখার ওপরে, তার ব্যাখ্যাও বেরিয়ে আসত।

____

ছবিঃ আন্তর্জাল

তাহাদের কথাঃ সেলিম আলি

মণিমালা চক্রবর্তী

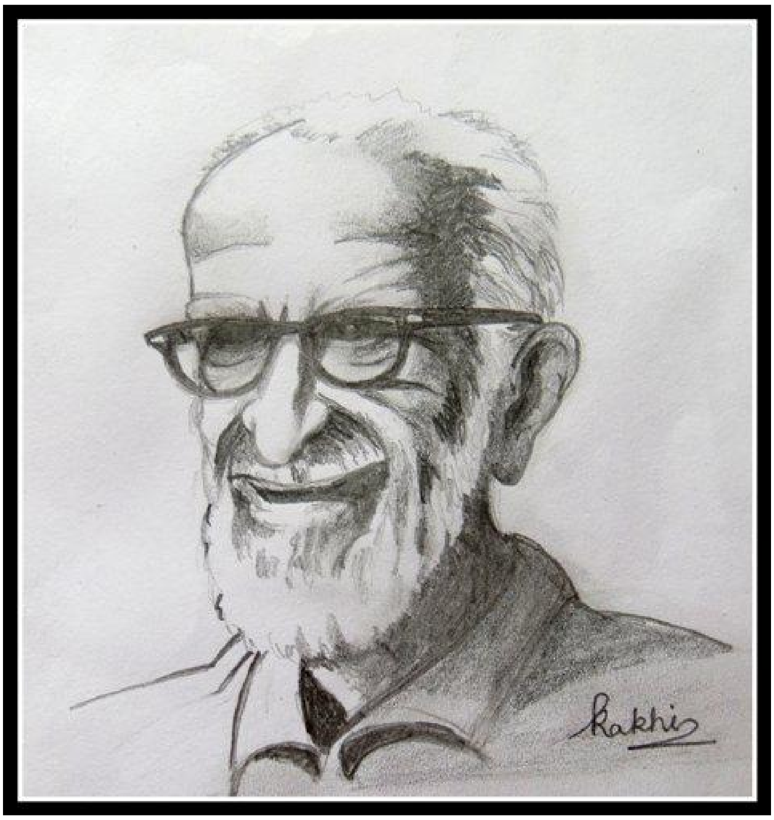

সেলিম আলি, ছবিঃ রাখী নাথ কর্মকার

ঝকঝকে একখানা এয়ারগান। উপহার দেখে খুশি আর ধরছিলো না বছর দশেকের সালিম-এর। মস্ত শিকারী হবার স্বপ্ন তার অনেকদিনের। চড়ুই দিয়েই হাত পাকানো যাক আপাতত। ঝোপে-জঙ্গলে দাপিয়ে বেড়ায় সালিম, হাতে এয়ারগান। হঠাৎ একদিন খটকা লাগলো। হাতের মরা চড়ুইটা ভালো করে দেখতে গিয়েই অবাক। গলায় হলদে ছোপ! এতো যেমন তেমন চড়ুই নয়! মামা আমিরুদ্দিনকে দেখিয়েও লাভ হলো না। এ পাখি তাঁরও অচেনা। কিন্তু সালিম-এর কৌতূহল আর যায় না। অগত্যা মামা তাকে পাঠালেন বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে।

চড়ুই

সময়টা উনিশ'শো আট সাল। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির সভাপতি তখন এক ব্রিটিশ সাহেব। সেই সময়ে ভারতে ব্রিটিশ সায়েব-সুবোদের দত্যি-দানোর থেকে কম কিছু ভাবা হত না। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ সালিমের। ভয় ভাঙলো অচিরেই, মিলার্ড সাহেবের মিষ্টি হাসিতে। হলুদ-গলা চড়ুইটিকে দেখামাত্রই চিনলেন তিনি। শুধু তাই নয়, দেরাজের পর দেরাজ খুলে দেখালেন সোসাইটির সংগ্রহে রাখা অজস্র পাখির নমুনা। সালিম-এর সামনে স্বপ্নের রাজ্যের দরজা খুলে গেল যেন। শুধু পাখি নিয়েই তো একটা মানুষ কাটিয়ে দিতে পারে সারাজীবন! সেই শুরু। তারপর বম্বে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে প্রাণীবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে জার্মানিতে পক্ষিবিদ্যার প্রশিক্ষণ। ধীরে ধীরে এয়ারগান-ওলা ছোট্ট সালিম হয়ে উঠলো 'পক্ষিমানব' সালিম মইজুদ্দিন আব্দুল আলি, সংক্ষেপে ডঃ সালিম আলি (জন্মঃ ১৮৯৬; মৃত্যুঃ ১৯৮৭, বোম্বে, এখনকার মুম্বইতে); আমাদের দেশের প্রথম পক্ষীবিশারদ এবং প্রকৃতিবিদ (Naturalist)।

Rose-ringed parakeet

সেই সময়ে পাখি নিয়ে চর্চা বা পক্ষিবিদ্যা (যার ইংরেজি নাম Ornithology), সংরক্ষণ (Conservation) এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়, সুযোগ বা শিক্ষা কোনটাই ছিল না সাধারণ মানুষের কাছে। পাখি দিয়ে বড়জোর দু'একটা সুস্বাদু পদ রান্না করা ছাড়া আর কিইবা হয়! সালিম আলিকেও তাই দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছে আর্থিক অনটনের মধ্যে। কিন্তু তাতে একচুলও কমেনি তাঁর উদ্যম। ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়িয়েছেন শুধু পাখির নেশায়। বাবুই, কোয়েল, ফ্লেমিংগো এমনি আরো হাজারো পাখির জানা-অজানা তথ্য নিয়ে লিখে গেছেন অজস্র গবেষণাপত্র আর অমূল্য কিছু বই। তাঁর লেখা 'দ্য বুক অফ ইন্ডিয়ান বার্ডস' -কে বলা হয় ভারতের পক্ষিপ্রেমিদের বেদ। সালিম আলির লেখা বিখ্যাত বই ‘দ্য ফল অব আ স্প্যারো’ আসলে তাঁরই আত্মজীবনী।

১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ক্রমশ জড়িয়ে পড়েন বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির সঙ্গে, যেখানে তিনি পালন করেছিলেন প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা। তার সঙ্গে সঙ্গেই রাজস্থানে গড়ে তোলেন 'কেওলাদেও ন্যাশনাল পার্ক' যার আরেক নাম 'ভরতপুর বার্ড স্যাংচুয়ারি'। কেরলের 'সাইলেন্ট ভ্যালি' কে মানুষের উদ্যত কুঠারের হাত থেকে রক্ষা করার পেছনেও আছে তাঁরই কৃতিত্ব।। ভারত সরকারের পদ্মভূষণ (১৯৫৮) এবং পদ্মবিভূষণ (১৯৭৬) পুরস্কার তাঁর এই বিরাট অবদানেরই স্বীকৃতি ঘোষণা করে। দেশ-বিদেশের আরো বহু সম্মান তাঁর ঝুলিতে। ১৯৯৬-এ ভারত সরকার তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রকাশ করেছেন সালিম আলির নামাঙ্কিত ডাকটিকিট এবং ফার্স্ট ডে কভার।

ডঃ আলি আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর লেখাগুলো রয়ে গেছে। তোমরা যারা নানারঙের পাখি ভালোবাসো (কেই না ভালোবাসে!) সেগুলো সব পড়ে ফেলো দেখি ঝটপট। দেখছ না চারদিকে শহর বানানোর তাড়ায় কেমন করে গাছপালা আর পুকুর-নদীগুলো কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে? পাখিদের তাই খুব বিপদ। চলো সালিম আলির হাত ধরে তাদের আর একটু ভালো করে চিনি, আর একটু বেশি সুযোগ করে দিই তাদের বাঁচার।

Darter from Bharatpur Sanctuary

পাখির ফটোঃ স্বর্ণ চক্রবর্তী

বহুরূপী ::

ক্যামেলিয়ন - আশ্চর্য এক বহুরূপী

স্বর্ণ চক্রবর্তী

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা যারা এই 'ম্যাজিক ল্যাম্প' পত্রিকার পাতা উল্টে "বহুরূপী" বিভাগে চলে এসেছো, তাদের একটা মজার কথা জানাই। আজকে আমি তোমাদের বলব 'বহুরূপী' নামের এক প্রাণীর কথা। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, তাও কি হয়? বহুরূপী নিশ্চয়ই কোনো স্বপ্নরাজ্যের প্রাণী! তোমাদের এইবেলা জানিয়ে রাখি বহুরূপী নামের প্রাণীটিকে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য অর্থাৎ ট্রপিকাল রেন ফরেস্ট অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। ভীষণ ঘন জঙ্গল, যেমন আফ্রিকা, মাদাগাস্কার এবং এমনকী ভারতবর্ষেও এই আশ্চর্য বহুরূপীর দেখা মেলে। বহুরূপীকে সারা দুনিয়া চেনে 'ক্যামেলিয়ন' নামে। আর ভারতবর্ষের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, উড়িষ্যার জঙ্গল অথবা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ঘরের কাছেই বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ায় এর দেখা মেলা খুবই সম্ভব।

ক্যামেলিয়ন নামটা শুনলেই চোখের সামনে কেমন এক ধীর গতির ভাবুক ব্যক্তিত্বওয়ালা প্রাণীর কথা মনে আসে। বাস্তবেও কিন্তু বহু ভেবে ভেবে বহুরূপী মশাই গাছের ডালে এক পা এক পা করে চলেন। সবসময়ই কিছু না কিছু চিন্তা মাথায় ঘুরছেই; যেমনঃ সামনের ডালে একটা ফড়িং এসে বসলে মন্দ হয় না! কিম্বা পাতায় বসা পোকাটাকে কীভাবে খাবো এইসব দুষ্টুবুদ্ধিতেই দিনের বেলায় মগ্ন থাকেন আর কপাকপ জিভ ছুঁড়ে ধরে ফেলেন পোকা-মাকড় কীটপতঙ্গ। দিবাচর (দিনের বেলায় ঘুরে বেড়ায় যারা) এই বহুরূপী রাত্তিরে কিন্তু গাছের উপর সামনের দু'পায়ের ফাঁকে মাথা রেখে আমাদের ম্যাজিক ল্যাম্পের ছোট্ট বন্ধুদের মতনই ঘুমিয়ে পড়েন।

আফ্রিকা আর মাদাগাস্কারে বহুরূপীর অসংখ্য প্রজাতির দেখা মেলে। কিন্তু ভারতবর্ষে এর একটাই মাত্র প্রজাতি। তার নাম 'ইন্ডিয়ান ক্যামেলিয়ন', আর বিজ্ঞান সম্মত নাম 'ক্যামেলিও জাইলোনিকাস্'। এই ভারতবর্ষীয় বহুরূপীর দুটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এক, এই ক্যামেলিয়ন প্রয়োজন এবং ইচ্ছেমত গায়ের রঙ বদল করতে পারে, যার থেকে বাংলায় এর নাম হয়েছে 'বহুরূপী'। আবার এই রঙ বদল কিন্তু প্রকৃতির

সঙ্গে সঙ্গেই হয়না, রঙটা বদলায় আলো, তাপমাত্রার হেরফের এবং এদের মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। মূলত এর গায়ের রঙ সবুজ। কিন্তু ভয় পেলে বা অন্য কোনো ভাবে উত্তেজিত হলে এর গায়ে কমলা নীল হলুদ বাদামী এমন সব অসাধারণ রঙ ফুটে ওঠে।

এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর জিভ; ক্যামেলিয়ন নিজে খুবই ধীর গতির হলেও তার জিভের গতি সাঙ্ঘাতিক! তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো 'জিভের গতি' ব্যাপারটা কি? কিন্তু হ্যাঁ এটাই সত্যি যে ক্যামেলিয়ন যখন শিকার ধরে, গায়ের রঙ বদলে পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়ে, ধীর গতিতে চুপিচুপি শিকারের কাছে পৌঁছে যায় আর হঠাৎই গুলতির মত জিভটাকে ছুঁড়ে দেয় শিকারের দিকে। এর জিভের মাথাটা একটু ফোলা মত, তাতে আবার আঠার মত এক পদার্থ লাগানো থাকে, তাই ঘাসফড়িং হোক কিম্বা মাকড়সা অথবা উচ্চিংড়ে – কখনোই এর শিকার ফসকায় না। আর শুনতে খুব আশ্চর্য লাগলেও গবেষকরা এই জিভের গতি মেপেছেন বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে; আর তাতে জানা গিয়েছে, ১ সেকেন্ডের ১২৫ ভাগের এক ভাগ সময়ে অথবা অনেকক্ষেত্রে ১ সেকেন্ডের ২০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়ে ক্যামেলিয়ন তার জিভ ছুঁড়ে মারে শিকারের গায়ে। তাহলেই ভাবো কি সাঙ্ঘাতিক শিকারী এই বহুরূপী। এরা বিভিন্ন রকম মাকড়সা, ফড়িং আর বিট্‌ল জাতীয় পোকা খেতে খুব ভালোবাসে, তাছাড়াও অন্যান্য কীটপতঙ্গও বাদ পড়ে না। আর এর চোখ দুটিও ভারি অদ্ভুত। একই সময়ে দুটি চোখ দুটি আলাদা আলাদা দিকে ঘুরতে পারে। তাই চলার পথের দিকে এক চোখ রেখে বহুরূপী যখন শিকারে বেরোয়, তখন তার অন্য চোখ ব্যস্ত থাকে শিকারের খোঁজে।

ক্রমাগত গাছপালা, বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য এই অসামান্য বহুরূপীর দল পৃথিবীর বুক থেকে ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের খাদ্য কীটপতঙ্গের দলও। আর সেই কারণেই সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই ক্যামেলিয়ন বা বহুরূপী সংরক্ষণের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। শুধু বহুরূপীর জন্যই তৈরি করেছেন অভয়ারণ্য। তোমরা যদি কোনোদিন এই বিরল ব্যক্তিত্বশালী ক্যামেলিয়নের সন্ধান পাও তো দেখবে, এই রঙিন যাদুকর 'ছন্দে ছন্দে কত রঙ বদলায়' !!

ছবিঃ লেখক

ধাঁধা

ছড়িয়ে ছিটিয়ে !!

মণিমালা চক্রবর্তী

বলো তো দেখি এঁরা কারা?

১। সাদা-কালো গোলগাল চীনদেশে খোঁজ্ রে,
কচি বাঁশপাতা পেলে জমে তার ভোজ রে।।

২। ধিতাং ধিতাং ধিং আমার একটা মোটে শিং ।
চামড়া মোটা আমার শখ নেইকো পুজোর জামার।
গাছ-পাতা খাই ঘাস আমার কাজিরাঙ্গায় বাস।।

৩। পাহাড় ঘেরা শান্ত হ্রদের জল,
ঘন সবুজ 'ফুমডি' ভাসে তায়।
কপালে শিং , পায়ে নাচের তাল,
চলতে গিয়ে পেছন ফিরে চায়।।

পারবে নিশ্চয়ই!! না পারলে উত্তর দেখে নাও পরের পাতায়।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে !!

উত্তর

১। পাণ্ডা (সে কি কংফু জানে?)

২। একশৃঙ্গ গণ্ডার

৩। মণিপুরের ‘সাঙ্গাই’ বা নাচুনে হরিণ ।।

বহুরূপী ::

বাঙ্ময়

শ্রেয়সী চক্রবর্তী

ছোট্ট মংপু রোজ মায়ের কোলে চড়ে ছাদে বেড়াতে আসে। সেখানে মায়ের হাত ধরে চিনতে শেখে তার চারপাশের বন্ধু গাছ, ফুল, পোকামাকড় আর পাখিদের। ওদেরকে ভালবাসতে শেখে। কিন্তু দুদিন ধরে যে খুব বৃষ্টি; ছাদে যাওয়াই তো হচ্ছে না মংপুর। সে রাতে শুতে গিয়ে ভাবে কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠে চুপিচুপি যাবে ছাদে; আর ঠিক তখনই! ...

"কিগো আমাকে চিনতে পারছ না? কেমন সোনালি ডানা উড়িয়ে আমি তোমাদের বাগানের আম গাছ কাঁঠাল গাছে বসে ডাকাডাকি করি! তুমি তো রোজই আমার নাম জানতে চাও, কিন্তু ভাবো আমি কথা বলতে পারি না; তাই আর নামও জানা হয়না! আজ দেখলে তো কেমন করে ডাকি আমি 'কেষ্টগোকুল'! নাম আমার বেনেবৌ পাখি (Black-hooded oriole); বড় হয়ে ভুলে যেও না কিন্তু! আমাকে নিয়ে অনেক গল্প আছে, পড়তে পাবে পাখিদাদু শ্রী অজয় হোমের বইয়ে; মা-বাবাকে বলে বইখানা কিনে নিয়ো কিন্তু!!"

বেনেবৌ বা Black-hooded oriole

মংপু দেখে পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে নীল-কমলা-হলদে-সবুজ ওই ওটা কি??? নাচতে নাচতে সামনে হাজির হয় সূঁচফড়িং, বলে "সূঁচের মতন সরু তাই আমার নাম সূঁচফড়িং (Orange-tailed marsh dart)। তোমার বাড়ির আশেপাশে আমি একাই নই, আমার আরো সব রংবেরঙের ভাইবোনরা থাকে। তুমি কিন্তু তাদের কখনো মেরো না বন্ধু। আমরা ঘাসে পাতায় উড়ি, আকাশটাকে সাধ্যমত রঙিন করে তুলি।"

সূঁচফড়িং বা Orange-tailed marsh dart

এই না বলেই চোখের নিমেষে উড়ে যায় ছাদবাগানের ফুলের উপর নাচ দেখাতে, আর ওমনি ফুলটা বলে ওঠে, "ঝুমকো লতা নামটি আমার, ইংরেজিতে প্যাশন/ আমায় দেখে অন্য ফুলের ফিকে হয়ে যায় ফ্যাশন!" বুঝলে মংপুবাবু?

ঝুমকোলতা বা Passion flower

একগাল হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বেনেবৌ জুড়ে দিয়েছে বেজায় চিৎকার। হলটা কী?? আরে এ যে গাছের গায়ে শিরশিরানি কালো-বাদামি এক সাপ তার জিভ লকলক করছে, কিন্তু চোখের ভাবটা তো হিংস্র নয়! বন্ধুর মত মংপুর দিকে আসতে চাইছে, কিন্তু বেনেবৌ ওকে উড়ে উড়ে ঠুকরে দিতে চায়! মংপু বলে বুঝেছি, বুঝেছি... "তোমার নামটা বল দেখি এইবার।"

"আজ্ঞে আমি হলুম গে 'খড়িচুড়' (Painted bronzeback) আমার কিন্তু মোটেও বিষ নেই, তবু আমায় পছন্দ করে না এই পাখিদের দল। দোষের মধ্যে খিদে পেলে ছোট পাখি, পাখির ডিম, ইঁদুর কিম্বা টিকটিকি গিরগিটি ধরে খেয়ে ফেলি, ঠিক তুমি যেমন লুচি খাও তেমনটি। সেটাই যে পরিবেশের নিয়ম। শুধু বিনা কারণে, বিনা দোষে মানুষ আমায় ভয় পায়, পিটিয়ে মারে। আমার অন্যান্য সাপ ভাইদেরও মানুষ মেরে ফেলে কিন্তু নিজেরা সাবধান হয় না। মংপু তুমি বড় হয়ে এমন মানুষ হবে না তো??"

খড়িচূড় বা Painted bronzeback

ছোট্ট মংপু সবটা কথা ভাবার আগেই দেখতে পায় বিশাল পাম গাছের ছোট্ট নীচু ডালের পাতায় বসে আছে সবুজে সবুজ হয়ে ডানায় কেমন চিত্রবিচিত্র নিয়ে নতুন এক বন্ধু! মংপু কাছে যেতেই হেসে ওঠে সেই সবুজ সেনানী যার নাম Oleander-hawk moth বা Army green moth! বিকেল হলেই যার মধু খাওয়ার কর্মব্যস্ততা সবচাইতে বেশি বেড়ে ওঠে!

Oleander-hawk moth বা Army green moth

কোনো কথা না বলে মংপুর মাথার চারপাশে বোঁ করে একচক্কর দিয়ে বুঝিয়ে দেয় মংপু তাদের সব্বার প্রিয় বন্ধু আর উড়ে যায় দূরে... অনেকদূরে...।।

ছবিঃ স্বর্ণ চক্রবর্তী ও শ্রেয়সী চক্রবর্তী

তিতলির খাতা

স্বর্ণ চক্রবর্তী

ব্লু মরমন, ফটোঃ শ্রেয়সী চক্রবর্তী

উড়ে বেড়ানো রঙিন ফুলের মত পতঙ্গদের নাম প্রজাপতি এ কথা কে না জানে! কিন্তু আমাদের সবার যেমন পরিবার আছে, সেই পরিবারের চক্রবর্তী, সেন, মিত্র এমন সব নিজস্ব পদবী আছে আবার সেই সব পরিবারের আত্মীয়রা আছেন; ঠিক সেইরকম প্রজাপতিদের মধ্যেও নির্দিষ্ট পরিবার বা গোষ্ঠী (Group) আছে, সেই সব গোষ্ঠীর প্রজাপতিদের নির্দিষ্ট কিছু চিহ্ন এবং বৈশিষ্ট্যও আছে, যা দেখে তাদের আইডেন্টিফাই করা যায়। তেমনি এক গোষ্ঠী হল "প্যাপিলিওনিডি"; আর এই প্যাপিলিওনিডি পরিবারের প্রজাপতিদের নিয়েই সেজে উঠেছে এইবারের তিতলির খাতা।

কমন মাইম, ফটোঃ স্বর্ণ চক্রবর্তী

কমন রোজ, ফটোঃ স্বর্ণ চক্রবর্তী

প্যাপিলিওনিডি গোত্রের প্রজাপতিরা অসম্ভব উজ্জ্বল রং-বহুল, আর আকারেও সবচাইতে বড়। এদের ডানার মাপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২৫০ মিলিমিটার পর্যন্তও হতে পারে। এদের পিছনের ডানায় সরু লেজের মত একটা বাড়তি অংশ থাকে, ঠিক সোয়ালো পাখির লেজের মত দেখতে, তাই এই প্যাপিলিওনিডি দলের আরেকটা নাম হল 'সোয়ালো টেল'। সারা পৃথিবীতে এই প্রজাপতির সংখ্যা প্রায় ৭০০ মতো হলেও ভারতবর্ষে পাওয়া যায় এদের ১০৭টির মতো প্রজাতি, আর পশ্চিমবঙ্গে এখনো পর্যন্ত ৩৯টি সোয়ালো টেল প্রজাতির প্রজাপতির সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে থেকেই কয়েকজন এসেছে আজ তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। এইবারে তিতলির খাতা খুলে তাকিয়ে দেখো দেখি সোয়ালো টেল প্রজাপতিদের তোমার পড়ার টেবিলে উড়ে বেড়াতে দেখতে পাও কি না!

লাইম, ফটোঃ স্বর্ণ চক্রবর্তী

টেইলড জে, ফটোঃ স্বর্ণ চক্রবর্তী

তির্যক

লীলা রায়

ভিডিও লিঙ্কঃ

https://www.youtube.com/watch?v=7_dMdroz1Ps

এখানে যে পাখিটাকে তোমরা ডাকতে দেখছ, তার বাংলা নাম হল “ফটিকজল”। আর সারা বিশ্বের মানুষ একে চেনে “কমন ইয়োরা” (Common iora) নামে। আর এই যে হলুদ ছোট্ট পাখিটা পাখা ছড়িয়ে, পালক ফুলিয়ে ঠোঁট দিয়ে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে তুলছে, এই কাজটার পোষাকি নাম হল প্রিনিং।। তোমাদের জন্য এই সুন্দর ভিডিয়োটি বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের সবার প্রিয়, গুণী মানুষ, লীলাদি, যাঁর পরিচয় পরিচিতি-পত্রের তালিকা খুঁজলে সহজেই পেয়ে যাবে তোমরা।।

তোমরাও পারো এরকম ভিডিও বা ছবি তুলে আমাদের দফতরে পাঠাতে। পাঠাবে নাকি?

আমাদের কথা

'ম্যাজিক ল্যাম্প'-এর সব বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে প্রাণ এবং তার সংরক্ষণ বিষয়ক একটি বিভাগ থাকবে না, তাও কি সম্ভব? তাই বন্ধুরা আমাদের অতি প্রিয় এই নীল গ্রহের বুকে যেমন বহুরূপে, বহু রঙে প্রাণের সঞ্চার আমরা দেখতে পাই, তারই এক ঝলক নিয়ে এলাম তোমাদের কাছে এই 'বহুরূপী' বিভাগে। রঙিন এই বিভাগ ম্যাজিক ল্যাম্প-এর প্রতি সংখ্যাতেই নিজের রঙ বদলাবে ইচ্ছেমতন, পরিবেশের বন্ধু হয়ে ওঠার আন্তরিক তাগিদে। তা বলে বন্ধুরা চমকে যেও না কিন্তু; এই বিভাগ আসলে তোমাদেরই চিরচেনা বন্ধু 'বহুরূপী'।

আর এবার নিজেরাই পাতা উল্টে, থুড়ি, মাউস ক্লিক করে দেখে ফেলো তো কারা কারা অপেক্ষা করে আছে তোমাদের জন্য!

সবাইকে 'বহুরূপী'র তরফ থেকে উষ্ণ ভালোবাসা এবং রঙিন শরতী শুভেচ্ছা। আবার দেখা হবে আগামী সংখ্যায়।।

টাটাআআআআআ,

স্বর্ণ
মণিমালা
শ্রেয়সী ।।

ইতিহাস:: রাজকাহিনী::

সমুদ্রগুপ্তের খাতা

- আজকে জানবো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে নিয়ে কিছু কথা -

সমুদ্রগুপ্ত

আমি গুপ্ত বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট, সমুদ্রগুপ্ত। এক সময় শাসন করেছি সমগ্র উত্তর ভারত। দক্ষিণ ভারত জয় করলেও সেখানকার রাজাদের আনুগত্য লাভ করেই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। শাসন জারি করিনি। একজন যোদ্ধা, একজন কবি, একজন সঙ্গীতজ্ঞ।

একজন মানুষ যে নিজে হাতে অনেক যুদ্ধ করেছে, অনেক মানুষ মেরেছে সে কেমন করে কবিতা লিখতে পারে, আর কেমন করেই বা বীণা বাজাতে পারে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনার ঝড় বইয়ে দাও তোমরা। আমারও যে অস্বাভাবিক লাগে না তা নয়। আসলে একটা মানুষের দুটো সত্ত্বা থাকতেই পারে। ইচ্ছা করলেও আজ আর ফিরে আসতে পারব না, ঘোড়ার পিঠে চড়ে সমগ্র ভারত দাপিয়ে বেড়াতে পারব না। এক টুকরো অতীত হয়ে বেঁচে আছি তোমাদের ইতিহাস বইয়ের পাতায়।

আজ নিজের খাতার পাতা উল্টে আনতে চলেছি কিছু ঘটনা যা ঘটে গেছে বহুকাল আগে। কিছু জীবন যারা আমার মতই ইতিহাসে পাতায় এখনও বেঁচে রয়েছে। যতদিন ভারতভূমি থাকবে ততদিন তারাও এমনি করেই বেঁচে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। আজ বলছি সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কে নিয়ে কিছু কথা। কিছু জানা কিছু অজানা। সব কিছু কী জেনে ফেলা যায়? তাহলে তো অনুসন্ধান করার ইচ্ছাটুকুও থাকবে না, তাই থাকুক না, কিছুটা জানা কিছুটা অজানা!

সমস্ত ভারত কে সর্ব প্রথম ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। এর আগে কোনও ভারতীয় রাজা তা করে দেখাতে পারেননি। কী করেই বা পারবেন? সমগ্র উত্তর ভারত তখন ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত। এদের মধ্যে ষোলোটি রাজ্য বা মহাজনপদ সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ষোলোটির মধ্যে একটি রাজ্য ছিল দক্ষিন ভারতে। এদের নিজেদের মধ্যে সব সময় বিবাদ লেগেই থাকত। এক সময় মগধ অনান্য সব রাজ্য গুলোকে হারিয়ে সব চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর উত্থানের আগে মগধে ছিল নন্দ রাজাদের শাসন। শেষ নন্দ রাজা ধন নন্দের অত্যাচারে প্রজারা তখন অসহায়। ধননন্দের বিশাল এক সেনা বাহিনী ছিল। বিশাল এই বাহিনীর খরচ চালানোর জন্য খাজনার হার বাড়িয়ে দেওয়া হয়; যা মেটানো দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। খাজনা আদায়ের জন্য রাজা কর্মচারীরা অত্যাচার চালাত মানুষের ওপর। সেই সব নিপীড়িত নিরন্ন মানুষের জীবনে পরিত্রাতা হয়ে এসেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত।

তাঁর নামের পেছনে ‘মৌর্য’ কেন বসানো হয়েছিল তা নিয়ে আছে বহু মতভেদ, অনেক বিতর্ক। কেউ কেউ বলেন তাঁর মা অথবা মাতামহীর নাম ছিল মুরা। তিনি কোনও এক নন্দ রাজার দাসী ছিলেন। মুরা থেকেই মৌর্য কথাটি এসেছে।

কেউ আবার মনে করেন, মৌর্যরা ছিল আসলে ব্যাধ বা নিষাদ জাতীয় নীচু শ্রেণীর মানুষ। শিকারের সাথে সাথে নানা রকম পশু পাখিও তারা পুষত। বিশেষ করে ময়ূর তারা খুব ভালোবাসত। ময়ূর থেকেও মৌর্য কথাটি আসতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। আর একটি মত বলছে, নেপালের পাদদেশে পীপ্পলিবন নামক এলাকার মোরীয় ক্ষত্রিয়কূলের সন্তান ছিলেন তিনি। মোরীয় থেকে মৌর্য কথার উৎপত্তি। তাঁর বাল্য জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। সবটাই জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী। তিনি না ক্ষত্রিয় না শুদ্র তা নিয়ে রয়েছে অনেক বিতর্ক।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে তাঁর জীবনী ও শাসন কাল সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা, স্ট্রাবো, ডিওডোরাস, প্লুটার্ক, জাস্টিন প্রমুখের রচনা থেকেও মৌর্য রাজবংশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ল্যাটিন ও গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনায় রচনায় তিনি সন্দ্রকোত্তাস এবং অ্যান্ড্রকোত্তাস নামে পরিচিত (Sandrokottos and Androcottus) ।

চন্দ্রগুপ্ত নাকি প্রথম জীবনে রাজা ধননন্দের সৈন্য বিভাগে এক গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। কোনও কারণে তিনি সম্রাটের বিরাগ-ভাজন হন। ধননন্দ তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছেন জানতে পেরে তিনি মগধ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন এক রাতের আঁধারে।

গ্রীকবীর আলেকজান্ডার তখন ভারতে। ভারত জয়ের স্বপ্ন নিয়ে তিনি সুদূর গ্রীস থেকে চলে এসেছেন। হিদাস্পিসের যুদ্ধে তিনি পুরু কে পরাজিত করেছেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর কাছে সাহায্য লাভের আশায় গ্রীক শিবিরে

এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু আলেকজান্ডার তাঁকে বন্দি করে হত্যা করার নির্দেশ দিলে তিনি সুকৌশলে শিবির ছেড়ে পালিয়ে যান।

ভাগ্য তাঁর সহায় ছিল তাই অনেক বার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। এর পর তাঁর সাথে দেখা হয় চাণক্য বা কৌটিল্যের সাথে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি গল্প শোনা যায়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মায়ের সাথে পাটলিপুত্রে (মগধের রাজধানী) আসেন। তখন তিনি নিতান্তই শিশু। শিশুর দেখা শোনা করার জন্য মা তাঁকে এক রাখালের কাছে রাখেন। তিনি নিজে নন্দ রাজপরিবারে কাজ করতেন।

পরে সেই রাখাল; বালক চন্দ্রগুপ্ত কে এক শিকারীর কাছে বিক্রি করে দেয়। সেই শিকারী তাঁকে রাখালের কাজ দেয়। এক সময় চাণক্য''র সাথে চন্দ্রগুপ্তর দেখা হয়। চাণক্য তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন রাজচক্রবর্তী লক্ষণ। এক দুপুরে গাছের তলায় বালক চন্দ্রগুপ্ত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঠিক তাঁর মাথার কাছে ফণা ধরে ছিল একটি সাপ। এটাই হল রাজ চক্রবর্তী লক্ষণ। চাণক্য ঠিক সেই সময় ঐ রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সাপটি কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে চলে যায়। বালকের সাথে আলাপ করেন চাণক্য। বুঝতে পারলেন যে এই বালকের মধ্যে লুকিয়ে আছে অসামান্য শক্তি আর বিরল প্রতিভা। তবে এই কাহিনীর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

ছোট্ট চন্দ্রগুপ্ত কে সেই শিকারীর কাছ থেকে কিনে নিলেন কৌটিল্য। তক্ষশিলায় তাঁকে নিয়ে আসেন এবং লেখাপড়ার পাশাপাশি যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলেন। উচ্চশিক্ষার জন্য চন্দ্রগুপ্তকে পাটলীপুত্রে পাঠান।

চন্দ্রগুপ্তকে গড়ে তোলার পেছনে চাণক্যেরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ছিলেন ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন এক তেজস্বী মানুষ। সন্ন্যাসী চাণকের পরিবারে জন্মেছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় চাণক্য। তাঁর অপর নাম ছিল কৌটিল্য। বিষ্ণুগুপ্ত নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

এক সময় তিনি অপমানিত হয়েছিলেন ধননন্দের কাছে। তাঁর শিখা কেটে দেওয়া হয়েছিল যা ছিল ব্রাহ্মণদের কাছে অত্যান্ত অপমানজনক। তাঁরঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল নন্দরাজার সেনারা। এই স্পষ্টবাদী মানুষটিকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছিলেন ধননন্দ। চাণক্য তখন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি এই অত্যাচারী রাজাকে মগধ থেকে তাড়াবেন। এই অপমানের যোগ্য জবাব দেবেন। মগধের প্রজাদের রক্ষা করবেন। তাই চন্দ্রগুপ্তের পেছনে ছিল মগধ এর প্রজাদের অকুণ্ঠ সমর্থন। নিজেদের একটা সৈন্য বাহিনী গড়ে তুলতেও বিশেষ অসুবিধা হয় নি। নিপীড়িত কৃষকরাও চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনী তে যোগ দিয়েছিল। তাঁদের প্রথম দুটি চেষ্টা সফল হয়নি, তবে তৃতীয় বার তাঁরা সফল হলেন। 'মিলিন্দ-পঞ্চহো' নামক গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিবরণ আছে। জানা যায় যে, এই যুদ্ধে ১০ হাজার হাতি, ১ লক্ষ অশ্বারোহী ও ৫ হাজার রথ চালক নিহত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র নগর অবরোধ করলে ধননন্দ আত্মসমর্পণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত ধননন্দকে প্রাণে মারেননি, শুধু তাঁর রাজত্ব কেড়ে

নেন। ধননন্দকে তাঁর দুই রাণি ও সামান্য কিছু আসবাবপত্র সহ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে দিয়েছিলেন। তবে 'মহাবংশটীকা' গ্রন্থে আছে যে এই যুদ্ধে ধননন্দ নিহত হন।

মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হল মৌর্য বংশ। মগধের সাধারণ মানুষ ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চাণক্য হলেন প্রধানমন্ত্রী। চাণক্যর পরামর্শ মেনেই চন্দ্রগুপ্ত রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি ৩২৪ থেকে ৩২৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে সিংহাসনে বসেন। ৩০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল বিদেশী গ্রীক দের আক্রমণ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করা। আলেকজান্ডারের সেনাপতি ও সিরিয়ার অধীশ্বর সেলুকাস ভারতে গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপনের আশায় ভারত আক্রমণ করেন। এর আগে আলেকজান্ডার ও একই কারণে ভারত আক্রমণ করেছিলেন। পশ্চিম ভারতে কিছু গ্রীক উপনিবেশ তৈরি হয়ে গেছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিজিত রাজ্য গুলি ভাগ হয়ে যায় তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে। ভারতে গ্রীকদের জয় করা অঞ্চলগুলির ওপর পুনরায় আধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন সেলুকাস। চন্দ্রগুপ্ত'র সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন সেলুকাস।

তবে এই যুদ্ধ আদৌ হয়েছিল কি না তা নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে। সন্ধির শর্তানুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাস কে দিলেন ৫০০ হাতি প্রদান করেন। বিনিময়ে কাবুল, কান্দাহার, বেলুচিস্থান ও হীরাট প্রদেশ লাভ করেন সেলুকাসের থেকে। এখানেই শেষ নয়, সেলুকাসের কন্যা হেলেন কে বিবাহ করেন চন্দ্রগুপ্ত। অনেকে অবশ্য মনে করেন বিয়েটা হয়েছিল তাঁর পুত্র বিন্দুসারের সঙ্গে। এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে তিনি ব্রাম্ভন ছিলেন না। গ্রীকদের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে ভারত থেকে গ্রীক আক্রমণের সম্ভাবনা দূর করেন চিরদিনের জন্য।

সেলুকাস পরে মেগাস্থিনিস নামে এক রাজদূতকে তাঁর সভায় পাঠিয়েছিলেন। মেগাস্থিনিস ভারতে কিছুদিন ছিলেন , ভারত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন 'ইন্ডিকা' নামক বইটিতে।

চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কিছু ঘটনার কথা বলা যাক। যার সত্যতা নিয়েও অনেক মতভেদ রয়ে গেছে। একবার ধননন্দের এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষস পরিকল্পনা করেন তাঁকে হত্যা করার। এটা তাঁর রাজত্বের প্রথমদিককার ঘটনা। সম্রাট তখন অসুস্থ ছিলেন। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের রাজবৈদ্যকে হাত করেন। সম্রাটকে ওষুধের পরিবর্তে বিষ দিতে যাচ্ছিল সেই বৈদ্য। চাণক্য সেই সময় উপস্থিত হয়ে বলেন, "রাজা কারোর দেওয়া পানীয় বা খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন না। আপনি যে ওষুধ মহারাজকে দিতে চলেছেন তার কিছু অংশ আগে আপনি নিজে গ্রহণ করুন"। সেই বৈদ্য বাধ্য হয়ে ওষুধের একটু অংশ জিভে ঠেকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার বেশ কিছু পরিকল্পনা করলেও তা সফল হয়নি। বিশাখদত্তের লেখা 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক থেকে এই বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

চাণক্য আরও একবার চন্দ্রগুপ্তের জীবন রক্ষা করেছিলেন। প্রথমবার নন্দ রাজাদের প্রাসাদে যখন যান তখন তিনি বিপদের সন্মুখীন হন। প্রাসাদের মেঝেয় ছোট্ট একটা ফাটল। ভেতর থেকে আসছে লাল পিঁপড়ের সারি।

তাদের মুখে খাদ্যের কণা। চাণক্য বুঝে গেলেন যে প্রাসাদের মেঝের তলায় পাতালে একটি গুপ্ত কক্ষ আছে বাইরে থেকে যা দেখা যায় না। চাণক্যর অনুমান সঠিক ছিল। সেই ঘরটিতে অপেক্ষা করছিল ধন নন্দের কিছু পোষা সৈন্য। চন্দ্রগুপ্ত কে নিয়ে চাণক্য প্রাসাদের বাইরে চলে আসেন, আর নির্দেশ দিলেন প্রাসাদটি কে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে।

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন। একবার ভুল বোঝাবুঝি হয় দুজনের মধ্যে। চাণক্য চলে যান চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে। চন্দ্রগুপ্ত ক্ষমা চেয়ে পুনরায় চাণক্য কে ফিরিয়ে আনেন নিজের সভায়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শুধু সাম্রাজ্য বিজেতাই ছিলেন না। ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। বিশাল এক সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলেন। ছদ্মবেশে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াতেন। প্রজারা ভালো আছে কি না জানার জন্য। তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না। প্রত্যেক দিন আলাদা ঘরে ঘুমাতেন। নির্দিষ্ট কোনও ঘর রাখেননি নিরাপত্তার জন্য। তাঁর সিংহাসন ত্যাগের পর পুত্র বিন্দুসার 'অমিত্রাঘাত' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। অশোকের পিতা ছিলেন বিন্দুসার। শেষ জীবনে চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। মহীশুরের শ্রাবণবেলগোলা নামক স্থানে প্রায়োপবেশনে (মৃত্যু কামনায় যে উপবাস করা হয়) দেহ ত্যাগ করেন।

৩২৪ থেকে ৩২৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। ২৯৮ থেকে ২৯৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। উত্তরে পারস্যের সীমানা থেকে দক্ষিণে মহীশুর এবং পূর্বে বাংলা থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত এক

বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে ভারতবাসী কে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। তিনিই রাজচক্রবর্তী সম্রাটের উপাধি লাভ করেছিলেন (চক্রবর্তী অর্থাৎ অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি)।

পরবর্তী অনেক রাজাই তাঁর শাসন ব্যবস্থার কিছু দিক অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরই নাতি সম্রাট অশোক পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর কথাতেও আসব আমরা।

আমি সমুদ্রগুপ্ত খাতার পাতা এখানেই বন্ধ করছি; আবার ফিরে আসব আরও এক দিন আরও একজনকে নিয়ে। অতীত এর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে তুলে আনবো কিছু মণি-মুক্তো। থাকবে কিছু নিজের কথাও। ততদিন তোমরা ভালো থেকো আর ইতিহাসকে ভালোবেসো।

সহেলী চট্টোপাধ্যায়

ছবি – ১। তন্ময় বিশ্বাস (অলঙ্করণ) ২। গুগলের সৌজন্যে

[তথ্যসূত্রঃ অধ্যাপক ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক চক্রবর্তী (ভারতের ইতিহাস) অধ্যাপক অতুল চন্দ্র রায় এবং প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় (ভারতের ইতিহাস ১ খন্ড) এবং প্রচলিত কিছু জনশ্রুতি]

ইতিহাস:: রাজকাহিনী::

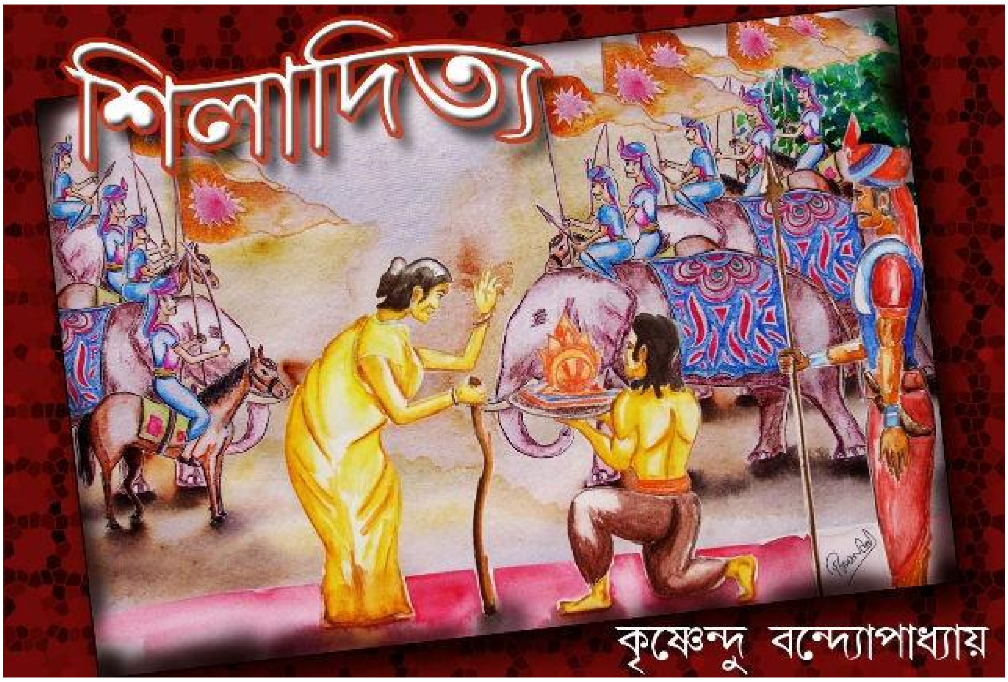

স্থানটি বড়ো মনোরম। তিনদিক থেকে তিনটি নদী এসে এখানে মিলিত হয়েছে। গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী। এই তিন নদীর বারিধারা তিন বর্ণের। অথচ এই মহাসঙ্গমে এসে তারা একসঙ্গে মিলে গিয়ে সৃষ্টি করেছে একটিই বর্ণ। যেন তিনটি বাদ্যযন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন শব্দতরঙ্গ মিলিয়ে মিশিয়ে সৃষ্টি করে চলেছে একই ঐকতান, একই সুরমূর্চ্ছনা।

এই স্থানের নাম প্রয়াগ। আর এই প্রয়াগের সঙ্গমস্থলেই আজ চলছে সাজো সাজো রব। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা আর মানুষের কলরবে চারিদিক মুখরিত। ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠছে তূরী ও ভেরী। দামামার শব্দে চারিদিক সচকিত। জনাকীর্ণ প্রান্তরের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র রক্ষীপ্রহরা। পদস্থ রাজকর্মচারীদের দ্রুত পদচারণা। আর তারই মধ্যে অতি সাধারণ দুঃস্থ জনগণের বিস্মিত জমায়েত। সব মিলিয়ে এ এক মহামেলা। দানধ্যানের এক পুণ্য উৎসব। এক ঐতিহাসিক মহাসঙ্গম।

গত পঁচাত্তর দিন ধরে এ মেলা চলছে। ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ তাঁদের আকাঙ্ক্ষার পাত্র পূর্ণ করে ফিরে গেছেন যে যার দেশে। আজ এই অন্তিম দিবসে শুধু অবশিষ্ট আছেন আরো কিছু মানুষ, যাঁরা ঐ দারুনির্মিত দানমঞ্চের অদূরে রজ্জুর সীমানার বাইরে প্রতীক্ষারত। এই মাত্র কয়েকশত মানুষের দানপ্রাপ্তির মধ্য দিয়েই এবারের মতো শেষ হবে এই দানের উৎসব। সমাপ্তি ঘটবে দীর্ঘ আড়াই মাস ব্যাপী এই পঞ্চবার্ষিকী মেলার।

হ্যাঁ। এরকমই হয়ে আসছে বিগত বেশ কিছুকাল। গোটা আর্যাবর্তের মানুষ এখন জেনে গেছেন যে, প্রয়াগের তীরে এই পুণ্যভূমিতে তিনি আসবেন প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার, আয়োজন হবে এই বিশাল উৎসবের, আর সেই পাঁচ বৎসরে অর্জিত তাঁর যাবতীয় নিজস্ব সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে তিনি ফিরে যাবেন তাঁর রাজধানী কনৌজে, শুরু করবেন আবার তাঁর রাজার ভূমিকা, একেবারে শূন্য থেকে।

সেই আয়োজনই চলছে এখন। সঙ্গমের তীরে সাময়িকভাবে তৈরী করা বিশাল গৃহগুলির অভ্যন্তরে স্তূপীকৃত ছিল যে রাশি রাশি স্বর্ণ, রৌপ্য, মহার্ঘ পোশাক-পরিচ্ছদ আর খাদ্যসামগ্রী, তা এখন প্রায় নিঃশেষ। সামান্য কিছু যা অবশিষ্ট আছে, সেগুলি এই মুহূর্তে জমায়েত করা চলছে ঐ দানমঞ্চের উপর। আজ স্বহস্তে সেগুলি বিতরণ করে নিঃস্ব, রিক্ত, কপর্দকশূন্য হয়ে ফিরে যাবেন সেই রাজা, পুষ্যভূতি বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট, রাজা প্রভাকরবর্ধনের সুযোগ্য পুত্র সম্রাট হর্ষবর্ধন।

সহসা উচ্চনাদে বেজে উঠলো ভেরী। রক্ষীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল দুইভাগে বিভক্ত হয়ে। অদূরে স্কন্ধাবারের সামনে যেন সহসা জেগে উঠলো চাঞ্চল্য। সম্রাট হর্ষবর্ধন অবিচলিত পদক্ষেপে স্কন্ধাবার থেকে বেরিয়ে এলেন। হর্ষধ্বনি জেগে উঠলো জনতার মধ্যে। সম্রাট এগিয়ে চললেন মঞ্চের দিকে। সঙ্গে রয়েছেন রাজমহিষী এবং রাজভগ্নী। আর তাঁদের অনুগমন করছেন সম্রাটের অনুগত বিভিন্ন প্রদেশের রাজারা।

দানসামগ্রী প্রস্তুত। মঞ্চে আরোহণ করে সম্রাট তাকালেন পার্শ্ববর্তী ময়দানের দিকে। সেখানে পাশাপাশি তিনটি স্বর্ণমূর্তি রক্ষিত। বুদ্ধমূর্তি, সূর্যমূর্তি ও মহাদেবের মূর্তি। সম্রাটের আরাধ্য তিন দেবতা। মেলার প্রথম তিন দিন পর্যায়ক্রমে ঐ তিন মূর্তিপূজার মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল উৎসবের প্রস্তুতি। প্রতিদিনের মতো আজও তাই নতমস্তকে সেই দেবতাদের চরণে প্রণতি জানালেন সম্রাট। বেজে উঠলো শঙ্খধ্বনি। শুরু হল ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী মেলার সমাপ্তি উৎসব।

\# \# \# \# \#

বেলা দ্বিপ্রহর। শ্রান্ত, ক্লান্ত সম্রাটের ভান্ডার অবশেষে শূন্য হল। শেষ প্রার্থীর হাতে সম্রাট তুলে দিলেন তাঁর শেষ দান – একটি স্বর্ণদন্ড। এটি হাতে নিয়েই সম্রাট বিচারসভা পরিচালনা করতেন। শুধু দন্ড নয়, এটি তাঁর মনোবল ও বীরত্বের পরিচায়কও বটে। অথচ কি আশ্চর্য, তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ সেই রাজদন্ড এক সম্পূর্ণ অপরিচিতের হাতে তুলে দিয়েও তাঁর চিত্ত অকুণ্ঠ, হাসি অমলিন! তাকালেন পার্শ্বে দন্ডায়মান রাণী দুর্গাবতীর দিকে। তাঁর মুখেও খেলে গেল এক রহস্যময় হাসি। উজ্জ্বল দুটি চোখের ভাষা যেন কথা বলে উঠল। তিনি যে বহুদিন ধরে মহারাজকে চেনেন! সম্রাটের এই সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হবার আনন্দের তিনিও যে এক অংশীদার!

সহসা সম্মুখে রক্ষীপ্রহরার মধ্যে একটা কোলাহল। রাজা দৃষ্টি প্রসারিত করলেন।

প্রার্থী জনতার দল এখন আর নেই। শুধু রজ্জুসীমানা পেরিয়ে এগিয়ে আসতে চায় এক অশীতিপর বৃদ্ধা, কিন্তু রক্ষীদের বাধা পেরিয়ে একবিন্দুও অগ্রসর হতে পারে না। রক্ষীরা জানে, দানধ্যানের পালা সমাপ্ত, তাই সেনাধ্যক্ষের নির্দেশে তারা আর কাউকে রজ্জুসীমানায় প্রবেশ করতে দেবে না।

রাজার ইঙ্গিতে সরিয়ে নেওয়া হল বাধা। অতিকষ্টে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধা। কিন্তু লোলচর্ম সেই বৃদ্ধার আকুতি শুনে সম্রাট বিব্রত, বিপর্যস্ত। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছে এই দীনদরিদ্র, অসহায় নারী, সার্বভৌম সম্রাটের কাছ থেকে সামান্য কিছু পাবার আশায়।

কী করবেন এখন সম্রাট? কুণ্ঠিত নতমুখে চিন্তা করেন কিছু সময়। তারপর সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর চোখ। ভগ্নী রাজ্যশ্রীর দিকে ফিরে অনুচ্চস্বরে কিছু বলেন। আর এরপরেই দেখা যায় এক আশ্চর্য দৃশ্য। ভগ্নীর হাত থেকে নিয়ে অতি সাধারণ এক বস্ত্র পরিধান ক'রে সম্রাট তাঁর নিজের রাজবেশ ও উত্তরীয় সযত্নে তুলে দেন বৃদ্ধার হাতে। মুহূর্তে তূরী-ভেরী-দামামার জয়নাদে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আকাশ বাতাস মুখরিত হয় সমবেত প্রজাদের জয়ধ্বনিতে – 'জয়তু সম্রাট! চিরং জীবতু সম্রাট!! জয় সম্রাট হর্ষবর্ধনের জয়!!'

\# # # # #

এই হলেন হর্ষবর্ধন। দানবীর, প্রজাপালক, সুশাসক সম্রাট হর্ষবর্ধন। ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। ৬০৬ থেকে ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ, এই সুদীর্ঘ ৪১ বৎসর তিনি সুনামের সঙ্গে রাজত্ব করেছেন গোটা উত্তর ভারত জুড়ে। শাসক হিসেবে, রাজা হিসেবে তিনি যে অনন্য, তার পরিচয় তাঁর ১,০০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য আর ৬০,০০০ হস্তীবাহিনীর বিশালত্বে। এমনকি জীবদ্দশায় তাঁর রাজধানী কনৌজ হয়ে উঠেছিল উত্তর ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

আবার এরই পাশাপাশি যখন জানা যায়, এই রাজাধিরাজ সম্রাটের হাতেই সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃত নাটক 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী' আর 'প্রিয়দর্শিকা', তখন এক বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় মন। একজন মাত্র মানুষের পক্ষে এ কি করে সম্ভব?

তাই তো তাঁরই সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' কিংবা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-য়ের ভ্রমণকাহিনী তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ভারত ইতিহাসের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে – রাজ্যশাসনে, প্রজাপালনে, দানধ্যানে ও বীরত্বে যাঁর তুলনা একমাত্র তিনি স্বয়ং – মহামহিম সম্রাট, শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন।

ছবি - পুষ্পেন মন্ডল

মেঘের শহর মাচুপিচু

রুদ্র সেন

দক্ষিন আমেরিকা যা কিনা ল্যাটিন আমেরিকা নামে ও পরিচিত সেখানেই বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতমালা অ্যান্ডিজের দর্প কে চূর্ণ করে গড়ে উঠেছিল একটি সভ্যতা, যাকে আমরা ইনকা সভ্যতা বলে থাকি। আজ থেকে ৬৫০ বছর আগে দক্ষিন আমেরিকার বিভিন্ন ছোটো বড় জনজাতিদের নিয়ে এক ছাতার তলায় ইনকারা গড়ে তুলেছিল এক অত্যাশ্চর্য সভ্যতাকে যা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র একশ''র কিছু বেশি বছর। কিন্তু এর মধ্যেই তাদের গৌরব কিছু কম ছিল না। শিল্প সংস্কৃতি আর যুদ্ধ কৌশলে অপরাজেয় ছিল তারা। বর্তমানে কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা আর চিলির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল দক্ষিন আমেরিকার সর্ব বৃহৎ সভ্যতা যা রোমান সাম্রাজ্যের চেয়ে আয়তনে কিছু কম ছিল না।

ইনকারা বিশ্বাস করত ভিরাকোচা বলে একজন দেবতা বিশ্বব্যাপী বন্যার হাত থেকে পৃথিবী কে রক্ষা করে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন ইনকাদের। তাই তারা ভিরাকোচা আর সূর্য দেব ইনতি কে প্রধান দেবতা বলে পুজো করত। এছাড়া ও ছিল অনেক দেবতা যারা চন্দ্র, পাহাড়, নদী, হ্রদ, বজ্র ইত্যাদির মাধ্যমে পূজিত হতেন। ইনকাদের নির্বাচিত রাজাকেও তারা দেবতা জ্ঞানে পুজো করত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল তারা না জানত লোহার ব্যাবহার, না জানত চাকা কি জিনিস! তাদের নিজস্ব কোনো লিপি পর্যন্ত ছিল না। ছিল শুধু কিপু বলে দড়ির মত একরকম জিনিস। এতে ফাঁস পড়িয়ে তারা বিভিন্ন বিষয়ের খবর দূত মারফত আদান প্রদান করতে পারত। এক একটা ফাঁসের এক এক রকম অর্থ থাকত যা শুধু ওরাই বুঝতে পারত। সংবাদ

আদান প্রদানের এক অদ্ভুত কৌশল, অনেক জায়গায় আদিবাসীরা মেসেজ আদান প্রদান করে ঢাক বাজিয়ে, অর্থাৎ এক প্রকার সাংকেতিক ভাষার সাহায্য নিত।

কিন্তু এতো কিছুর পর ও স্প্যানিশ সাম্রাজ্যবাদী দের আক্রমণ তারা ঠেকাতে পারেনি। স্প্যানিশদের লোহার অস্ত্র আর ঘোড়ার মোকাবিলা করার মত যুদ্ধগত যোগ্যতা তাদের ছিল না। এরপর নৃশংস ভাবে শেষ ইনকারাজ আতাহুয়ালাপা কে হত্যা করা হয়। অবশিষ্ট ইনকারা জঙ্গল কিংবা অ্যাণ্ডিজের আরও উঁচু স্থানে পালিয়ে জীবন বাঁচায়।

কালের অমোঘ নিয়মে যদিও ইনকারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু থেকে যায় তাদের কীর্তি। যুগে যুগে বিভিন্ন অভিযাত্রী আর স্বর্ণলোভীর দল দক্ষিন আমেরিকার বিভিন্ন জঙ্গল আর পার্বত্য অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ইনকাদের হারিয়ে যাওয়া শহরের সন্ধান পায়নি। সোনার শহর "এল ডোরাডো"র জনশ্রুতি চালু হয়। এই নিয়ে প্রচুর গল্প কাহিনী আমাদের দেশে ও তৈরি হয়েছে। যা আমাদের বাংলা সাহিত্যকে অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে বিশেষ করে বাংলা কিশোর সাহিত্যকে।

এমনই একজন অভিযাত্রী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শখের পুরাতাত্ত্বিক হিরাম বিংহ্যাম খোঁজ চালাচ্ছিলেন। ইনকাদের শেষ আশ্রয় ভিলাকাবাম্বার। পেরুর বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে চলছিল তাঁর অভিযান। নিজের দেশ, স্ত্রী, সন্তানকে ছেড়ে চালানো সেই অভিযানে এক সময় তাঁর নৈরাশ্য আসছিল। সেই হারিয়ে যাওয়া শহরের সন্ধান তখন ও পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কাছে আতিথ্য গ্রহন কালে তিনি জানতে পারেন পাশের একটি পাহাড়ের মাথায় নাকি একটি ছোটো পরিত্যাক্ত পাথরের শহর রয়েছে। কিন্তু তা গভীর জঙ্গলে ঢাকা। কাঠ সংগ্রহকারীরা সেই স্থানের কথা বলেছিল, কিন্তু তেমন ভাবে অভিযান সম্ভব হয়নি। ১৯১১ সালের ২৪ শে জুলাই স্থানীয় একটি কৃষক ছেলে কে নিয়ে তিনি হাজির হলেন পাহাড়ের ওপর সেই পরিত্যাক্ত শহরে। জঙ্গলে ঢাকা সেই জায়গায় বেশ কিছু পাথরের বাড়িও চোখে পড়ল কিন্তু হিরাম তখন ও ভিলাকাবাম্বার মোহে আচ্ছন্ন তাই তিনি যে কিসের সন্ধান সেদিন মানব সমাজ কে দিলেন তার ধারণা হয়ত সেদিন সম্ভব ছিল না। তাই জঙ্গল পরিস্কারের নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন ভিলাকাবাম্বার সন্ধানে। ১৯১২ সালে তিনি যখন আবার ফিরলেন তখন ঝোপ ঝাড়ের ভিতর থেকে বেড়িয়ে আসা একটা আস্ত শহর ঝলমল করছিল। রোদ আর মেঘের সাথে যে কিনা যুগ যুগ ধরে খেলে এসেছে। ইনকাদের একদম নাম না জানা হারিয়ে যাওয়া শহর "মাচুপিচু"।

কী জন্য নির্মিত হয়েছিল এত দুর্গম জায়গায় সেই মেঘের কোলের শহর আর কী ভাবেই বা তা স্প্যানিশ হানাদার বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যায় তা নিয়ে এখন ও ধন্দের অবসান হয়নি। রিও ভিলকানোটা বা উরুবাম্বা নদীর ধার ঘেঁষে উঠে যাওয়া একটি পাহাড়ের মাথায় শুধু মাত্র পাথর দিয়ে এমন একটি শহর কী ভাবে বানানো সম্ভব হল তা ভাবলে আজও অবাক হতে হয়, যেখানে ইনকারা লোহা বা চাকার ব্যবহার পর্যন্ত জানত না! পুরাতাত্ত্বিকদের মতে আনুমানিক ১৪৫০ খ্রীস্টাব্দে ইনকারাজ পাচাকুটির নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল এই শৈল শহর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৪৩০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। মানুষের অদম্য ইচ্ছা আর কায়িক

পরিশ্রমের কাছে প্রকৃতিও হার মানতে বাধ্য হয়েছিল যে দিন সম্পন্ন হয়েছিল এর নির্মাণ কাজ। কী ছিল না সেই শহরে! চাষের জন্য পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি বানিয়ে ফসল ফলানোর ব্যাবস্থা। উন্নত নিকাশ ব্যাবস্থা, বৃষ্টির জল কে ধরে রেখে তা দিয়ে প্রতিদিনের কাজ চালানো সমেত অন্য কিছু। এ ছাড়াও সূর্য দেব ইনতির জন্য মন্দির, রাজ নিবাস , শস্য সংরক্ষণের ব্যাবস্থা সমেত আধুনিক নগর জীবনের সব উপকরণ।

পাথরের তৈরি এই শহরের প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে মত বিরোধ থাকলেও মনে করা হয় রাজার প্রমোদ নিবাস বা সূর্য দেব ইনতি কে উৎসর্গ করে নির্মিত হয়েছিল এটি। তবে অনেকেই মনে করেন শত্রু আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ও নির্মিত হয়ে থাকতে পারে এই শহর। স্প্যানিশ দের বিবরণ থেকে অদ্ভুত ভাবে বাদ পড়ে গেছে এমন একটি অনুপম স্থাপত্যের প্রসঙ্গ। মনে করা হয় কুঝকোতে ইনকা দের রাজধানীর পতন আর তাদের সাম্রাজ্যের পতনের পরে মাচুপিচুর অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব ছিল না কারন তখন তা রাজ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। তাই ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে মাচুপিচু পুরোপুরি পরিত্যাক্ত হয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

আজও পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সুন্দর শহরের মর্যাদা পেয়ে চলেছে স্বর্গের কাছাকাছি এই শহরটি। এবং ইউনেস্কো একে ওয়াল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদাও দিয়েছে। প্রতি বছর অগণিত পর্যটক হ্যিরাম বিংহ্যাম হাইওয়ে ধরে পৌঁছে যান মাচুপিচুকে দেখতে। যা পেরুর পর্যটনে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ভ্রমণ::

ডুয়ার্সের ডায়েরী

সহেলী চট্টোপাধ্যায়

১৩।৩।১৫

মাদারিহাটের একটা সুন্দর কটেজে বসে বসে ডায়েরী লিখছি। এখন রাত নেমে এসেছে। টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে কটেজের ভেতর। আলো বেশ কম, এটাই যা অসুবিধে। ঠাণ্ডাটা কলকাতার চেয়ে একটু বেশি। গতরাতেই একপশলা ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি। গত রাতে নাকি একটা হাতি আমাদের কটেজের সামনে চলে এসেছিল। একটা মাধবীলতার ঝাড় শুয়ে পড়েছে তবে সেটা ঝড়ের জন্যও হতে পারে। কটেজের দোতলায় চেয়ার বা দোলনায় বসে সারা বিশ্ব সংসার ভুলে থাকা যায়। আমরা কয়েকজন মিলে বেরিয়ে পড়েছি তরাইয়ের পথে। উত্তরবঙ্গের সাথে আমার পরিচয় অর্জুনের সাথে। সমরেশ মজুমদারের অর্জুন। সেই সেবক রোড, তিস্তা ব্রিজ, চিলাপাতার জঙ্গল, হাসিমারা, গরুমারা, বেলাকোবা, ফালাকাটা, গয়েরকাটা, চাপড়ামাড়ি, লাটাগুড়ি, হলং। এই সব নামের সাথে পরিচয় বহুদিন ধরে। ছোটোবেলায় একবার আলিপুরদুয়ার এসেছিলাম। অর্জুনের বইগুলো পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আমি নিজেও যেন উত্তরবঙ্গেরই মানুষ। কলকাতার নয়। উত্তরবঙ্গকে প্রকৃতি সাজিয়েছে অঢেল সম্পদ দিয়ে আর স্নেহ দিয়ে। তবে এখানকার জীবনযাত্রায় ভয় ও আছে। এক কথায় বলা যায় ভয়ঙ্কর সুন্দর।

তিস্তা-তোরসা ধরে এসেছি। ফালাকাটায় নেমেছি সকাল সকাল। সেখান থেকে প্রাইভেট কারে এই মাদারিহাটের কটেজ। এখানে কিছুক্ষণের রেস্ট নিয়ে পাড়ি দিলাম কোচবিহার রাজবাড়ির উদ্দেশে। পথে পড়ল চা বাগান আর ঘন জঙ্গল। সূর্য ও এই ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করতে ভয় পায় হয়ত, তাই বিশাল এক ছাতার তলা দিয়ে যাচ্ছি মনে হল। অরণ্যের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। বুনো অথচ মিষ্টি। কেমন ভিজে ভিজে জঙ্গুলে একটা গন্ধ। এই জঙ্গলের নাম চিলাপাতার জঙ্গল। ভেতর থেকে অবিরাম একটা পোকা ডেকে চলেছে। ঠিক ঝিন ঝিন করে ডাকছে খুব তীক্ষ্ণ শব্দ। এই পোকা গুলোর ডানা থেকে এমন শব্দ হয় শুনলাম।

পথে চলতে চলতে

উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসলে কোচবিহার রাজবাড়ি দেখতে ভুলো না। ইউরোপের রেনেসাঁর যুগে চলে এসেছি বলে মনে হতে পারে। বাইরে ছবি তুলতে পারলেও ভেতরে তোলা যাবে না। টিকিটের দাম পাঁচ টাকা। শুক্রবার এখানে সংগ্রহশালা বন্ধ থাকে। ভেতরটায় ঢুকলে তাক লেগে যায়। রোমের বিখ্যাত চার্চ এর মধ্যে ঢুকে পড়েছি বলে মনে হয়। ভেতরে রাজপরিবারের লোকেদের ছবি আছে, তাদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র আছে। গায়ত্রী দেবী, সুনীতি দেবীর ছবি আছে। সুনীতি দেবী বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রী কেশব সেনের কন্যা। এছাড়াও কোচবিহার সম্পর্কে আরও বহু তথ্য পাবে। পাল যুগে তৈরি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, তাম্রফলক, উপজাতিদের শ্রেণীবিভাগ, তাদের ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা, পোশাকআশাক, লৌকিক আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কেও বহু মূল্যবান তথ্য সংরক্ষিত আছে। অবাক লাগে যে টোটো জনগোষ্ঠীর লোকেরাও মা বিষহরির পুজো করেন। আমরা যেমন মা মনসার পুজো করি সাপের ভয় থেকে বাঁচার জন্য। তেমনই শিব, সূর্য, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, বাগদেবীর পুজো ওরাও করেন। তারা নামে এক বৌদ্ধ হিন্দু দেবীরও আরাধনা করা হয়। এখানে দুর্গার একটা আলাদা নাম আছে, মহিষমর্দিনী। বিভিন্ন রকমের মুখোশের সংগ্রহ আছে। মিউজিয়াম দেখা হয়ে গেলে মদনমোহন-কে দর্শন করতে যেও। মন্দিরে মা কালী আর মা মহিষমর্দিনীও পূজিতা হন। মাদারিহাট থেকে কোচবিহার রাজবাড়ি প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূর হলেও জার্নির কষ্ট গায়ে লাগে না পরিবেশের গুণে। ফেরার পথে আবার সেই চিলাপাতার জঙ্গল। দু'ধারে তাকাতে তাকাতে যেও, বলা যায় না কখন আবার হাতি বেরিয়ে পড়ে। তবে বাঁদর অনেক দেখা যায়। ফিরে এসে লাঞ্চ সেরে ঘুমিয়ে

পরেছিলাম। বিকেলে একটু হাঁটাহাঁটি। এখন সন্ধে হয়ে গেছে। অবশ্য এখানে সন্ধে নামে না, একেবারে রাত নেমে যায়। ছাদের ওপর খুব শব্দ হচ্ছে, কীসে যেন খুব হুড়োহুড়ি করছে। ঘরে আমি একা তবু শব্দ হচ্ছে কিছুর। বোধ হয় ঘুণ পোকার শব্দ। আজ লোডশেডিং হলেই গেছি! এখানে টিভি নেই, একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে, এই নীরবতাকে তো উপলব্ধি করতে পারছি।

১৪।৩।১৫

চিলাপাতার জঙ্গলে গতকাল অনেকে হাতি দেখেছে, আমরা মদনমোহন দেখে ফিরে আসার সময় অনেকেই নাকি দেখেছে। আমাদের আগের গাড়িটা দেখেছে। আমাদের দেখা হয়নি এই যাত্রা। কটেজের চালে নানারকম শব্দ হয়েই চলেছে। পায়রার বকবকানি শুনেই চলেছি। রাত্তিরে ভাম-ও আসে। আলমারির ভেতর খুটখাট শব্দ হয়েই চলেছে। একদল বাঁদর কিচমিচ শব্দ করেই যাচ্ছে। নানা রকম পাখিও গলা সাধতে শুরু করে দিয়েছে। সকালে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য দেখে এলাম। একটু পরেই জয়ন্তীর উদ্দেশে যাত্রা করছি। সকাল থেকেই আজ অনেক প্রোগ্রাম। ভোর বেলা জলদাপাড়া ফরেস্ট। জীপে ওঠার পর খুব ঠাণ্ডা লাগছিল। একে একে দেখা মিলল বাইসন, গণ্ডার আর একদল ময়ূরের। অনেকে হাতির পিঠে চড়েও সাফারি করছে। গভীর জঙ্গলে নীরব হয়ে থাকতে হয়, তবে তো জঙ্গলের শব্দ শোনা যায়। বিভিন্ন রকম পাখির ডাক আর পোকামাকড়ের ডাক শুনলে মনে হবে ওরা তোমাকেই ওয়েলকাম জানাচ্ছে। ময়ূরের কেকাধ্বনি শুনলে বুক কেঁপে উঠলেও আনন্দ লাগে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাওয়ার মধ্যেও একটা আনন্দ রয়েছে। এখানে ওয়াচ টাওয়ারে উঠতে হবে। ময়ূর ছাড়া কিছু দেখা গেল না। এখানে আসলে দূরবীন নিয়ে আসলে ভালো হয়। কারণ অনেক দূর থেকে এরা দেখা দেয়। ওয়াচ টাওয়ারে ওঠার আগেই আমরা গণ্ডার দেখে নিয়েছি। পোজ দিচ্ছিল। বিখ্যাত অভিনেতাদের মত। সবার ছবি নেবার পর ও জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেল। ও জানে যে আমাকে দেখতে রোজ লোক জড়ো হয়। একদল বাঁদর গাছের ওপর থেকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিল।

কটেজে ফিরে স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করে আবার পথ চলা। এবার শিকিয়াঝোরা। নাহ কোনও ঝর্ণা বা ঝোরা জাতীয় কিছু নয়। নতুন একটা টুরিস্ট স্পট সবে হচ্ছে। একটা খাল আছে তার দুপাশে জঙ্গল। উত্তরবঙ্গে বসে সুন্দরবনের মজা নিতে চাইলে শিকিয়াঝোরা অবশ্যই আসতে হচ্ছে। নৌকা করে মাঝি নিয়ে গেল। জীবনে প্রথম বার লগি দিয়ে ঠেলা নৌকায় চড়লাম। নৌকা বা বোট যাই বোলো না কেন। এখানে তোমরা বিভিন্ন রকম জলজ উদ্ভিদ দেখতে পাবে যার মধ্যে শাপলা পাতাঝাঁঝি আর কচুরিপানাই বেশি। এছাড়াও আরও নানা রকম জলজ উদ্ভিদ। আর দু'পাশে ঘন জঙ্গল তো আছেই। আর বালিহাঁস, পানকৌড়ি, বিভিন্ন রকম জলজ পাখি দেখতে পাবে। মাছরাঙা, বক, শামুকখোল। যে গুলো আমরা নিজেদের এলাকায় দেখতে পাই না। তবে একজন গাইডের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হত, এই উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নাম গুলো জানা হয়ে যেত। দুপাশের জঙ্গলে নাকি হাতি, চিতা আর ভালুকের উৎপাত আছে। এই জঙ্গলে প্রচুর চালতা হয়।

এইখানেই আমরা লাঞ্চ সারলাম তবে নৌকায় নয়। চাঁদি ফাটা রোদ এখানে। এরপর রাজাভাতখাওয়া, এখানে একটা ছোটো মিউজিয়াম আছে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত। বক্সা টাইগার প্রজেক্টে এখন নাকি ২৪ টা বাঘ। ভরা দুপুরে কেউ দেখা দিতে ইচ্ছুক নন। এরপর জয়ন্তীর পথে। জয়ন্তীর জঙ্গলে একটা উপন্যাস পড়েছিলাম সমরেশ মজুমদারের। এটাও অর্জুনের অ্যাডভেঞ্চার। বার বার সেই অর্জুনের কথাতেই ফিরে আসছি। জয়ন্তী শুধু ফরেস্ট নয়, জয়ন্তী একটা নদীর নাম। এই নদী অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। ওপরে পাথর ভর্তি, কিছু কিছু জায়গায় তির তির করে জলের ধারা বইছে। ভীষণ ঝাঁকুনি লাগে যখন গাড়িটা পাথরের ওপর দিয়ে যায়। কখনও জলের ওপর দিয়ে যায়, জয়ন্তী অনেকটা আমাদের ফল্গু নদীর মত। ভেতরে জল ওপরে পাথর দিয়ে সাজানো। জয়ন্তী নামে পাহাড়ও আছে। আর আছে মা জয়ন্তীর (দুর্গার) মন্দির। কিন্তু সেই পথ খুব বিপজ্জনক বলে অনেকেই গেলেন না। আমি নিজেও খুব পড়ে যাবার ভয় পাই তাই সাহস করে আর গেলাম না। উঠতে গেলে একটু ট্রেকিং জানলে ভালো হয়। জয়ন্তী নদীকে অতিক্রম করে যেতে হবে। পাথরের ওপর অনেকেই বসে পড়েছে, পা দু'টো জলে ডুবিয়ে। আমিও বসলাম একটা পাথরের ওপর। জলে পা ডোবাতে বেশ আরাম লাগল। বেশ রোদ্দুর লাগছিল এতক্ষণ এবার একটু আরাম হল। এই জায়গা ছেড়ে আর নড়তে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু তবু উঠতে হল। ভুটানের বর্ডার কাছেই। ফেরার পথে আমরা হাতি দেখলাম। একটার দাঁত বেশ বড়ো। ডাঁটও আছে বেশ। গাছপালা ভেঙ্গে ভেঙ্গে কি যেন একটা করছিল। সবাই ছবি তুলছে দেখে বিরক্ত হয়ে ওরা আবার জঙ্গলে ঢুকে গেল। মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। আবার পথ চলা শুরু হল, একটুর জন্য আমরা কিং কোবরা মিস করলাম। অন্য এক গাড়ির ড্রাইভার আমাদের ড্রাইভারকে বলল, যে সে কিং কোবরা দেখেছে আসার সময়। সারা দিন প্রচুর ঘোরা হয়েছে, ফেরার পথে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন সেই কটেজ মার্কা হোটেলে ফিরে তোমাদের জন্য ভ্রমণ কাহিনী লেখার চেষ্টা করছি। আজ এখানেই শেষ রাত। কাল যাচ্ছি লাটাগুড়ির উদ্দেশে। মাঝে মাঝেই ছাদে হুড়োহুড়ি করছে কেউ। ভাম বিড়ালের উৎপাত আছে। মন

খারাপ লাগছে, এই কটেজের ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে। এখানে বিদ্যুতের বেশ সমস্যা। বেশ কষ্ট করেই লিখছি এখন।

শিকিয়াঝোরা

১৬।৩।১৫

গতকাল এত ক্লান্ত ছিলাম যে ডায়েরি লেখা আর হয়ে ওঠেনি। গতকাল আমরা লাটাগুড়ি এসে পৌঁছেছি। এইখানে সকালে বেশ গরম থাকলেও রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যায়। বেশ সুন্দর আবহাওয়া। লাটাগুড়িতে প্রথমেই আমরা হোটেলে উঠলাম। আসার পথে ডায়না আর মূর্তি নদী চোখে পড়ল। মূর্তি নদীতে অনেকেই নেমে পড়েছে। সেই তিরতির করে জল বয়ে যাচ্ছে। নুড়ি পাথরের মধ্যে দিয়ে। আমি অনেকগুলো পাথর কুড়িয়ে ফেললাম। এই সব পাথরের মধ্যে খনিজ সম্পদ থাকে। এখানে তিস্তা, তোরসা, রায়ডাক, জলঢাকা, মহানন্দা, কালাজানি ইত্যাদি নদী বেশ বিখ্যাত। তোমরা সবাই ভূগোল পড়ো, তোমাদের সবই জানা আছে। হোটেলে পৌঁছে লাঞ্চ সেরে মেদলা ওয়াচ টাওয়ার। এটা একটা ফরেস্ট। মোষের গাড়ি করে যেতে হবে কিছুটা, তারপর একটু হাঁটা, তারপর ওয়াচ টাওয়ার। গাড়িতে উঠতে প্রথমে ভয় করে, বিশেষ করে মোষ গুলোর চেহারা দেখলে। তবে এরা খুব নিরীহ প্রাণী। মায়া লাগে দেখলে। এক পাশে চা বাগান আর এক পাশে শুকিয়ে যাওয়া নদী। সেখানে গরু ছাগল চরে। ওয়াচ টাওয়ারে অনেকক্ষণই ছিলাম। এখানে আসলে কিছু না কিছুর দেখা ঠিক পাবে। এখানে একটা নালা আছে বন্য প্রাণীরা জল খেতে আসে। আর একটা সল্ট লিক আছে। পশু পাখি দের শরীরেও নুন এর দরকার হয়। আমাদের মত লবণ খেতে পারে না কারণ ওরা রান্না করতে জানে না। তাই বন দফতর থেকে সল্ট লিক বানানো হয়। লবণ ঢালা হয় একটা জায়গায় গর্ত করে, ওরা এসে চেটে চলে যায়। এখানে গণ্ডার, বাইসন, ময়ূর দেখা গেল। হরিণ, লেপার্ড, হাতি এরা দেখা দিল না। ছ'টা পর্যন্ত এখানেই কাটিয়ে দিলাম। তারপর আবার মোষের গাড়ি করে ফেরা হল। এইখানে

অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য সন্ধ্যা বেলায় আদিবাসী নৃত্যের আসর বসে। এটা বাড়তি পাওনা পর্যটকদের কাছে। চাপড়ামারি, চন্দ্রচূড়, চুখাচুখি এই ওয়াচ টাওয়ারগুলোও তোমরা দেখে নিতে পারো।

এত গেল গতকালের কথা, আজ বেরিয়েছি বেশ দেরীতেই। পাহাড়ে উঠেছিলাম। জঙ্গলের মধ্যে মহাকাল মন্দির আছে, তবে এটা ঠিক মন্দির নয়। এখানে কিছু শিবলিঙ্গ আছে। লাল রঙের ধ্বজা টাঙ্গানো চারদিকে। হাতিকে পুজো করা হয়। সামনে যদি কোনও দাঁতাল হাতি এসে দাঁড়ায় মনে হবে মহাকাল নিজেই চলে এসেছেন। হাতি এখানে অনেক ক্ষয় ক্ষতি করে ফেলে। জঙ্গলে খাবার না পেলে লোকালয়ে চলে আসে। এখানে পুজো দিলে হাতি নাকি আর উৎপাত করে না। এমনটাই বিশ্বাস মানুষ জনের। হাতির ভয় থেকে বাঁচবার জন্য মানুষ জন মহাকাল, বিশ্বকর্মা, গণেশ এর পুজো করে। মহিষমর্দিনীর পুজো হয় কোচবিহারে। বন্য মহিষের ভীতি থেকেই কি মানুষ এই দেবীর পুজো করে? মহিষাসুরের গল্প আমরা সবাই জানি। বুনো মোষের একজন দেবতা হলেন ট্যাঁরবারো। আরণ্যক যারা পড়েছ তারা জানো। আজ আমরা চা বাগানের ভেতর ঢুকেছি। দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি তোলা দেখেছি। জানকী বলে একজন মহিলা শ্রমিকের সাথে আলাপ হল। এরপর সামসিং ভিউ পয়েন্ট। এটা একটা নেপালি গ্রাম। চোখ জুড়নো সৌন্দর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। এর পর আবার মূর্তি নদী। এখানে নদীর রূপ অন্য রকম। তির তির করে আর বইছে না, রীতিমত গর্জন করছে। বিশাল বিশাল পাথরের ফাঁক দিয়ে এই নদী বইছে আর শব্দ করছে অবিরাম। এই জায়গার নাম রকি আইল্যান্ড। নদীর ভেতরটা পুরো দেখা যায়, অনেক মাছ খেলে বেড়াচ্ছে ভেতরে। অনেকেই চেষ্টা করল মাছ ধরার, কিন্তু ওরা আমাদের চেয়ে অনেক চালাক। কিছুতেই ধরা গেল না। বিশাল বিশাল পাথরের জন্যই রকি আইল্যান্ড নাম হয়েছে। এক একটা পাথর ঠিক কচ্ছপের পিঠের মত দেখতে। কোনোটা আবার হাতির পিঠের মত দেখতে। আর আছে জলের অবিরাম বয়ে চলার শব্দ। রঙ্গিন প্রজাপতির দল। প্রজাপতিগুলো আমাদের দেখেও উড়ে গেল না। ডানা দুলিয়ে দুলিয়ে পোজ দিচ্ছিল। এই খানেই আমরা দুপুরের লাঞ্চ সারলাম। প্লাস্টিকের থালা গুলো ফেলার জন্য ডাস্টবিন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এর পর দুপুরে ঝালং আর বিন্দু নামে দুটো নেপালি গ্রাম। পাহাড় আর অরণ্যের শোভা দেখতে দেখতে পথ চলা। ঝালং-এ যখন পৌঁছলাম তখন বেশ মেঘ করেছে। এখানে ভিউ পয়েন্ট আছে। দূরে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে সেটা ভুটানের মধ্যে পড়েছে। নীচে দেশলাইয়ের খোলের মত বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। এই অংশ পড়েছে ভারতে। আমরা বেশ খানিকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছি। দূরের পাহাড়ে অর্থাৎ ভুটানে ছোটো ছোটো খেলনা গাড়ির মত গাড়ি চলছে। খেলনার মতই দেখতে পারছি এই পার থেকে। খেলনা বাড়ি দিয়ে শহর সাজানো মনে হবে। ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। অদ্ভুত একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছিল কিন্তু বৃষ্টির জন্য বিন্দুতে নামা হল না। গাড়িতেই বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, তবুও বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। আমরা এক সময় ফিরে এলাম। সমতলে নেমে এলাম। নেপালি গ্রাম গুলো ভারী সুন্দর সাজানো। একদম মেঘের মুলুকে এসে পড়েছি বলে মনে হবে।

আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। কালকেই ফেরার পালা। লাটাগুড়ি থেকে ফেরার পথে কিছু কেনাকাটা করে নিতে পারো। শপিং কম করাই ভালো, কিন্তু এদের হাতের কাজ অবশ্যই দেখবে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প আছে। এখানে কাঠ, বাঁশ, বেত, মোষের শিঙ্ থেকে বিভিন্ন রকম জিনিস পাওয়া যায়। চাও পাওয়া যায়।

এই ক'দিন আমরা অনেক আনন্দ করলাম। তবে সব আনন্দেরই শেষ আছে। আবার সেই ঘরে ফেরার পালা। এক রকম জীবন যাপন। তবে বাড়ি ফেরার ও আনন্দ আছে আলাদা। অনেক গুলো মানুষ যে অপেক্ষা করে আছে!

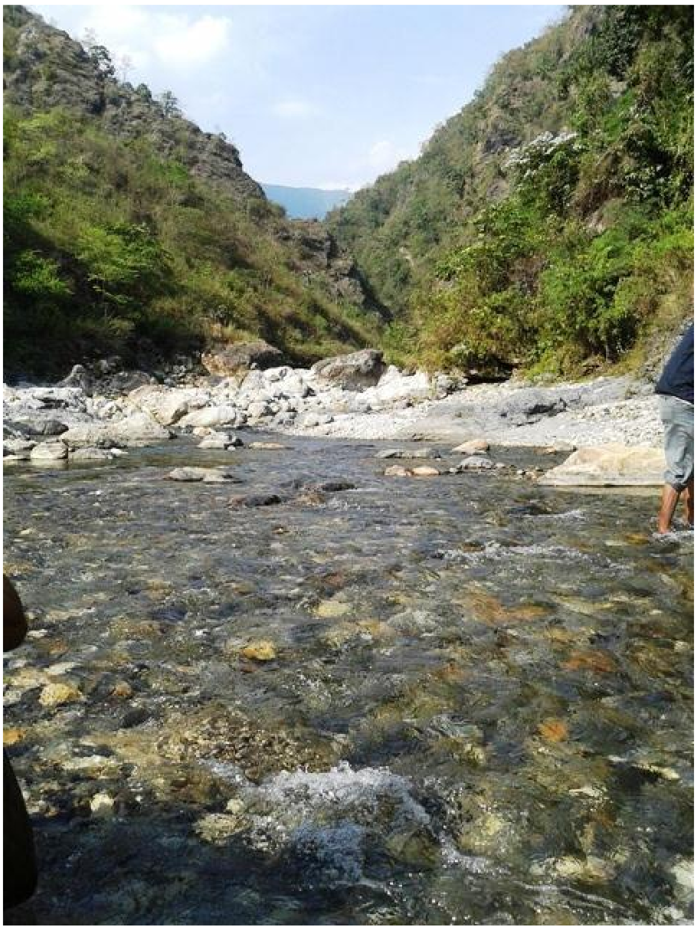

জয়ন্তী নদী

ফোটোঃ লেখক

ভ্রমণ::

সি ওয়ার্ল্ড

প্রদীপ্ত ভক্ত

ছোটবেলায় দেশবিদেশের অ্যাডভেঞ্চার পড়তে পড়তে কিংবা নতুন দেশের ছবি গল্প শুনতে শুনতে সবারই মোটামুটি আমাদের ইচ্ছে করে কবে যাব ওই সব জায়গা গুলো। না ফ্রান্সিস, বিমল কুমারের মত অ্যাডভেঞ্চার আমার হয়নি। তবে নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে কিছু।আমি যখন এদেশে আসি,আমার প্রোজেক্ট লোকেশন ছিলো ক্যালিফর্নিয়া। ভারী চমৎকার জায়গা ক্যালিফর্নিয়া। কালিফোর্নিয়ার আমি যেখানে উঠেছিলাম সেই জায়গাটার নাম অরেঞ্জ কাউন্টি। ওখান থেকে সী-বিচ গুলো কাছাকাছি। এছাড়া ডিজনিল্যান্ড ইউনিভার্সাল ষ্টুডিও তো আছেই। এছাড়া আছে স্যান ডিয়াগো, প্যাসিফিক ওশান এর পাশের শহর। স্যান দিয়াগোতে সি ওয়ার্ল্ডটা দেখার ইচ্ছে ছিল বহুদিন ধরেই। সি ওয়ার্ল্ড হলো একটা এনিম্যাল থিম পার্ক। মানে বিভিন্ন মজাদার রাইডের এর পাশাপাশি , সামুদ্রিক প্রাণীদের নিয়ে তৈরি পার্ক। তাদের নিয়ে শো হয়. এমনি ঘুরে দেখা যায়। আমেরিকার বেশিরভাগ প্রদেশে গাড়ি হলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। সৌভাগ্যক্রমে আমি যেখানে ছিলাম সেখানে গাড়ি ছাড়াও চলাচল সম্ভব। মানে বাস,ট্রেন আছে আর কি।

অবশ্য আমার সঙ্গী নেই কেউ যাবার।তাই একা একাই একদিন বেরিয়েই পড়লাম। ও হ্যাঁ, এইখানে বলে রাখি আমার দেশে কেনা স্মার্টফোন বিদেশে এসে আনস্মার্ট হয়ে গেছে। যে ফোনটা ব্যবহার করি যার জিপিএস নেই। আমাদের দেশে জিপিএস ছাড়া অজানা জায়গায় যাওয়া কোনো বাপারই না। কেউ না কেউ দেখিয়েই দেবে। কিন্তু এদেশের লোকজন এতটাই টেকনোলজি নির্ভর সে আশা বৃথা। যেদিন যাব ঠিক করেছিলাম তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা গুগল সার্চ করে পুরো ব্যাপারটা নোট করে নিলাম। দুটো বাস বদলাতে হবে, তারপর ট্রেন, তারপর আবার বাস। দেশে এই বাপারটা এতটাই সহজ যে কোনো চাপ নিতে হয়না, কিন্তু এদেশে যেখানে সেখানে রাস্তাঘাটে "গুগল ম্যাপজানা" লোকজন থাকবেনা।

পকেটে বিস্কুট, ব্যাগে টুপি ও পাসপোর্ট, আর গায়ে জ্যাকেট চাপিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। বাসস্ট্যান্ডে ১০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর খেয়াল হলো -আরে এতক্ষণে তো বাস চলে আসার কথা ! গুগলে যে সময়টা দেওয়া থাকে বাসের , সেই সময়েই বাস আসার কথা। ভালো করে বোর্ডটা খেয়াল করে দেখি- যাহ বাবা, রোববার বাস বন্ধ থাকে! বোঝো কান্ড। এদিকে ৮.১০ এ ট্রেন। এখন উপায়! নতুন এসেছি, বুদ্ধি সুদ্ধি আমার একটু দেরিতে পাকে। এদিকে আমার কাছে ক্যাব এর নম্বর নেই। আসলে,ট্রেনের টিকেট কাটা নেই, তাই ফিরে আসাই যায়, তবে যাব বলে বেরিয়ে ফিরে আসতে কার ভালো লাগে বলো?তাই দৌড়ে বাড়ি ফিরে রুমমেটের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তার থেকে ইয়েলো ক্যাবের ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করলাম। ক্যাব এর ড্রাইভার শ্রীলঙ্কার লোক। দীর্ঘদিন আছেন। একজন বাঙালি আর একজন বার্মিজ এর সাথে থাকেন। বক বক করতে করতে ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে কিনা আর চিন্তা করার অবকাশ পাইনি। নামার সময় চমক! দেখি কিছু একটা টিকেট আমায় দিতে চাইছে। জানা গেল, তার কাছে একটা গ্রীনলাইন ট্রেনের টিকিট আছে, এবং সেটাই সে আমায় দিচ্ছে ।এমনি এমনই। আর উনি এটা দিচ্ছেন আমি টিপস দেবার আগেই। (টিপস দেওয়াটা এদেশের বাধ্যতামূলক রেওয়াজ, না দিয়ে চলে যাওয়াটা চূড়ান্ত অসভ্যতা), যদিও সেই টিকিট আমার কাজে লাগার নয়, কারণ আমি যাব Amtrak ট্রেনে। কিন্তু সেটা কথা না, এমন বিদেশ বিভুঁইে এমন অপ্রত্যাশিত ভালবাসা পেলে মনটা ভরে ওঠে। দেশের গন্ডি তখন উপমহাদেশ হয়ে গেছে।

ট্রেন দেখে যথারীতি ধাক্কা খেয়ে গেলাম। দোতলা ট্রেন। ভিতরটা ভারী চমৎকার। গদিমোড়া চেয়ার, কিছু সিট এর সামনে টেবিল আছে,কফি খেতে খেতে কাচ ঢাকা জানলা দিয়ে বাইরে দিকে তাকিয়ে থাকতে পারো। তোমার খুশি। Amtrak এর এই ট্রেনটা প্যাসিফিক ওশান এর পাশ দিয়ে যায়। জানলা দিয়ে তাকালেই ঝকঝকে নীল আকাশ , ঘন নীল্ সমুদ্র। একতলাটায় ডাইনিং স্পেশ আর টয়লেট। সত্যি বলতে কি, আমার চোখে তখন আমার দেশের লোকাল ট্রেনের চেহারাটা ভেসে উঠেছে, ইশশ আমরাও যদি পাব্লিক প্লেসে এমন পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতাম! আমরা নিজেরাই একটু দ্বায়িত্ব নিয়ে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেললেই তো এমন ঝকঝকে ট্রেন হয়ে যেতো। চেকারকে অনুরোধ করলাম, যেন সান ডিয়েগো

এলে আমায় বলে দেন, আমি যদি এনাউন্সমেন্ট মিস করি বা ঘুমিয়ে পড়ি। তিনি বলে দিয়েছিলেন। এদেশের মানুষজন সম্পর্কে অনেকেরই শীতল ধারণা আছে, কিন্তু সে ধারণা ঠিক না তার উদাহরণ বহুবার পেয়েছি।

সী ওয়ার্ল্ডে পৌঁছে যেতে উঠতে সময় লাগেনা। শামুর শো দিয়ে শুরু। শামু হলো এক তিমির নাম, তার নাচ দেখে মনটা একেবারে তাজা হয়ে গেল। এমনকি আমার মত খুঁতখুঁতে লোককেও জলের ঝাপ্টায় ভিজিয়ে দিল বলে একটুও রাগ হোলোনা।

ডলফিনের মত বুদ্ধিমান প্রাণীর কসরত দেখতে দেখতে মনটা আরো খুশীতে ভরে গেল।

পেঙ্গুইনের নাচানাচি, সী -লায়ন এর ঝাঁপাঝাঁপি , মাছদের খেলা এইসব নানান জিনিসের মধ্যে দিয়ে দিনটা কখন ফুরিয়ে গেল টেরই পেলাম না।

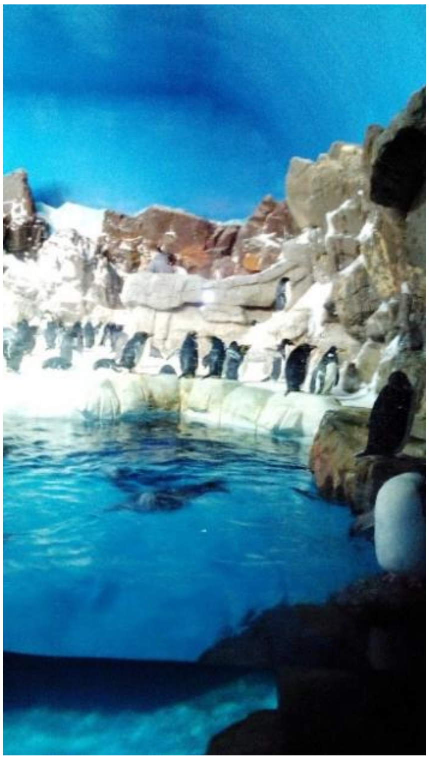

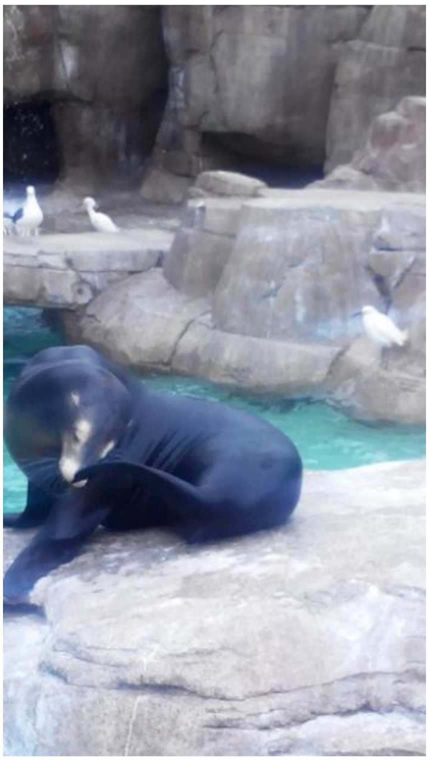

শেষে জলের মধ্যে খেলে বেড়ানো ওই ক্ষুদে ক্ষুদে মাছগুলো, ঠিক আমাদের মৌরলা মাছের মত দেখতে,ওদের সাথে খেলতে দিয়ে দেরী হয়ে গেল। জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে রাখলে ওরা এসে হাতের মধ্যে মৃত কোষ খেয়ে যায়, বেশ মজা লাগে। বাপারটা আমি কাটিয়েই দিচ্ছিলাম, জানতামনা আগে, এক মার্কিন ভদ্রমহিলা নিজের থেকেই বললেন আমি যেন ওটা অবশ্যই করি, যদি করে না থাকি।ভাগ্নিস বলেছিলেন।হঠাৎ খেয়াল হতে দেখি স্টেশন যাবার বাস আমি মিস করেছি এবং পরের বাস আধঘন্টা পরে, তারমানে ৬.৪৫ এর ট্রেনও আমি মিস করেছি!

স্টেশনে এসে Amtrak এর কাস্টমার কেয়ারে খোঁজ নিয়ে জানলাম পরের ট্রেন 9.11 তে। এবং সেটাই লাস্ট ট্রেন।বাজছে সবে সাতটা কুড়ি। দুঘন্টা এই স্টেশনটাতে বসে থাকতে হবে!

স্টেশনটা আমাদের দেশের অজ পাড়াগাঁয়ের স্টেশন এর মতোই প্রায়। আসে পাশে একটাও দোকান নেই যে কিছু কিনে খাবো।বিস্কুট সেই কখন শেষ হয়ে গেছে, আর ঘোরাঘুরির নেশায় সারাদিন কিছু খাওয়াও হয়নি। শেড আছে কিন্তু যা হাওয়া দিচ্ছে, তাতে শেড থাকা না থাকা সমান। তারমধ্যে শার্টের দুটো হাতায় ভেজা, মাছগুলোর সাথে ছ্যাবলামো করার সময়। আমি এমনিতেই শীতকাতুরে, কি ঠান্ডা হাওয়া বাপরে বাপ, হাড় অব্দি কেঁপে যাচ্ছে। স্টেশনে লোক নেই বিশেষ।না একজন আছে দেখছি। স্টেশনে এর শেষ প্রান্তে একজন বসে বসে বিয়ার খাচ্ছে আর ফোনে কথা বলছে। ভালো লোক না মন্দ লোক কে জানে! আমার থেকেই খোঁজ নিলো ট্রেন এর, LA যাবে। এই ট্রেন টাই , অরেঞ্জ কাউন্টি মানে আমি যেখানে থাকি সেখান হয়ে LA যাবে। অন্ধকার স্টেশন, বাতাস বইছে হুহু করে, একটাই অজানা লোক, আশেপাশে দোকানপাট নেই, সব মিলিয়ে গা ছমছমে অবস্থা। এ যদি গুন্ডা বদমাশ জাতীয় লোক হয়, হয়ে গেলো আজ আমার।উফফ , না মনটা অন্যদিকে ঘোরাই , দুঘন্টা এরকম খালি পেটে চিন্তা করে করে কাটানো যায় নাকি। থ্রিলার পড়তে গেলেও গরম কফি চাই আর সেখানে থ্রিলারের চরিত্র হতে গেলে খালি পেটে পোষাবেনা বাপু।

ধ্যান করব নাকি! উহহ আবার হাওয়া দিস কেন বাবা, একটু থামলেও তো পারিস। এই ভিজে শার্ট পরে এই ঠান্ডা হাওয়ায়, খালি পেটে ধ্যান করতে গেলে আমায় মহাপুরুষ হতে হবে। কাউকে ফোন করা যায়, তাতে মনটা অন্যদিকে ঘুরবে, বা বই পড়া যায় বা খেলা যায়, কিন্তু কিছুই করা যাবেনা। আমার অচল স্মার্ট ফোন যেটা কিনা এইসব কাজেই ব্যবহার করি তার চার্জ শেষ। আর যে ফোনটা কাজের, মানে যার থেকে ফোন করি সেটার চার্জ প্রায় তলানিতে, খানিকটা তো রাখতেই হবে।

অফিসের এক কলিগকে ফোন করে বললাম আমার ১১তা বাজবে সান্টা আনা স্টেশন পৌঁছতে সে যেন কষ্ট করে একটু আসে নিতে তার গাড়ি নিয়ে।আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে, কাঁপতে কাঁপতে ঘন্টা দেড়েক কাটালাম।

এইসময় আরো একজন এলো. সেও আমার ওদিকেই যাবে।তার সাথে গল্প করে বাকি সময়টা কাটলো। ভদ্রলোক অ্যানিমেশন এর কাজ করতেন আগে। 'লাইফ অফ পাই' এর কিছু গ্রাফিক্স এর কাজ হয়েছিল ওদের কোম্পানি থেকে।এখন নিজেই একটা ব্যবসা খুলেছে। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে। জমি বাড়ি কেনাবেচার। বোঝো! কোথায় অ্যানিমেশন কোথায় জমি-বাড়ি। আস্তে আস্তে আরো কিছু লোকজন এলো। ট্রেনও এলো। সারাদিনের ধকল এর পর ট্রেন এর উষ্ণ পরিবেশে ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এলো। ওই ভদ্রলোককেই বললাম, সান্টা আনা স্টপেজ এলে যেন আমায় একটু ডেকে দেন। তারপরই গভীর ঘুম। স্টেশনে নেমে দেখি কলিগটি এসে গেছে।

বাড়িতে খাবার ছিল না , কেনাও হয়নি । এমন সময় রুমমেটের মেসেজ পেলাম, আমি যেন কোনো দ্বিধা না করে ওর থেকে নিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ি। ...পৃথিবীটাকে যতটা কঠিন বলে, অতটা মোটেই নয় ।

ছড়ায় ভ্রমণ - সুরজ কুণ্ড আন্তর্জাতিক শিল্প মেলা

(প্রতি বছর বসন্তকালে হরিয়ানার সুরজকুণ্ডে পয়লা থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এই বিখ্যাত শিল্প মেলা)

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

লাল –কালো- নীল স্বপ্ন ঝুটো

দুই বেলা তার চাই দুমুঠো

বাবার জুতো, ছেলের জুতো

খুঁজলে পাবে বাঘের দুধ ও

আকাশে যেন ফুটেছে ফুল

কৃষ্ণচূড়া ,পলাশ, বকুল

আমারও আজ মজা দারুণ

কিনব জিনিস নতুন নতুন

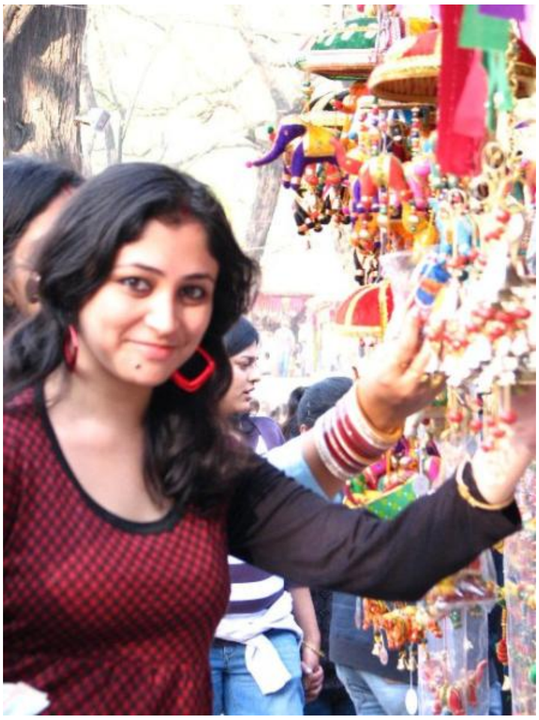

ভগবানও আছেন হেথা

গণপতি সিদ্ধিদাতা

মন্ডা, মিঠাই যা খুশি খাও

মণিপুরী নাচ দেখে যাও

ছৌ নাচছেন চার দেবতা

মর্ত্যে এলেন দুর্গামাতা

অসুর বধের পালা শেষ

একসাথে সব লাগলো বেশ

নয়টি বেড়াল ফ্রম কাশ্মীর

বেড়াতে এসেছে যমুনার তীর

রঙীন কাপের সমুদ্দুরে

হারিয়ে গেছি অচিনপুরে

গুপী বাঘার জুতোও পাবে

দূরে? কাছে? কোথায় যাবে?

পুতুল গুলো ছড়ায় গানে

বলল গল্প রাজস্থানের

বাজার ভর্তি হাজার জিনিস

ওরও তো চায় , পুতুল বেলুন লাট্টু ঘুড়ি, হাওয়ার মিঠাই

আমিও তাই আমার খুশি উজাড় করে

আজ দিতে চাই ছোট্ট মেয়ের আঁচল ভরে

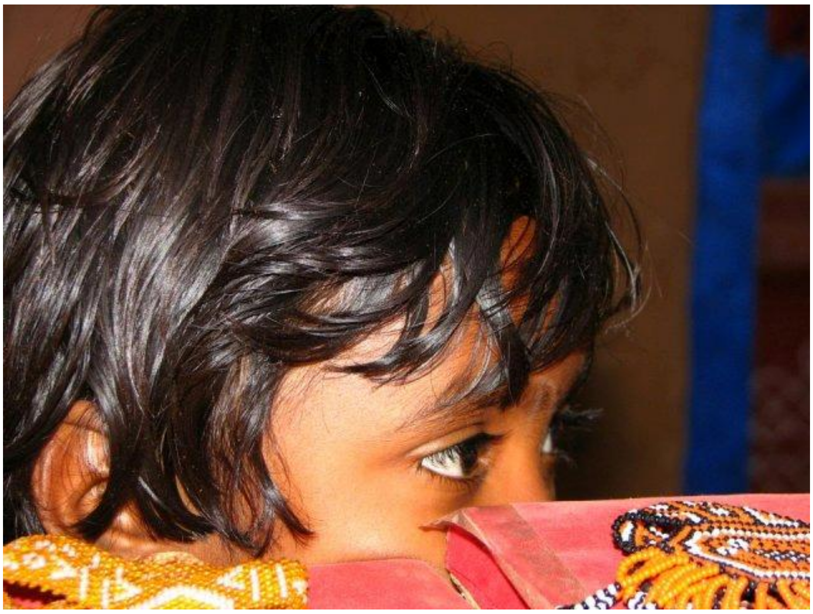

ভ্রমণ:: ছড়ায় ভ্রমণ:

শরতের জলছবি

রাখী নাথ (কর্মকার)

ফল ফোলিয়েজ বা 'পাতাঝরার' ফিনোমেনন আসলে পর্ণমোচী বৃক্ষের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। সাধারণত দক্ষিণ গোলার্ধে এপ্রিল থেকে মে মাসে আর উত্তর গোলার্ধে অক্টোবর মাসে সুন্দরী প্রকৃতির এই খেলা দেখা যায়। অবাক চোখে চেয়ে দেখো - শরতঅবকাশে সবুজ পাতার দল নিমেষে বদলে গিয়েছে - লাল, হলুদ, বেগুনি, কমলা, গোলাপী, ম্যাজেন্টা এবং বাদামী ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের শেডে। এসো দেখি, আজ সেই রঙের উজ্জ্বলতায় আমরা ভরিয়ে তুলি আমাদের রোজনামচার একঘেঁয়েমি!

১। হিমেল ভোরে কে রাঙ্গাল সবুজ পাতার ঝাঁক
আয়রে খুঁজি রঙ্গের প্যালেট, বইখাতা দূর থাক!

২। সবুজআড়াল ক্যারোটিনস আর জ্যান্থোফিলের মুখ -

ঐ খুলেছে মুখোশ তাদের - লাল-হলুদের সুখ!

৩। লাল অ্যান্থোসায়ানিনের দেমাক দেখো ভারী!

সবুজ মুছে রঙ চাপাল লাল পাতার ঐ সারি।

৪। সুগার ম্যাপল কমলা লালে খুব সেজেছে আজ।

চোখে আগুন রঙের বাহার, ভুলেছি সব কাজ!

৫। ডগউডের ঐ সবুজপাতায় লাল কে দিল ঢেলে

হাওয়ায় ভাসে প্রজাপতি লক্ষ ডানা মেলে।

৬। চুপ চুপ! ঐ জলের নীলে কে গুলেছে রঙ

শরতহোলি-আজ প্রকৃতি সাজল এমন সং!

৭। ইচ্ছেঘুড়ি চায় হতে আজ রঙিন পাতার দল,

৮। পাতার বুকে ঠিকরে ওঠা রোদ্দুর ঝলমল!

৯। যেই বাতাসে শিরশিরে ভাব, অমনি গাছের দল

১০। পাতাঝরার উৎসবেতে হল যে উচ্ছল!

১১। পাতায় ফোটে ফুলের হাসি – অবাক চোখে চাও –

১২। হলুদ-রাঙ্গা গাছের পাতায় সবুজ আজ উধাও

১৩। আজ প্রকৃতির শিল্পীতুলি রাঙ্গাল চারদিক,

পাতার ঐ রান্নাঘর আজ আহ্লাদে ঝিকমিক!

১৪। আয় রে খুঁজি ঝরাপাতায় নতুন প্রাণের সুর

রঙের নেশায় মন মজেছে, রাঙ্গাই স্বপনপুর!

ভ্রমণ:: চিত্র-গল্প::

জাদুকরী এলোরা

শ্রেয়সী চক্রবর্তী

শীতের ছুটি, বর্ষার দুপুর, গ্রীষ্মের বিকেল... যে সময়েই তাকাও না কেন এলোরা বা ইলোরা গুহার রূপ সর্বদাই সুন্দর। আমাদের দেশ ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র রাজ্যে বনভূমি ঘেরা চারণাদ্রি পাহাড়ের গায়ে খোদিত মোট চৌত্রিশটি গুহা নিয়ে প্রাচীন এলাপুরা বা বর্তমান এলোরা গুহা চত্বরের অবস্থান।।

১৬ নং গুহার অভ্যন্তর দৃশ্য

ইতিহাস বলে রাষ্ট্রকূট (ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দী) রাজবংশের আমলে এইসব গুহা-মন্দির গড়ে উঠেছে। এখানে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং জৈন ধর্মের সাধনার সমন্বয় ঘটেছিল, তাই এই তিন রকম গুহাই এখানে দেখতে পাওয়া যায়। ১-১২ নং বৌদ্ধ সাধন গুহা; ১৩-২৯ নং গুহা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রতিভূ এবং ৩০-৩৪ নং গুহা জৈন ধর্মাবলম্বী। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুহাটি হল কৈলাসনাথ মন্দির (গুহা নং ১৬)। একটি মাত্র পাহাড় কেটে এই বিপুলায়তন চোখ ঝলসানো গুহামন্দির বানানো মোটেও মুখের কথা ছিল না। এই কৈলাসনাথ মন্দির বিশ্বের বৃহত্তম মনোলিথিক (মাত্র একটি পাথর কেটে যা বানানো হয়) গুহামন্দির। এছাড়াও এখানকার ১০ নং 'বিশ্বকর্মা' গুহার কারুকাজ অসামান্য রমণীয়।।

১৬ নম্বর গুহা - কৈলাসনাথ মন্দির

১৬ নম্বর গুহা প্রবেশ মুখের অংশবিশেষ

২৯ নং গুহা শিব-পার্বতী বিবাহ

অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ

এলোরা মন্দির-চিত্র

এলোরায় আছে এক অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, সেটির দুইপাশ গুহা ঘেরা, এদেরকে 'গণেশ-লেণা' গুহা বলা হয়। বিশাল সব ভাস্কর্যের সঙ্গে ঝরে পড়া সময় ফিসফিসিয়ে কথা বলে এলোরায়।।

কারুকার্যময় খিলান

আমাদের দেশের প্রাচীন এই সম্পদকে ভালোবেসে কান পাতলেই ছোট্ট বন্ধুরা শুনতে পাবে সভ্যতার উন্নত ইতিহাস আর দেশীয় জাতক-পুরাণ কাহিনী। আর যদি হও ফেলুদাভক্ত তাহলে তো খুব শিগ্‌গিরি পড়ে ফেলতে হবে 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' আর তার পরেই অভিযান এলোরা।।

কৈলাসনাথের বন্ধুরা

গজ-শার্দূল ভিত্তি ভাস্কর্য

পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ

রাবণ

কিভাবে পৌঁছে যাবে এলোরায়ঃ সারা ভারতবর্ষ থেকে ট্রেন আসে ঔরঙ্গাবাদ শহরে। বাবা মাকে বলে তাড়াতাড়ি টাইমটেব্‌ল দেখে উঠে পড় ট্রেনে। ঔরঙ্গাবাদ নেমে গাড়িতে ৩৬ কিলোমিটার পথ পেরোলেই চোখের সামনে তার সব ম্যাজিক নিয়ে হাজির হবে সুন্দরী এলোরা।।

সীতাহরণ

বৌদ্ধ গুহা বিশ্বকর্মার অভ্যন্তরে

কৈলাস মন্দির সংলগ্ন এলোরা চত্বর

ছবিঃ লেখক

ভ্রমণ:: চিত্র-গল্প::

কেভ অফ দ্য মাউন্ডস

মহুয়া ব্যানার্জী

এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Wisconsin প্রদেশের "Blue Mounds" - এর কাছে অবস্থিত। গুহাটির নামকরণ করা হয়েছে তার নিকটবর্তী দুটি "Blue Mounds" পাহাড়-এর নামানুসারে। এটি একটি প্রাকৃতিক চুনাপাথর গুহা। নানা ধরনের খনিজপদার্থের স্তর বা আস্তরণের (Speleothems) বহুবিধ বৈচিত্র্য এই গুহাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায় ৪৫০০-৫০০০ লক্ষ বছর আগে গুহাটির সৃষ্টি হয়েছিল। যে ধরনের চুনাপাথর থেকে এই গুহাটি তৈরি হয়েছে সেগুলিকে "Galena Dolomite" বলে।

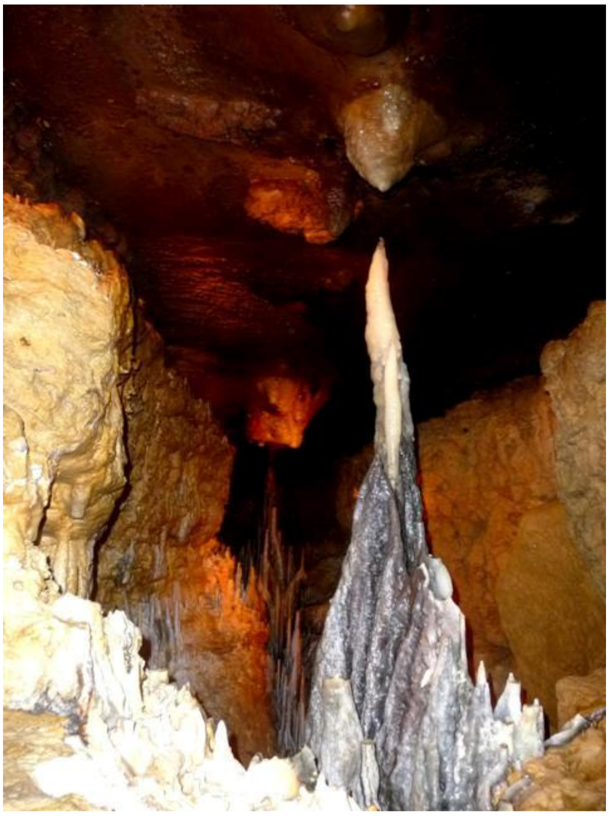

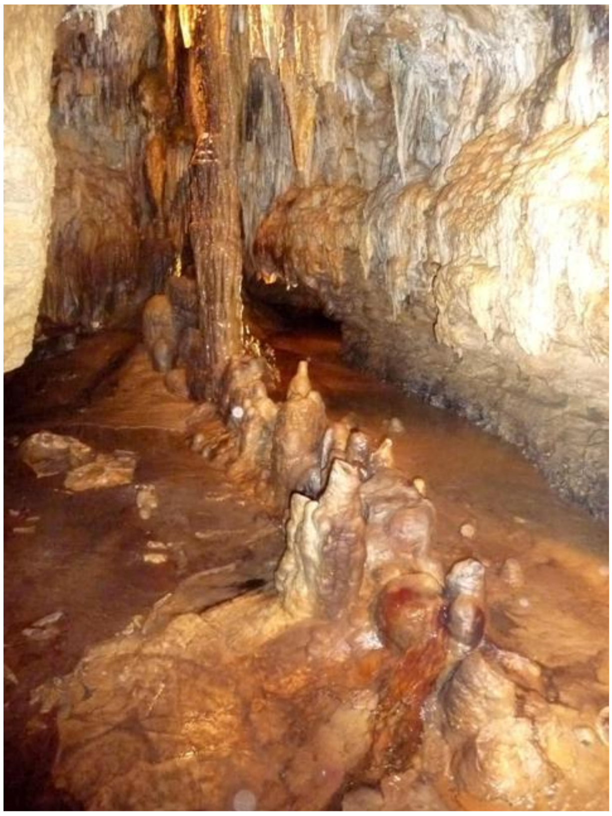

এই গুহাটিতে শিকাগো থেকে ২.৩০-৩.০০ ঘন্টার মধ্যে পৌছে যাওয়া যায়। গুহার পারিপার্শ্বিক পরিবেশও যথেষ্ট মনোরম। গুহাটি নিজে থেকে ঘুরে দেখা যায় না। টিকেট কেটে প্রশিক্ষিত গাইড-এর সাথে গুহাটি ঘুরে দেখতে হয়। গুহাটিতে প্রবেশের আগে পর্যটকদের দেখানো হয় একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র যার সাহায্যে ধারণা করা যায় গুহাটির আবিষ্কারের ইতিহাস এবং এই ধরনের প্রাকৃতিক চুনাপাথরের গুহা কিভাবে সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের মতামতও জানতে পারা যায় তথ্যচিত্রটি থেকে, যাতে কিভাবে এই গুহাগুলিকে সংরক্ষণ করা হয় তারও একটি ধারণা মেলে।

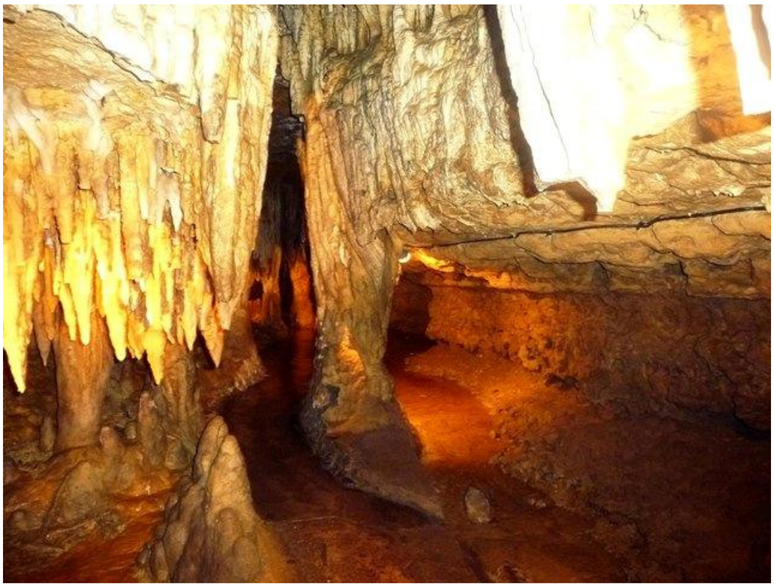

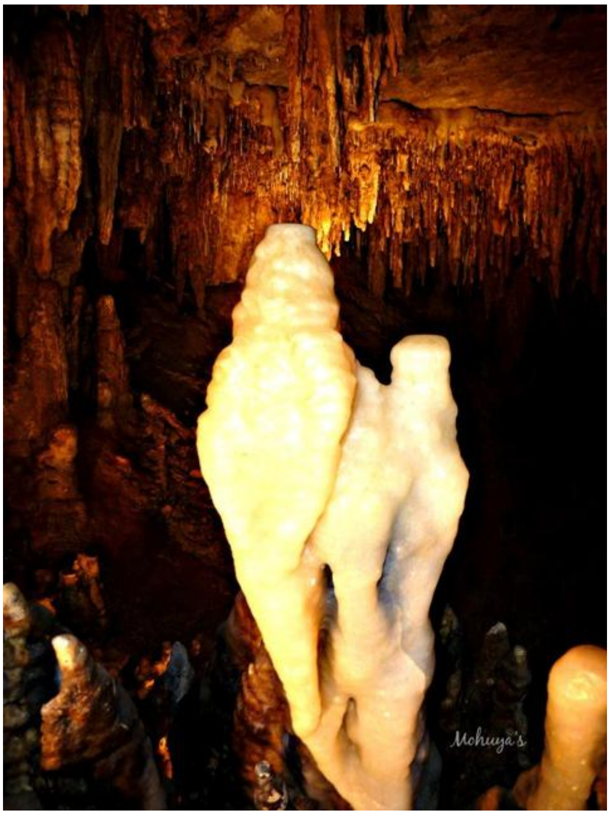

গুহাটির ভিতরের পরিবেশও যথেষ্ট প্রাকৃতিক পদ্ধতির দ্বারা সংরক্ষিত। যথেচ্ছ বৈদ্যুতিন আলোর ব্যবহার দেখা যায় না, পর্যটকদের সুরক্ষিত ভাবে যাতায়াত করার জন্য ঠিক যতটুকু আলোর প্রয়োজন ঠিক ততটুকুরই ব্যবস্থা রয়েছে। গাইডেরা প্রয়োজনমত টর্চ জ্বালিয়ে পর্যটকদের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলি বুঝিয়ে দেয়। গুহাটির ভিতরের নজরকাড়া চুনাপাথরের গঠনগুলি দেখে সত্যি মন ভরে যায়। কিন্তু এগুলি একদম স্পর্শ করা

মানা, কারণ মানুষের হাতের সামান্যতম তেল/ ময়লা লাগলেও এগুলির গঠন, বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কান পাতলেই শোনা যায় গুহার ছাত থেকে চুঁইয়ে পরা চুনজলের টুপটাপ আওয়াজ, আর সেগুলি থেকেই নিয়ত তৈরি হয়ে চলেছে এই অপরূপ সৃষ্টিগুলি। আর একটি কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বাইরের আবহাওয়ার সাথে গুহার ভিতরের আবহাওয়ার বিশেষ মিল পাওয়া যায়না। শীত, গ্রীষ্ম সবসময়ই সেখানে নাতিশীতোষ্ণ, স্যাঁতস্যাঁতে।

গুহার ভিতরে প্রায় এক ঘন্টার এই ট্যুর যেন সত্যি রোমাঞ্চকর এবং মনে রাখার মত।

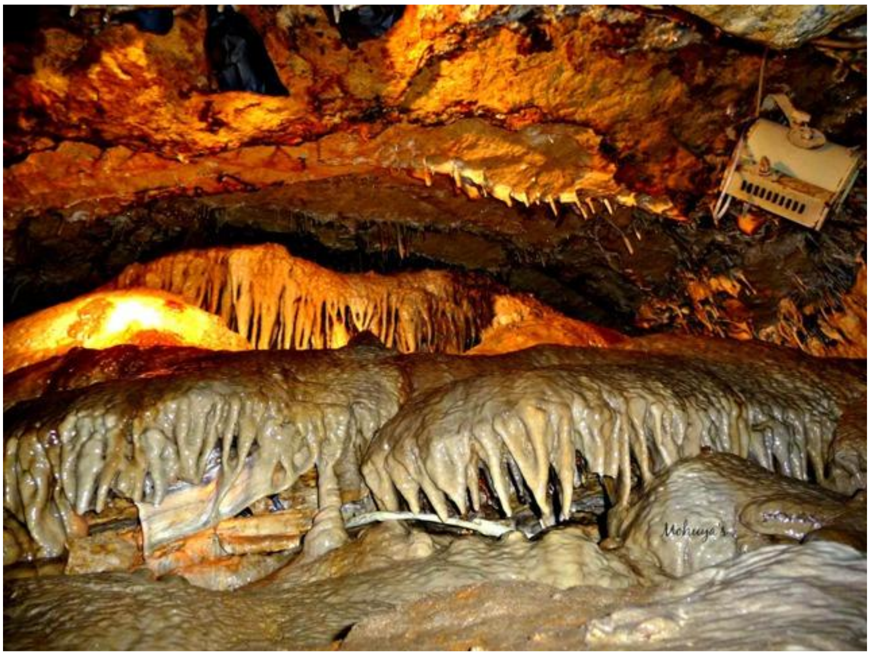

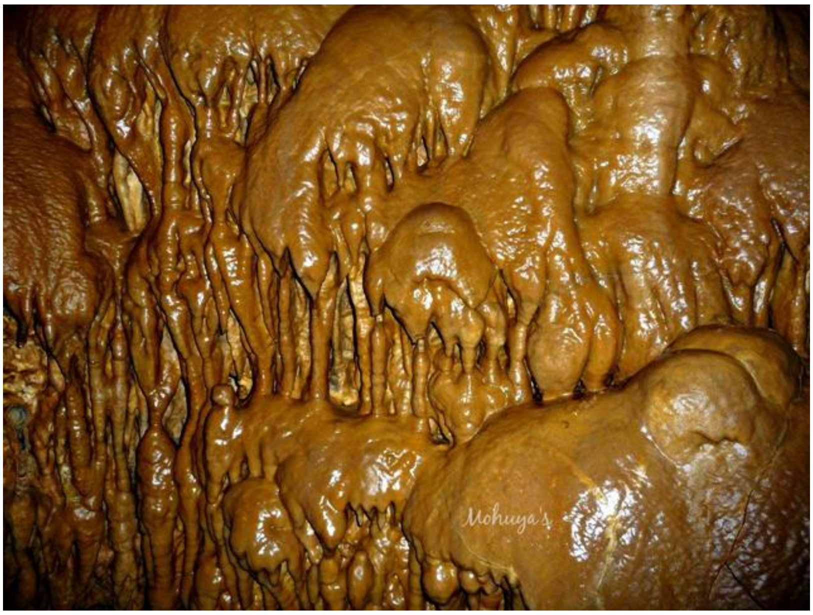

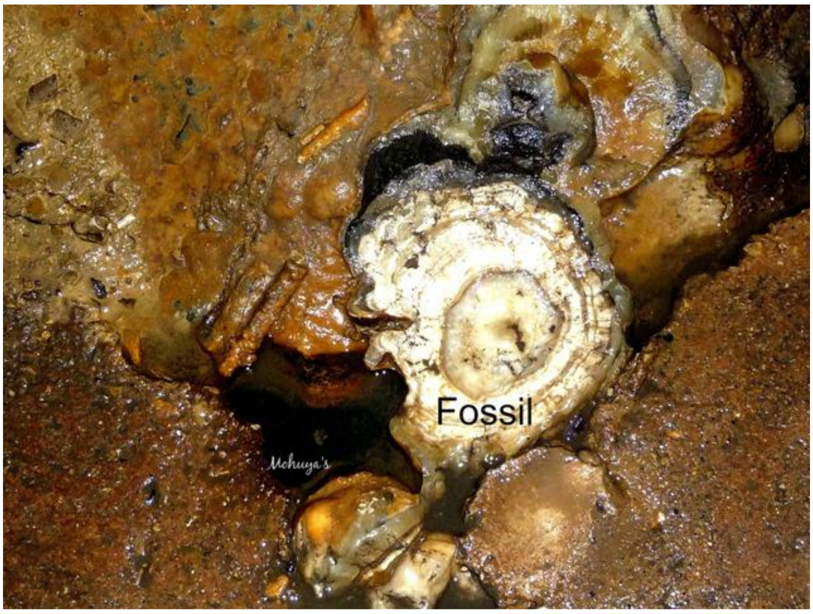

ফোটোঃ লেখক

গোলটেবিল::

গোলটেবিল বিভাগে সবাইকে স্বাগত।

বর্তমান কিশোর সাহিত্যের কিছু মণিমানিক্য নিয়ে আমরা হাজির হচ্ছি প্রতিবার। আজকের বই -

ভৌতিক অলৌকিক (অভিজ্ঞান রায় চৌধুরী)

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ - সুদীপ্ত মণ্ডল ।

প্রকাশক - পত্রভারতী

দাম - ২০০ টাকা

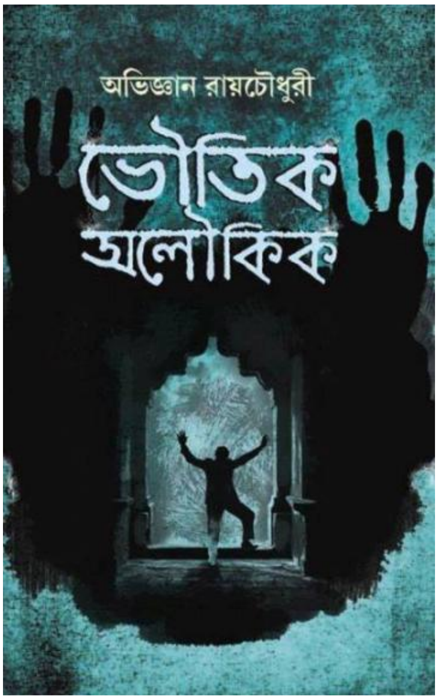

ভৌতিক অলৌকিক (রিভিউ)

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর লেখায় অভিনবত্ব ও মানবিক অনুভূতির এক অভূতপূর্ব মিশেল খুঁজে পাওয়া যায়। ভূত, কল্পবিজ্ঞান, রহস্য বা নির্মল হাসির গল্প সব ক্ষেত্রেই তাঁর কলম অসাধারণ। ওনার কল্প বিজ্ঞান, বিজ্ঞাননির্ভর গল্পগুলির সাথেও অনিবার্য ভাবে মিশে থাকে রসবোধ, পরিমিতিবোধ ও মানবিকতা। "ভৌতিক অলৌকিক" বইটি তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও নাম "ভৌতিক অলৌকিক" পাঠক এখানে খুঁজে পাবেন সব ধারার গল্পই। তাই যদি কেউ ভূতের গল্পের সাথে নির্মল হাসির গল্প বা অদ্ভুত রসের গল্প পড়তে ভালবাসেন, তিনি কিন্তু নিরাশ হবেন না। বরং এই বইটি পড়লে লেখকের অন্যান্য বইগুলিও খুঁজে পড়তে শুরু করবেন একথা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি।

১৮ টি নানা স্বাদের গল্পে সেজে উঠেছে এই বইটি। প্রকাশক পত্র ভারতী। প্রত্যেকটি গল্পই শুরু করলে শেষ না করে পারা যায় না।

ভয়ের গল্প গুলিতে গা ছমছমে আবহাওয়া এবং নিখুঁত প্লট এর সমাবেশে সত্যজিত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বা শরদিন্দুর কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রতিশোধ, ভূত মানেই চান্স, ৩৮ বিচউড স্ট্রিট বা নিছক একটু ভয় দেখানোয় প্লট এর অভিনবত্ব, সুচারু বাচনভঙ্গী, এবং শুরু থেকে শেষ অব্দি পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখার

ক্ষমতা, লেখক যে একজন দারুণ গল্প বলিয়ে, তারই পরিচায়ক। আবার অন্যদিকে রাজা বাবু কে "ভালো ভূতের গল্প" ঘরানার গল্প বলা যায়। একজন আদ্যন্ত ভালো মানুষের গল্প। স্বাদে গন্ধে লীলা মজুমদার বা শীর্ষেন্দুর কথা মনে করিয়ে দেয়। এর মানবিক আবেদন পাঠকের মনে দাগ কাটে। "প্রতিবেশী" গল্পটিও আলাদা করে উল্লেখ করব যেটি স্থান পেয়েছে পত্র ভারতীর ভয় রহস্য ১০১ সংকলনে। অনুপম পরিবেশ রচনা, সূক্ষ্ম রসবোধ, এই ভৌতিক গল্পটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে।

মানবিক গল্প হিসেবে একটি উল্লেখ যোগ্য গল্প হলো "সুবীর কথা রাখবে তো?" আরও একবার মনে করিয়ে দেয় লেখক এর রচনার একটি বিশেষ দিক হলো মানবিকতা।

"নিধিরামে অপদস্থ" গল্পটি একটি নির্মল হাসির গল্প। পড়ে মনে হয়েছে এখন কেন আর এ ধরণের নির্মল হাস্যরস এর গল্প দেখি না। লেখকের কাছে হাসির গল্পের এই দুর্দিনে প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে।

কল্পবিজ্ঞানের গল্প হিসেবে “পিছনে হাঁটা”, "প্রফেসর ইয়াকোয়ার মৃত্যু রহস্য", বা "কম্পিউটারের অদ্ভুত তিন ভবিষ্যতবাণী" অসাধারণ। আবার মনে করিয়ে দেয় লেখকের নিজস্ব ক্ষেত্র হলো কল্পবিজ্ঞান যেখানে তিনি বিগত ২০ বছর ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন।

আলাদা ভাবে উল্লেখ এর দাবী রাখে "তাজমহল" গল্পটি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এমন অভিনব গল্প আরেকটি পড়েছি বলে তো মনে হয় না। তাজমহল নির্মাণ এর পেছনে লুকিয়ে আছে কোন রহস্য এবং তা কী করে জড়িয়ে আছে আমাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কালচক্রের সাথে জানতে হলে অবশ্যই পড়তে হবে এই গল্প।

উঁহু, এর বেশী আর বলব না গল্প গুলো সম্পর্কে, এখনকার পাঠকেরা যারা এই ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন যে কিশোর সাহিত্যে আর ভালো লেখা হচ্ছে না তারা এই গল্প সংকলনটি অবশ্যই সংগ্রহ করে পড়ে ফেলুন। এবং চটপট সংগ্রহ করে ফেলুন লেখকের অন্যান্য গল্প সংকলন গুলিও। আর এই রকম নতুন নতুন বইয়ের খবর বন্ধুদের জানানোর জন্যে তো আছেই "ম্যাজিক ল্যাম্প"।

ভৌতিক অলৌকিক রিভিউ

তন্ময় বিশ্বাস

ভৌতিক অলৌকিক! শব্দ দুটো সমার্থক হয়েও যেন আলাদা। পৃথক। ভূত মানেই অলৌকিক। কিন্তু, অলৌকিক মানেই ভূত নয়। যাক গে দর্শনের কচকচানিতে না গিয়ে আসি বইটার কথায়।

বইএর গল্প গুলো কে কল্পবিজ্ঞান, ভৌতিক, আর সামাজিক এই তিন ভাগে ভাগ করতে গিয়েও পারলাম না। পড়তে গিয়ে সব বিভাগগুলো যেন মিলেমিশে গেলো। হয়ে গেলো একাকার। কল্পবিজ্ঞানের গল্পে আছে তীব্র মানবিক সত্বা। সামাজিক মূল্য বোধ। কখনো বা রোমাঞ্চ। অনিলিখার সাথে সাথে আমরাও পাড়ি দি 'তাজমহল'এর রহস্য উদঘাটনে। জড়িয়ে পড়ি 'প্রফেসার ইয়াকোয়ার মৃত্যু রহস্য'এ। কখনো বা অংশ নি দূর্দান্ত 'আধঘণ্টার অভিনয়'এ। ভবিষ্যৎ হানা দেয় 'শুধু কুড়ি মিনিট'র জন্য! সামাজিক মূল্য বোধ, দায়বদ্ধতা আছে ভৌতিক গল্প গুলোতেও। এক মাস্টার মশাই ফিরে আসে। তার ছাত্রের কাছে। তার একটাই চিন্তা 'সুবীর কথা রাখবে তো'? কখনো বা একজন উপকারি মানুষকে ভূতেরা বানিয়ে ফেলে তাদের 'রাজাবাবু'। আছে অশরীরির 'প্রতিশোধ'। কখনো 'দিনটা খুব ইন্টারেস্টিং' করে তোলে ভিনগ্রহি অশরীরী! '৩৬ বিচিউড

স্ট্রিট' থেকে 'পিছনে হাঁটা'। রহস্য আর রোমাঞ্চ। আসলে সবই চান্স অফ ফ্যাক্টার।'ভুত মানেই চান্স'। তাই না? শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না। থেকে যায়। মনের কোনও এক গভীরে ছাপ ফেলে যায় টানটান মেদহীন ভাষা আর নিটোল গল্পের প্লট। সুদীপ্ত মণ্ডলের অলংকরণ ভালোই লাগল। তবে সব অলংকরণ রঙিন ছাপা হলে আরো ভালো লাগতো। সব মিলিয়ে অবশ্য সংগ্রহযোগ্য বই। তবে বইটার ট্যাগলাইনে 'ভুত বিশ্বাসী রাতে পড়বেন না' এই ধরণের সতর্কবার্তা সম্পূর্ন নিষ্প্রয়োজন। আমার মনে হয় এতে বইএর ক্ষতি। পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন হরর বই এটি নয়। যে কোনও ভূত বিশ্বাসী বইটা রাতে পড়তে পারেন। নিশ্চিন্তে।

ভৌতিক অলৌকিক রিভিউ

সহেলী চট্টোপাধ্যায়

ভৌতিক আর অলৌকিক এই দুটো শব্দ এক সাথে শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মোট আঠারোটি গল্পের মধ্যে কল্পবিজ্ঞান ও আছে কয়েকটা। আমি ভূতের গল্প ই বেশি পছন্দ করি। রাতে পড়তে মানা করা হলেও বইটা আমি রাতেই পড়েছি। আসলে রাত্তিরে এই ধরণের বই পড়ার মজাটাই আলাদা।

প্রথম গল্প ‘প্রতিশোধ’। অসাধারণ একটা গা ছমছমে পরিবেশ তৈরি করেছেন লেখক ট্রেনের কামরার মধ্যে। শুধু পরিবেশ নয়, প্লটও যথেষ্ট গা ছমছমে। তবে বেশি ভয় নেই। তার দরকারও নেই।

‘নিছক একটু ভয় দেখানো’ শুরু হয়েছিল নিছক একটু মজা থেকে। সেটা যে শেষ পর্যন্ত এমন সাংঘাতিক রসিকতায় গিয়ে দাঁড়াবে আন্দাজ ও করতে পারিনি।

‘ভূত মানেই চান্স’ এর শুরুটা বেশ আড্ডার ছলে। তারপর পরিস্থিতি ঘুরে যায় সম্পূর্ণ অন্য খাতে।

‘দিনটা খুব ইন্টারেস্টিং’ পড়ে মনে হল আমার ও দিনটা এমন ইন্টারেস্টিং হলে খুব ভালো হত।

‘শুধু কুড়ি মিনিট’ আমি দম বন্ধ করে পড়েছি। শেষ দিকটা পাঠক বারবার পড়বে। বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু গল্প আছে যেখানে শেষের দিকটা পাঠক বার বার করে পড়ে।

‘নীলকুঠিতে কিছুক্ষণ’ থাকলে অতীতে পৌঁছে যেতে আপনি বাধ্য।

অতীত , ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের অদ্ভূত মিশেল ‘তাজমহল’। এরকম গল্প আগে কখনও পড়েছি বলে ঠিক মনে পড়ছে না।

‘প্রতিবেশী’ মজার গল্প। যদিও এতে বেশ সাসপেন্স আছে। একটা গল্পের মধ্যে এত রকম স্বাদ আনা খুব কঠিন। অভিজ্ঞান রায় চৌধুরীর কাছে অবশ্য খুব সহজ কাজ।

‘চশমা আর অপ্রস্তুতবাবু’ একটি ভিন্ন স্বাদের ভূতের গল্প। এমন একটা চশমা যদি আমিও পেতাম!

‘প্রফেসার ইয়াকোয়ার মৃত্যু রহস্য’ ঠিক পরিস্কার হল না আমার কাছে।

‘নিধিরাম অপদস্থ’ বেশ মজার গল্প। তবে এটিও সায়েন্স ফিকশান।

‘আধঘণ্টার অভিনয়’ এবং ‘ঠিক বিচার’ উন্নত মানের দুটি সায়েন্স ফিকশান। শেষ দিকটা মন খারাপ করে দেয়।

আবার ভূতের কথায় ফিরে আসি। ‘সুবীর, কথা রাখবে তো!’ এবং ‘রাজাবাবু’ ভূতের গল্প। ‘রাজাবাবু’ ভীষণ রকম পজিটিভ একটা গল্প। জীবনের ইতিবাচক দিক উঠে এসেছে এখানে আর এই জন্যই গল্পটা আমি এগিয়ে রাখব ।

'কম্পিউটারের তিন ভবিষ্যদবাণী' শুনলে আপনারা ঠকবেন না (অর্থাৎ পড়লে)। বরং লাভবান হবেন।

'আমার সময় নেই' কথাটা কারণে অকারণে আমরা অনেক লোককেই বলতে শুনেছি। আমরাও ব্যাবহার করি মাঝে মাঝে অথবা প্রায়ই। যাদের সময় একদমই নেই একটু দম ফেলার বা পরিবারের জন্য তারা দয়া করে একটু সময় বার করে 'পিছনে হাঁটা' গল্পটা একবার পড়ে নেবেন। আপনার সময় না বাড়লেও দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত বদলে যাবে।

'৩৮ বিচউড স্ট্রিট' থেকে ঘুরে আসুন একবার। মন্দ লাগবে না গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। তবে আমি আর যাচ্ছি না এই রাস্তায়। কী জানি কী ভাবে আবার ওদের সাথে দেখা হয়ে যায়!

শেষে একটা কথা বলার আছে যারা ভূত – প্রেত ভালোবাসেন অথবা সায়েন্স ফিকশান তারা অবশ্যই বইটি একবার পড়ে দেখবেন। লেখকের কাছ থেকে আর ও এরকম কিছু বা এর চেয়েও ভালো কিছু পাবো সবাই আশা রাখছি।

ভৌতিক অলৌকিক - অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

সৌগত সেনগুপ্ত

সমসাময়িক বাংলা কিশোর সাহিত্যে অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী এক পরিচিত নাম। শ্রী রায়চৌধুরী গত কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে শুধুমাত্র ছোটদের জন্য লিখে চলেছেন। যদিও ওনার লেখার বিষয় প্রধানত কল্পবিজ্ঞান, উনি ভৌতিক এবং অলৌকিক কাহিনি লিখতেও একই রকম পারদর্শী। সেটা কেমন? জানতে হলে পড়তেই হবে ভৌতিক অলৌকিক নামের এই বইটি।

ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অনীশ দেব-এর পর ভৌতিক অলৌকিক নামে এবারে অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর সংকলন প্রকাশ করেছে পত্র ভারতী। ১৮টি গল্পের এই সংকলনের দাম মাত্র ২০০ টাকা। প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন সুদীপ্ত মন্ডল।

এই বই এর প্রতিটি কাহিনি হয় কোনও ভৌতিক ঘটনা নিয়ে, না হয় কোনও অলৌকিক ঘটনা নিয়ে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। কিছু কাহিনির পটভূমি ইংল্যান্ড বা আমেরিকা, কিছু আমাদের দেশের, এমন কি আমাদের রাজ্যের পটভূমিতে লেখা। ভালো ভূত খারাপ ভূত উপকারী কিংবা অপকারী সব রকমের ভূতের সঙ্গে মোলাকাত হবেই আপনার।

এছাড়াও কিছু বিজ্ঞান নির্ভর কাহিনি আছে যা আপাত দৃষ্টিতে অলৌকিক মনে হলেও আজ তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখা সম্ভব। মূলত এই ধরনের কাহিনিতে আমরা অনিলিখাকে পেয়ে থাকি। আধঘন্টার অভিনয়, প্রফেসার ইয়াকোয়ার মৃত্যুরহস্য, কম্পিউটারের অদ্ভুত তিন ভবিষ্যদবাণী এই রকম কাহিনির উদাহরন।

কাজেই ভৌতিক পরিবেশ বজায় রাখতে হলে, চটপট কিনে ফেলুন বইটা আর ডুবে যান ভৌতিক আবহে। শেষে প্রকাশকের মত আমিও বলব, যথেষ্ট সাহস না থাকলে বইটি রাতে পড়বেন না।

ভৌতিক অলৌকিক রিভিউ

ঋজু গাঙ্গুলি

ছোটদের জন্যে লেখা যে কত বড় আর কঠিন কাজ, সেকথা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে নবাগত এবং প্রতিষ্ঠিত সব লেখকই জানেন। অথচ অনেকের কাছেই শুনেছি যে গোয়েন্দা, হাসি বা ভূত: এই তিনের যে কোন একটি উপাদান নিয়ে কিছু একটা লিখে ফেললেই সে লেখা নাকি ছোটদের পছন্দ হতে বাধ্য। আলোচ্য বইটির রিভিউ করতে গিয়ে তাই প্রথমেই যে কথাটা মনে হয় তা হল: বইটির প্রকাশক "পত্র ভারতী" নির্ঘাৎ উপরোক্ত সরলীকৃত ফান্ডাটা কিছুটা হলেও বিশ্বাস করেন, নইলে শিশু-কিশোর সাহিত্যে এই সময়ের অন্যতম সেরা গল্পকারের এমন চমৎকার একঝাঁক ছোটগল্পের বিপণন করতে গিয়ে "ভূত-বিশ্বাসীরা খবর্দার (বানান ফ্ল্যাপ থেকে) রাতে এই বই কখনই পড়বেন না।" লিখে বাজার গরম করার চেষ্টা করতেন না।

এবার আসা যাক গল্পের কথায়। শিরোনাম-হীন একটি অন্তরঙ্গ প্রাককথনের পর এই বইতে যে গল্পগুলো এসেছে তারা হল:

1. প্রতিশোধ: এই বইয়ের দুর্বলতম এবং নানাবিধ অসংগতিতে ভরা গল্পটি দিয়ে বইটা শুরু বলে প্রথমেই হোঁচট খেতে হয়। এই ধরণের গল্প বছর পঁচিশেক আগে রেডিওতে শুনে ভালো লাগত, কিন্তু আজকের যুগে গল্পের ত্রুটিগুলো বড্ড বেশি করে ধাক্কা দেয়।
2. নিছক একটু ভয় দেখানো: এই নিটোল ছোটগল্পটি দিয়েই বইটা শুরু হওয়া উচিত ছিল, যাতে লেখকের মাপা হাতের ছোঁয়ায় 'কহানি মে ট্যুইস্ট'-টা দারুণ উপভোগ্য হয়েছে।
3. ভূত মানেই চান্স: প্রথম গল্পটার তুলনায় ভালো, কিন্তু শেষের চমক (যেটা একটু আলাদা রকমেরই ছিল) - সত্ত্বেও গল্পটা আমার খুব ভালো লাগেনি।
4. দিনটা খুব ইন্টারেস্টিং: এটা ভূতের গল্প নয়, কল্পবিজ্ঞানের গল্পও নয়। তবে উদ্ভট রসের গল্পটা ছোটদের মুখে হয়তো এক ঝলক মুচকি হাসি ফোটালেও ফোটাতে পারে।
5. শুধু কুড়ি মিনিট: এ কি লেখকের কমফোর্ট জোনে ফিরে আসার ফল, নাকি সম্পাদকীয় ঘ্যানঘ্যানানি বা ফরমায়েশ না থাকায় মুক্তির প্রকাশ? কল্পবিজ্ঞান-ভিত্তিক এই গল্পটি পড়ে এক ঝটকায় খুঁজে পাওয়া যায় সেই লেখককে, যাঁর কলম বিজ্ঞান-সুবাসিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি পড়ার ক্ষেত্রে আজকের প্রজন্মকে সব থেকে বেশি করে উৎসাহিত করেছে। দুর্দান্ত গল্প!
6. নীলকুঠিতে কিছুক্ষণ: বেশ ভালো ভাবে শুরু করেও গল্পটা বড্ড তাড়াতাড়ি প্রেডিক্টেবল হয়ে পড়ল, আর তার ফলে একটা গা-ছমছমে সেটিং নিয়েও লেখকের চেষ্টাটা মাঠে, বা নীলকুঠিতে মারা গেল।
7. তাজমহল: এই বইয়ের সেরা লেখা এই গল্পটি, যা ভৌতিক নয়, অলৌকিক তো নয়ই। ইতিহাস, কল্পবিজ্ঞান, আর বিশুদ্ধ ফ্যান্টাসি দিয়ে গড়া, এবং বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কিছু কল্পবিজ্ঞান কাহিনিকে মনে করিয়ে দেওয়া এই গল্পটি (নাকি ঘনাদার উদ্দেশ্যে অনিলিখার শ্রদ্ধাঞ্জলি?) সত্যিই ফ্যান্টাস্টিক!

8. প্রতিবেশী: অ..সা..ধা..র..ণ বললেও কম বলা হবে এই গল্পটিকে। কৌতুক, ভয়, রোমাঞ্চ, এবং শেষের "হঠাৎ আলোর ঝলকানি" হয়ে আসা সত্যিটা, এই সব মিলিয়ে গল্পটাকে যেখানে নিয়ে গেছে তা অভাবনীয়। যেসব পাঠক এই গল্পটা প্রথমবার পড়বেন, এখন থেকেই তাঁদের ব্যাপকভাবে হিংসে করতে শুরু করেছি।

9. চশমা এবং অপ্রস্তুতবাবু: একটি ফিল-গুড ফ্যান্টাসি, যা আদ্যন্ত প্রেডিক্টেবল হলেও সুপাঠ্য বলে পড়তে ভালোই লাগে।

10. প্রফেসর ইয়াকোয়ার মৃত্যুরহস্য: এই গল্পটি ইতিমধ্যেই লেখকের অন্য একটি সংকলনে স্থান পেয়েছে, তাই এর বদলে অন্য গল্প দিলে ভালো হত। তবে কল্পবিজ্ঞান আর মূল্যবোধ মিশিয়ে লেখা এই গল্পটা আবারও পড়তে ভালোই লাগে।

11. নিধিরামে অপদস্থ: শীর্ষেন্দুর টপ ফর্মে লেখা গল্পগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এই নির্মল হাসির গল্পটি। ছোট হোক, বা বড়, পাঠক মাত্রেই এই গল্পটি মুচকি-মুচকি হেসে উপভোগ করবেন: এমনটা আশা করাই যায়।

12. আধঘন্টার অভিনয়: অলৌকিক মানে আসলে আলো-আঁধারির জগৎ, যেখানে সত্যের জোরালো আলো পড়লে বোঝা যায়: সবটাই ফাঁকি। কিন্তু সত্যিই কি তাই হয়? অনিলিখাকে কেন্দ্রে রেখে লেখা এই অসাধারণ গল্পটি প্রথমে ভয়, পরে অলৌকিক রস, আর শেষে তার মানবিকতায় পাঠককে এমনভাবে স্পর্শ করে, যে গল্পটার রেশ তা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও থেকে যায় অনেক-অনেক সময় ধরে।

13. ঠিক বিচার: ভূত আর কল্পবিজ্ঞান, দুয়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও ঠিক কোনও গোত্রেই ফেলা যাবেনা এই গল্পটিকে। কিন্তু তবুও, গল্পটাকে আপনি চট করে খরচের খাতায় ফেলেও দিতে পারবেন না। কেন? সেটা আপনাকে পড়ে দেখতে হবে।

14. সুবীর, কথা রাখবে তো!: ছকে বাঁধা শুরু, আদ্যন্ত চেনাজানা সেটিং, কিন্তু তবু গল্পটাকে ভোলা অসম্ভব তার মানবিকতার জন্যে, তার ছত্রে-ছত্রে ভেসে আসা সেই আকুতির জন্যে, যা হয়তো আমাদের সবার মনে প্রতিধ্বনিত হয় নিজের দেশের কথা ভাবলেই। এ গল্প নিছক ভূতের নয়, তার চেয়ে অনেক ওপরে এর স্থান।

15. রাজাবাবু: আর একটি ফিল-গুড ফ্যান্টাসি, যেমনটি আমরা এক সময় পেতাম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলমে। লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই হচ্ছে এমন সহজ আর মন-ভালো-করা গল্পটি উপহার দেওয়ার জন্যে।

16. কম্পিউটারের অদ্ভুত তিন ভবিষ্যদ্বাণী: অনিলিখার আরেকটি টানটান কাহিনি, যা বিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান, "ক্রাইম ডাজ নট পে", "তাহলে কি...?" এইসব মিলিয়ে শেষ হয়েও শেষ হয়না, বরং একগাদা প্রশ্নের জন্ম দেয়। কিন্তু লেখক কি গল্পের শিরোনাম হিসেবে একটা গোটা বাক্য ছাড়া কিছু পাননি?

17. পিছনে হাঁটা: ভূত আছে, কল্পবিজ্ঞানও আছে, কিন্তু এই গল্পের কেন্দ্রে আছে একটাই সত্যি, যা লালনের গানে আমরা শুনেছি, অথচ বুঝিনি: "এমন মানব জনম আর কি হবে, মন যা কর ত্বরাই কর এই ভবে"।

18. ৩৮ বিচউড স্ট্রিট: গা-ছমছমে এই গল্পটা পড়তে বেশ লাগে, যদিও সত্যজিৎ আর শরদিন্দু-র গল্পের যে কোন পাঠকই বুঝে যাবেন যে গল্পে কী ঘটতে চলেছে।

বইটি সুমুদ্রিত। সুদীপ্ত মণ্ডলের আঁকা প্রচ্ছদ আর অলংকরণ কোথাও কোথাও ফ্ল্যাট হলেও মিনিমালিস্ট সাদা-কালো আঁকায় দারুণ (যেমনটা আছে "আধঘন্টার অভিনয়"-তে)। তবে বইটার সবথেকে বড়ো খুঁত দুটো:

(১) গল্পগুলোর প্রথম প্রকাশ সংক্রান্ত কোন তথ্যই এতে নেই। ফলে সময়ের সাথে লেখকের কলমের বিবর্তন বোঝার কোন উপায় পাঠকের কাছে নেই।
(২) গল্পগুলোর বেশির ভাগই নির্ভেজাল ছোটগল্প হিসেবেও রসোত্তীর্ণ। তা সত্ত্বেও 'ডরনা জরুরি হ্যায়' স্টাইলে বইয়ের ফ্ল্যাপ, ব্যাক-কভার, প্রাককথন: সর্বত্র কেন যে গা-জোয়ারি করে "ভয় পাও, ভয় পাও" মন্ত্র জপা হয়েছে, সেটাই বুঝলাম না।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন এটি নয়, কিন্তু ভূত না খুঁজে নিটোল গল্পের সন্ধানে যদি বেরিয়ে থাকেন, তবে এই বইয়ের স্টপেজে দু'দণ্ড জিরিয়ে নিন। বলা তো যায়না, হয়তো এই জায়গাটা আপনার সত্যিই ভালো লেগে গেল। আর আপনার মত একজন পাঠককে পেয়ে লেখক আমাদের উপহার দিয়ে চললেন আরও ভালো লেখা। অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী-র গল্প জগতে আপনাকে স্বাগতম।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

____

(লেখকদের মতামত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)

গোলটেবিল::

"টাকা জিনিসটা আমার কাছে খুবই মূল্যবান মিস্টার বাগচী। তবে একটা জটিল রহস্যভেদ করার আনন্দ তার চেয়েও দামি।" (গুপ্তধনের গুজব) "ঠিকঠাক কেস হলে এই প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি কখনই টাকার হিসেব করে না।" (আরাকিয়েলের হীরে)

মিতিন, নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে শাণিত চেহারার বুদ্ধিদীপ্ত এক তরুণীর মুখ। থার্ড আই এর প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। প্রজ্ঞাপারমিতা হলেন বৌদ্ধদের দেবী যিনি জ্ঞান দান করেন, অনেকটা আমাদের সরস্বতীর মতো। মিতিনের তাই প্রজ্ঞাপারমিতা নাম সার্থক। বোনঝি টুপুর মিতিনের সহকারী। আবার স্বামী পার্থও তাকে কম সাহায্য করে না রহস্য উন্মোচনের ব্যাপারে। আবার অনেক টিটকিরিও মারে মাসি বোনঝি কে। পার্থ আর মিতিন সমবয়সী। পার্থ প্রেসে কাজ করে। রবিবার ছুটির দিনটুকু একটু আয়েস করে কাটাতে ভালোবাসে। আর ভালোবাসে খেতে, প্রকৃত অর্থেই সে খাদ্য রসিক। এমন কী ভালো রান্নাও পারে। গুপ্তধনের গুজব উপন্যাসে আমরা দেখেছি ক্লান্ত মিতিন আর টুপুরের জন্য রান্না করে থালা সাজিয়ে দিচ্ছে পার্থ। সেদিন মিতিন আর টুপুরের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছিল। পার্থর কল্পনাশক্তি প্রখর, মাঝে মধ্যে নিজের সম্পর্কে একটু বাড়িয়ে বলে ফেলে। জাস্ট মজা করার জন্য, তবে সন্তুর বন্ধু জোজোর মতো অতোটাও নয় (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু আর সন্তু সিরিজ)। পুরানো কোলকাতার বিষয়ে অনেক খবর রাখে। মাঝে মাঝে টুপুর কে জ্ঞান বিতরণ করে। শব্দ-জব্দ, সুদোকুর সমাধান করতে ভালোবাসে।

মিতিন নিজে অনেক বড় মাপের ডিটেকটিভ, পুলিশের উপর মহলের লোকেরাও মাঝে মাঝে মিতিনের পরামর্শ নিতে আসে। অপরাধতত্ত্বের সমস্ত বিভাগ নিয়ে দিনরাত চর্চা করে। ফরেন্সিক সায়েন্স, অপরাধীদের মনঃস্তত্ত্ব, নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্রের খুঁটিনাটি, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, নানা রকম আইন সব কিছু নিয়েই চর্চা করে মিতিন। পুরানো জটিল কেস গুলো নিয়েও চিন্তা করে। কিন্তু কেউ প্রশংসা করলেই উড়িয়ে দিয়ে বলে, "গ্রেট-ফেট কিছুই নই। শুধু চোখ-কানটা খোলা রাখি। মনের দরজাটাও। ভাবনা চিন্তা তৈরি হওয়াটাও একটা প্রসেস। এর জন্য প্রয়োজন চর্চা, অধ্যাবসায়, আর নিষ্ঠা। আর একটু কমনসেন্স"। (কেরালায় কিস্তিমাত)। এই গুণগুলো তার মধ্যে পুরো মাত্রায় আছে।

দিনরাত অপরাধতত্ত্ব নিয়ে পড়ে থাকলে কী হবে? সে নিজেও পাকা রাঁধুনি। মাঝে মাঝেই আরতিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রান্না করতে শুরু করে দেয়। 'টিকরপাড়ার ঘরিয়ালে'ও মিতিন কে রান্না করতে দেখা গেছে। যখন যেটা করে মিতিন সমান মনোযোগ দিয়েই করে, তা সে ডিমের কালিয়াই হোক বা গোয়েন্দাগিরিই হোক। "ঝটাঝট বেগুন কাটছে, কচাকচ লঙ্কা কুচোচ্ছে, টুপুর চার খানা ডিম ছাড়ানোর আগেই এক ডজন খোসা জড়ো করে ফেলল। শসা, টম্যাটোয় নুন, লেবু মাখিয়ে স্যালাডও রেডি হয়ে গেল এক প্লেট"। (টিকরপাড়ার ঘরিয়াল) ছেলে বুমবুমকেও অনেকটা সময় দিতে হয় মিতিনকে। বুমবুম ভালোবাসে চিপস খেতে আর ভিডিও গেম খেলতে। বিশেষ করে রোড র‍্যাশ তার খুব পছন্দের গেম।

আর আমাদের টুপুর স্কুলের ছুটি পড়লেই মাসির কাছে চলে আসে। রহস্যের পেছনে ছুটতে ওর দারুণ ভালো লাগে। অবশ্য মিতিনমাসির বাড়ির নিত্য নতুন রান্নার আকর্ষণও আছে একটা। টুপুরের মা সহেলির পছন্দ নয় যে টুপুর এখন থেকেই মিতিনমাসির ল্যাঙবোট হয়ে ঘুরুক। ভদ্রমহিলা ভীষণ আরামপ্রিয়। হাউজ ওয়াইফ। মার্কেটিং করতে ভালোবাসেন। আর ভালোবাসেন ঘর সাজাতে। মিতিনের একদম উল্টো। বরং পার্থ'র সাথে মেলে কিছুটা। টুপুরের ভালো নাম ঐন্দ্রিলা। ওর বাবা অবনী ইতিহাসের অধ্যাপক। ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বেড়াতে গেলেও মোটা মোটা বই সঙ্গে নিয়ে যান। নীরস প্রবন্ধের বই। পার্থর সঙ্গে দাবা খেলতে ভালোবাসেন। ইতিহাস চর্চা শুধু তাঁর পেশা নয় নেশাও বটে। টুপুরকে সাপোর্ট করেন। ওরা হাতিবাগানে থাকে। মিতিন মাসি থাকে ঢাকুরিয়ায় ।

অপরাধীদের সঙ্গে লড়তে গেলে নিজেকে সুস্থ রাখাটা খুব দরকার। চাই নিয়মিত শরীর চর্চা। মিতিন নিয়মিত শরীরচর্চা করে। ক্যারাটের প্যাঁচ পয়জার গুলো ওর ভালোই জানা আছে। বেশ অনেকবার মিতিনকে আমরা মারপিট করতে দেখেছি। 'সর্প রহস্য সুন্দর বনে'তার মধ্যে অন্যতম। এই উপন্যাসে মিতিনকে রিভলবারও ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে চালাবার প্রয়োজন পড়েনি।

স্বাস্থ্য সচেতন মিতিন দোকানের স্যালাড খায় না পারতপক্ষে, এমন কী বাড়ির কাউ কে খেতে দেয় না। বেশিক্ষণ কেটে রাখা শশা পেঁয়াজে নাকি জীবাণু টানে খুব। (হাতে মাত্র তিনটে দিন) মাঝে বেশ কিছুদিন বাড়িতে শুধু স্বাস্থ্যকর খাবার বানাতো, তবে শেষ পর্যন্ত সেই রুটিন আর বজায় রাখা যায়নি। (মারকুইস স্ট্রিটে মৃত্যু ফাঁদ) এই প্রসঙ্গে পুলিশের ডি.আই.জি. অনিশ্চয় মজুমদার কে ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। ডাক নাম ভেল্টু। এই মানুষটিও বেশ খাদ্যরসিক। বপুটিও বিশাল। বেশ অনেক উপন্যাসেই মিতিনের শরনাপন্ন হয়েছেন মিস্টার মজুমদার অথবা মিতিন তাঁর সাহায্য নিয়েছে।

মিতিনের জেরা করবার ধরণটিও বেশ লক্ষ্য করবার মতো। ক্রমাগত কথা চালাচালি করে সুন্দর ভাবে সহজ করে দেয় অপর পক্ষকে। তবে মিতিনের প্রথম আত্মপ্রকাশ কিন্তু বড়দের জন্য। প্রথম উপন্যাস 'পালাবার পথ নেই' একসময় রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে প্রকাশিত হত। এছাড়াও 'বিষ', 'মারণ বাতাস', 'তৃষ্ণা মারা গেছে' প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য লেখা হয়েছিল। এই গল্পগুলোয় টুপুর নেই, এখানে মিতিনের সহকারী পার্থ। কিশোরদের জন্য মিতিনের প্রথম আবির্ভাব 'সারাণ্ডায় শয়তান' উপন্যাসে। (পুজোসংখ্যা আনন্দমেলা ২০০২)

মিতিন, পার্থ, টুপুর আর বুমবুম সিঙ্গাপুর ঘুরতে যায় 'ছকটা সুডোকুর' উপন্যাসে। ভারতীয় সেনা বিভাগের গোপন তথ্য বিদেশে পাচার করে দিচ্ছিল এক চক্র। মিতিনের হস্তক্ষেপে এই সমস্যার সমাধান হয়।

সিঙ্গাপুরে মিতিন আর টুপুর কে নানা রকম বিদেশী ডিশ টেস্ট করতে দেখা গেছে। যেমন বাটার টোস্ট, টার্কি সসেজ, স্ক্রাম্বলড এগ, পিৎজা, পাস্তা, নাশিং গোরে, শুশি, স্কুইড ভাজা। শুধু রেস্টুরেন্ট এর মালকিনকে বোঝানো গেল না বলে বেবি অক্টোপাস আর চাখা হল না। তবে পার্থর মুখে বিদেশী খাবার বিশেষ রোচে না। প্রত্যেকটা উপন্যাসেই জমিয়ে খাওয়া দাওয়ার বর্ণনা। মনে হয় সুচিত্রা ভট্টাচার্য নিজেও খাদ্য রসিক ছিলেন। তাই মিতিন, পার্থ, টুপুরও ভালো খেতে ভালবাসে। এর আগে মতি নন্দীর কলাবতী সিরিজে খাওয়া দাওয়ার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। পাঠকদের জিভে জল সামলে রাখা বেশ কঠিন হয়ে যায়।

তবে মিতিনের উপন্যাস গুলোর একটা বিশাল প্লাস পয়েন্ট হল বিভিন্ন সম্প্রদায় যাদের আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলি তাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ইহুদী, আর্মেনিয়ান, পারসিক, চীনা, জৈন ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে বহু জানা অজানা তথ্য আমাদের সমৃদ্ধ করে। তাদের সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, খাদ্যাভাস, উৎসব –অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি আমরা। আর্মেনিয়ানদের বড়দিনের উৎসব হয় ৬ জানুয়ারী। ২৫ শে ডিসেম্বর তারা শুধু একটা মোমবাতি জ্বালায়। (আরাকিয়েলের হিরে) চীনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল মুন ফেস্টিভাল (ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য)। আর পারসিকদের নোওরোজ। (হাতে মাত্র তিনটে দিন) আর নিষ্ঠাবান জৈনরা ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা জল পর্যন্ত খায় না। অনেক জীবাণু নাকি মারা যায় তাতে (দুঃস্বপ্ন বারবার)।

শুধু তাই নয় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অতীত ইতিহাস সম্পর্কেও বহু মুল্যবান তথ্য পাই শুধু মাত্র এই মিতিন মাসির অ্যাডভেঞ্চার গুলো পড়ে। অদ্ভুত একটা ভালো লাগার সৃষ্টি হয়।

এবার তোমাদের মিতিন আর টুপুরের অ্যাডভেঞ্চারগুলোর একটা তালিকা দিয়ে দিই।

১। সারাণ্ডায় শয়তান --- ২০০২
২। জোনাথনের বাড়ির ভূত --- ২০০৩
৩। কেরালায় কিস্তিমাত --- ২০০৪
৪। সর্প –রহস্য সুন্দরবনে---২০০৫
৫। ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য---২০০৬
৬। ছকটা সুডোকুর ---২০০৭
৭। আরাকিয়েলের হিরে ---২০০৮
৮। গুপ্তধনের গুজব --- ২০০৯
৯। হাতে মাত্র তিনটে দিন ---২০১০
১০। কুড়িয়ে পাওয়া পেন ড্রাইভ--- ২০১১
১১। মারকুইস স্ট্রিতে মৃত্যু ফাঁদ ---২০১২
১২। টিকরপাড়ার ঘড়িয়াল --- ২০১৩
১৩। দুঃস্বপ্ন বারবার ---২০১৪
১৪। স্যান্ডার সাহেবের পুঁথি ---২০১৫

‘কুড়িয়ে পাওয়া পেন ড্রাইভ’ বাদে বাকি সমস্ত উপন্যাস আনন্দ থেকে প্রকাশিত। ‘কুড়িয়ে পাওয়া পেন ড্রাইভ’ প্রকাশিত হয়েছে পত্রভারতী থেকে।

সুচিত্রা ম্যাডাম চলে গেলেও মিতিনমাসি, টুপুর, পার্থ, বুমবুম রয়ে যাবে চিরদিনের জন্য। তাই শেষ বলে কিছু নেই। অনেক নতুন পাঠক আসবে মিতিনদের জানতে আর আমরা পুরানো পাঠকরা বার বার ফিরে দেখব মিতিন মাসির অ্যাডভেঞ্চার গুলোকে। হারিয়ে যাবো কখনও ঝাড়খণ্ড কখনও কেরালায় কখনও সুদূর সিঙ্গাপুরে কখনও বা হিমাচলে, কখনও আবার লাদাখে!

ছবিঃ পুস্পেন মণ্ডল

কমিকস ::

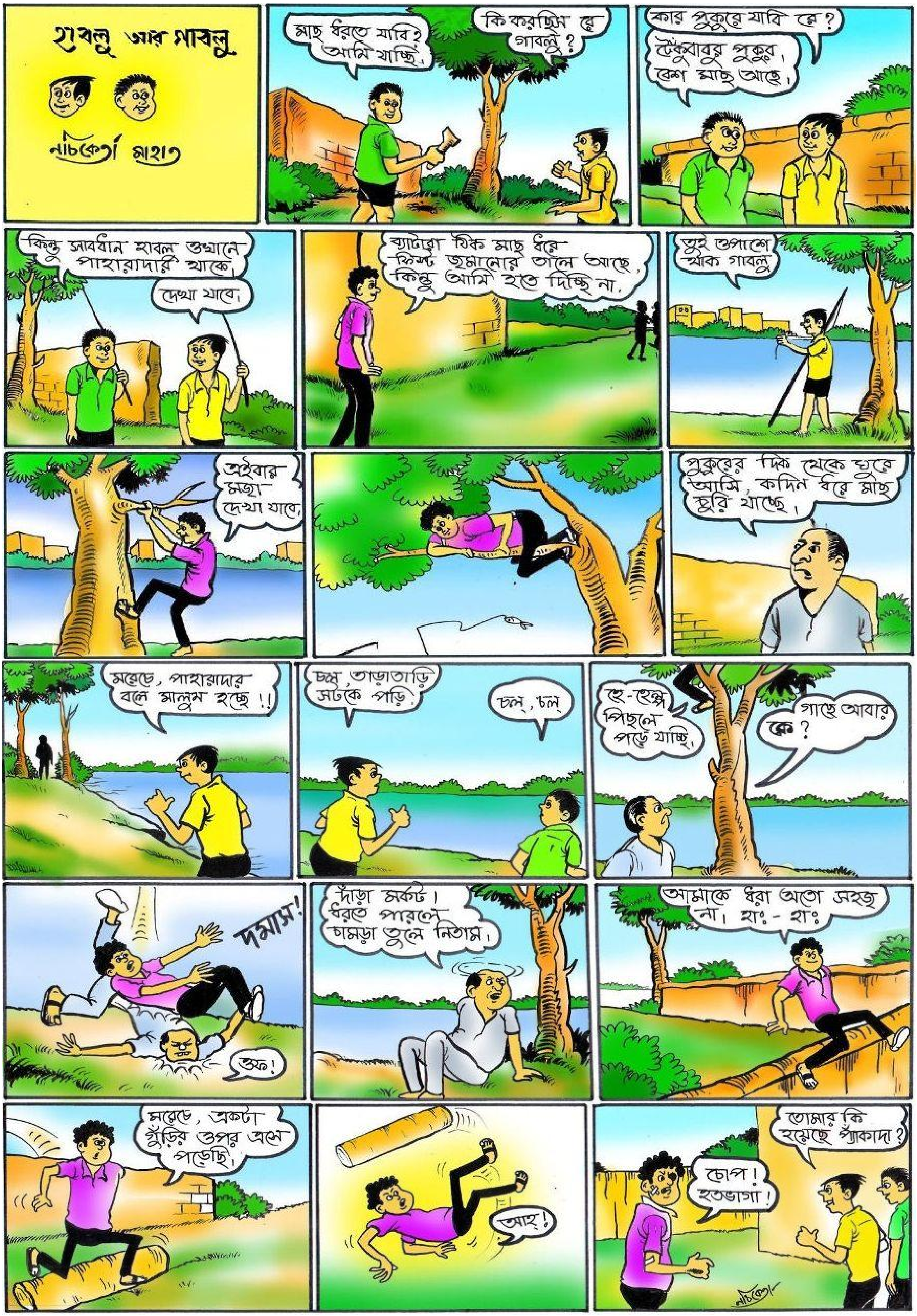
হাবলু আর গাবলু
নচিকেতা মাহাত
মাছ ধরতে যাবি? আমি যাচ্ছি।
কি করছিস রে গাবলু?
কার পুকুরে যাবি রে?
টেঁকুবাবুর পুকুর, বেশ মাছ আছে।
কিন্তু সাবধান হাবল ওখানে পাহারাদারি থাকে।
দেখা যাবে।
ব্যাটারা ঠিক মাছ ধরে ফিস্ট জমানোর তালে আছে, কিন্তু আমি হতে দিচ্ছি না।
তুই ওপাশে থাক গাবলু
এইবার মজা দেখা যাবে।
পুকুরের দিক থেকে ঘুরে আসি, কদিন ধরে মাছ চুরি যাচ্ছে।
মরেছে, পাহারাদার বলে মালুম হচ্ছে!!
চল্, তাড়াতাড়ি সটকে পড়ি।
চল্, চল্
হে-হেল্প পিছলে পড়ে যাচ্ছি।
গাছে আবার কে?
দমাস!
উফ!
দাঁড়া মর্কট। ধরতে পারলে চামড়া তুলে নিতাম।
আমাকে ধরা অতো সহজ না। হাঃ-হাঃ
সরেছে, একটা গুঁড়ির ওপর এসে পড়েছি।
আহ!
তোমার কি হয়েছে প্যাকাদা?
চোপ! হতভাগা!

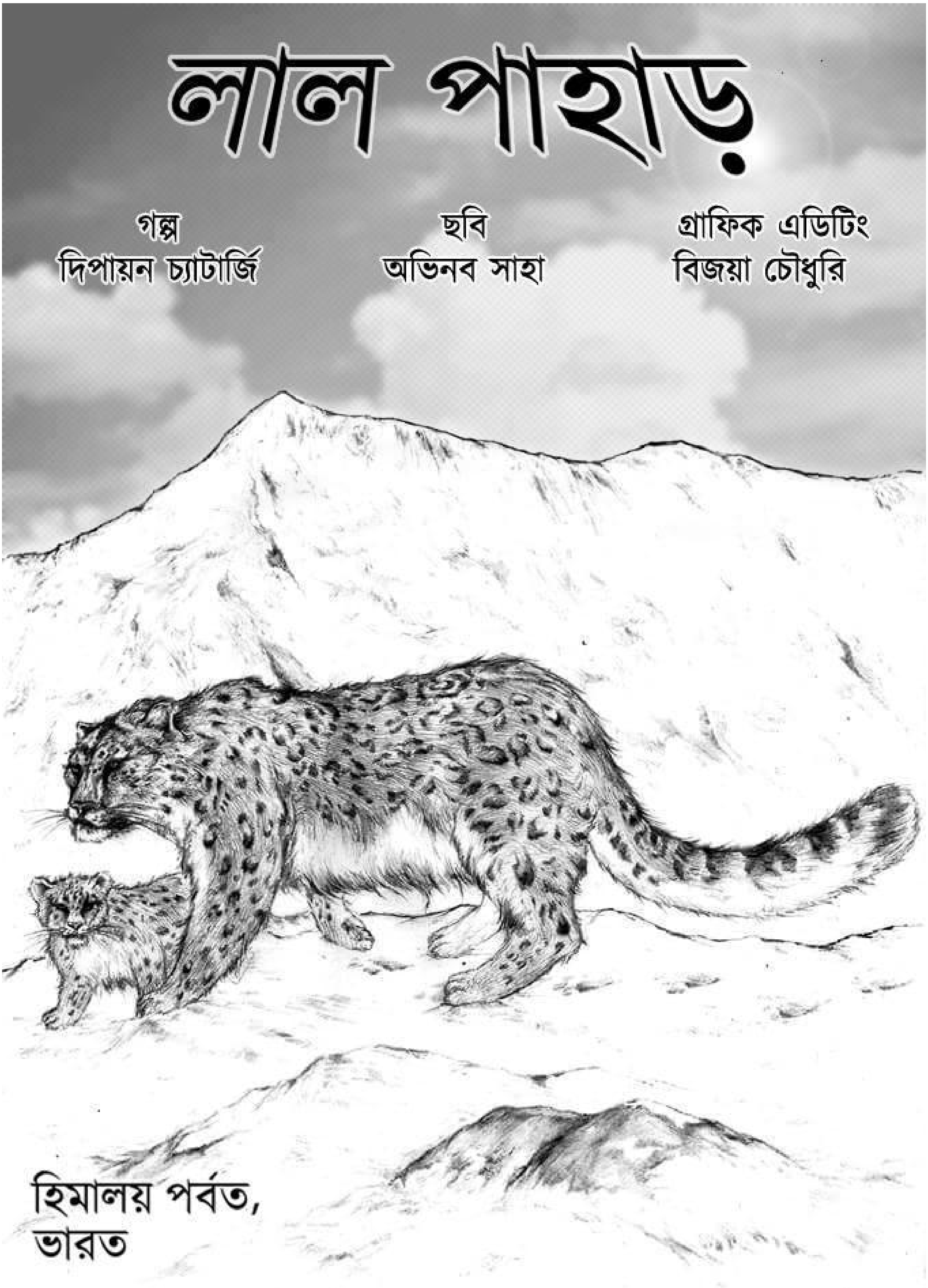
লাল পাহাড়
গল্প
দিপায়ন চ্যাটার্জি
ছবি
অভিনব সাহা
গ্রাফিক এডিটিং
বিজয়া চৌধুরি
হিমালয় পর্বত,
ভারত

!!
দিদি... ওই দেখ!!
বাঃ! স্নওলেপার্ড!
খুব সুন্দর প্রাণী!
ক্লিক!!
ক্লিক!!
ক্লিক!!
ক্লিক!!

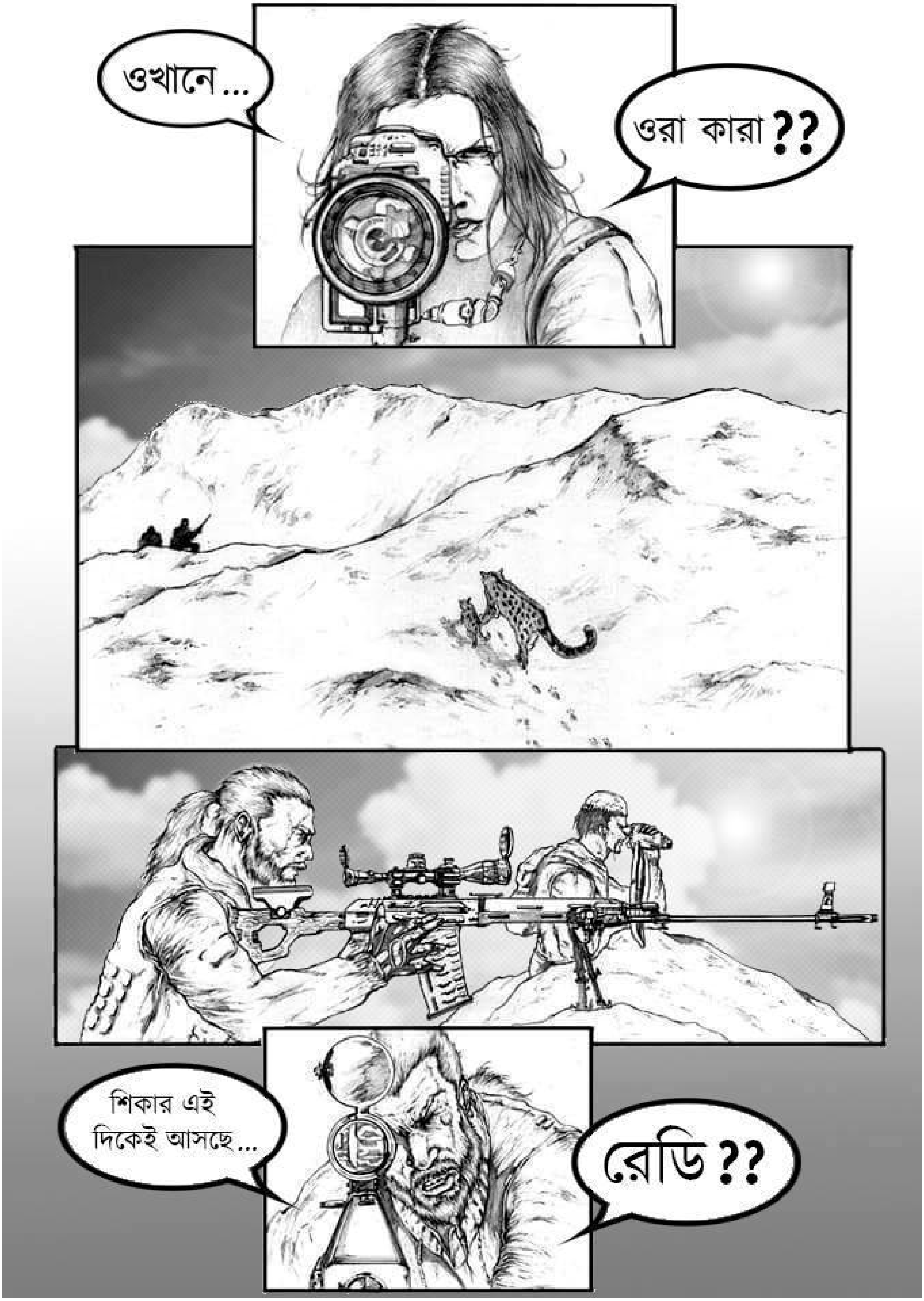

ক্রমশঃ

প্যারাডাইস থেকে প্যারামাউন্ট – সাতানব্বই বছরের শরবত

সৌগত সেনগুপ্ত

বন্ধুরা তো মাঝে মাঝেই কলেজ স্ট্রীট যাও। পড়ার বই বা গল্পের বই কিনতে। কিংবা কলেজ স্কোয়ারের দুর্গাপুজো দেখতে। আজকে তোমাদের সেই কলেজ স্ট্রীট পাড়ার একটা দোকানের কথা বলব। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে, বরিশাল থেকে কলকাতায় এসে শরবতের দোকান খোলেন প্রয়াত নীহার রঞ্জন মজুমদার। সেই দোকানের নাম ছিল প্যারাডাইস। ১/এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ছিল প্রথম ঠিকানা।

খুব কম সময়ের মধ্যেই উত্তর কলকাতার বনেদী পরিবারের সিরাপ আর শরবত খাওয়ার নতুন ঠিকানা হয়ে উঠল এই প্যারাডাইস। আমজনতার মধ্যে তখনও দোকানে এসে শরবত খাওয়ার চল ছিল না। পরবর্তী কালে কলেজের ছাত্র থেকে বিপ্লবী যুবাদেরও আনাগোনা শুরু হয় প্যারাডাইসে। এমনকি বিপ্লবীদের গোপন নথিপত্রও আদান প্রদান হত এখানে।

এর ফলেই তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের নজরে পড়ে গেল সংস্থাটি। নাম বদলিয়ে পাশেই ১/১/১ডি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট-এর ঠিকানায় শুরু হল প্যারামাউন্টের যাত্রা। যা এখনও চলছে। ৯৭ বছর পার করে দোকান থেকে প্যারামাউন্ট হয়ে উঠেছে এক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এর কর্ণধার শ্রী মৃগেন মজুমদার, প্রয়াত নীহার রঞ্জন মজুমদারের উত্তরপুরুষ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে সেসময়ের প্রায় সমস্ত মনীষীরাই এখানকার শরবতের স্বাদে মুগ্ধ হয়েছেন। সত্যজিৎ রায় যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন তিনিও অনেকবার এই দোকানে এসেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন বাঙালিদের মধ্যে ব্যবসার পথিকৃৎ। তিনি চাইতেন ব্রিটিশের গোলামি না করে বাঙালিরা ব্যবসায় আরও উদ্যোগী হন। তিনি নিজে যেমন বেঙ্গল কেমিক্যাল তৈরি করেছিলেন তেমনই অন্যান্য উদ্যোগীদেরও সহায়তা করতেন।

সেইসময়ে প্যারাডাইসের শরবতের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল। আচার্য রায়ের রেসিপিতে প্রথম বানানো হয় "ডাব শরবত।" যার মূল উপাদান ছিল ডাবের জল আর শাঁস। পাওয়া গেল সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে পুষ্টিকর পানীয়। এত বছর পেরিয়ে এসে এখনও প্যারামাউন্টের সুপারহিট আইটেম ডাব শরবত।

ইতিহাস তো জানা গেল, এবার জানি কী ভাবে যেতে হবে এই দোকানে? কলেজ স্কোয়ারের পুবদিকের গেট (অর্থাৎ যে গেট দিয়ে কলেজ স্কোয়ারের পুজো দেখে বেরুতে হয়) দিয়ে বেরিয়ে সামনেই প্যারামাউন্ট। পুজোর সময়ে গেলে ঠাকুর দেখা আর শরবত খাওয়া একসঙ্গে সেরে নিতে পারবে। সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

এবার দেখে নিই এখানে কী কী শরবত পাওয়া যায়। মূলত তিন রকম শরবত পাওয়া যায় এখানে। স্পেশাল ড্রিঙ্ক, ক্রীম বেসড ড্রিঙ্ক আর সিরাপ। স্পেশাল ড্রিঙ্কের মধ্যে পাওয়া যায় কোকো মালাই, পাইন্যাপেল মালাই, স্ট্রবেরি মালাই, রোজ মালাই, ভ্যানিলা মালাই, গ্রেপস ক্রাশ আর কোল্ড কফি। এছাড়া প্যাশন ফ্রুট আর ডাব শরবত ও ড্রিঙ্কের মধ্যে পড়ে। ক্রীম বেসড ড্রিঙ্কের মধ্যে রোজ, ব্যানানা, লেমন, অরেঞ্জ, পাইনঅ্যাপেল, গ্রীন ম্যাঙ্গো, ভ্যানিলা উল্লেখযোগ্য। সিরাপের মধ্যেও পাওয়া যায় - রোজ, লেমন, অরেঞ্জ, গ্রীন ম্যাঙ্গো, লিচু এমনকি ট্যামারিন্ড বা তেঁতুলের সিরাপ ও পাওয়া যায়।

একসময়ে এখানে সফটড্রিঙ্কস আর আইসক্রীম পাওয়া গেলেও এখন শুধুমাত্র শরবত আর সিরাপই পাওয়া যায়। আর এগুলো সবই খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ, বাজার চলতি সফটড্রিঙ্কসের মত শুধুমাত্র ক্যালরি বর্ধক নয়। অন্যান্য উপাদান বাজারে পাওয়া গেলেও, ডাব শরবতের জন্য স্পেশাল জোগানদার আছেন, যিনি রোজ ডাব পৌঁছে দিয়ে যান। দোকানে ঢুকলে দেখা যায় এক পাশে সার দিয়ে ডাব রাখা রয়েছে!

ছোট দোকানে একসঙ্গে ২০ জনের মত বসার ব্যবস্থা। দোকানের দেওয়ালে স্টাফ করা হরিণের শিং। সঙ্গে একটা বোর্ডে যেসব বিখ্যাত মানুষের পদধূলিতে ধন্য এই স্থান তাঁদের নামের তালিকা। আছে বিভিন্ন মণীষীদের ছবি। টেবিলটপগুলো সেই সময়ের ইতালিয়ান মার্বেলের। যদি বসার জায়গা না থাকে বা বাড়ির জন্য নিয়ে যেতে চাও এদের টেক অ্যাওয়ে সার্ভিসও আছে। এমনকি বিয়ে সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে প্যারামাউন্ট শরবত পরিবেশন করে থাকে।

সব শেষে আসি দামের কথায়। সিরাপ ও শরবতের দাম ৪০ টাকা থেকে শুরু । সবথেকে বেশি দাম ১৫০ টাকা। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দামের কিছু পরিবর্তন হতেও পারে। তাহলে আর দেরি কেন? বাবা-মা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে প্ল্যান করে ফেল কবে যাবে প্যারামাউন্টে। আর একটা কথা, শুধু গরমকালেই না, শীতকালেও কিন্তু সমান সুস্বাদু প্যারামাউন্টের সিরাপ এবং শরবত।

ছবি — লোপামুদ্রা বাগ

চটপট চেটেপুটে

ফ্রুট পারফেইট

(FRUIT PARFAIT)

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

নিচের ভিডিও লিঙ্কে ক্লিক করে জেনে নাও কী করে বানাতে হয় ফ্রুট পারফেইট...

https://www.youtube.com/watch?v=9AQwGzYxgKg

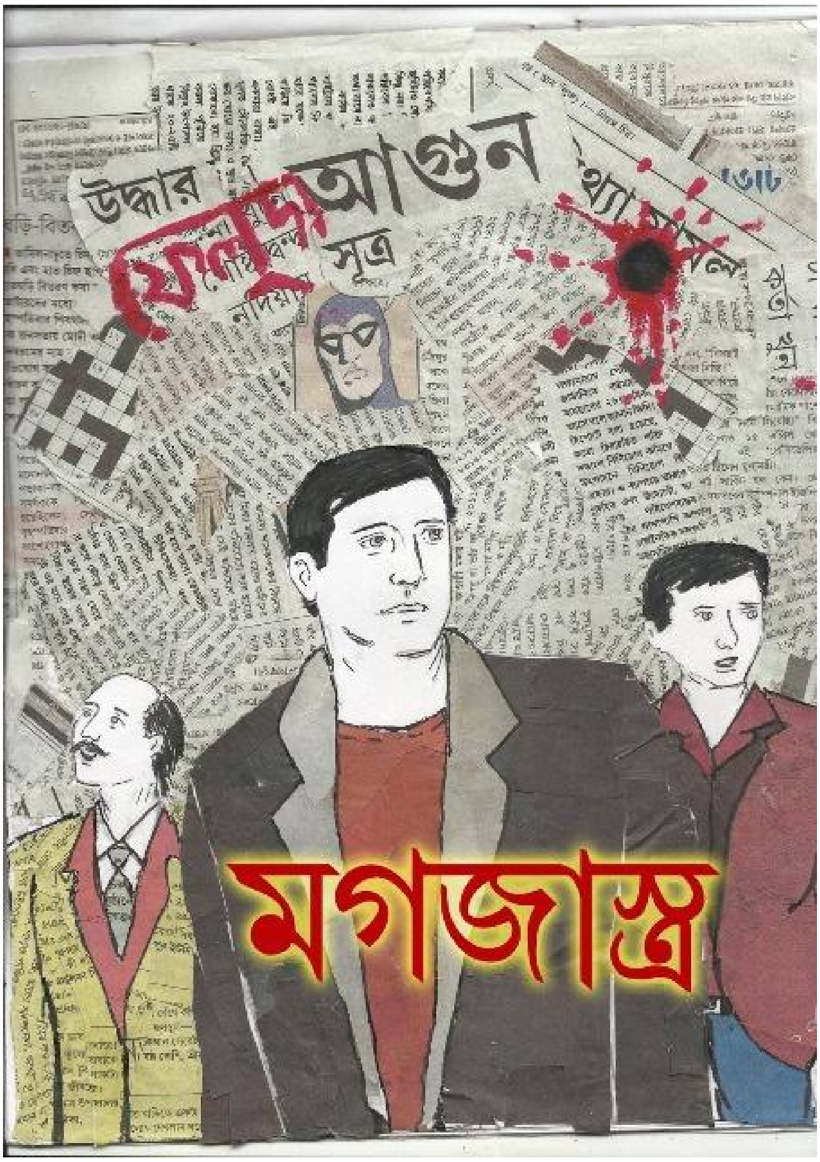

এই বিভাগে আমরা কিছু প্রশ্ন নিয়ে খেলব, কিছু সঙ্কেত বা ছবি দেখে গল্প চিনব আর কিছু ধাঁধার সমাধান করব। যদি তোমার সব উত্তরই ঠিক হয় তা হলে তুমি সর্বজ্ঞ সিধুজ্যাঠা। ১০টি প্রশ্নের মধ্যে যদি ৮টি ঠিক হয় তবে তুমি ফেলু মিত্তির অর্থাৎ ফেলুদার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। আর যদি ৬টি ঠিক হয় তবে তুমি তপসের মতো চটপটে। আর যদি তোমার স্কোর হয় ৫ বা তার কম তবে তুমি এখনও শিক্ষানবিশ জটায়ু।

মগজাস্ত্র ১

আমাদের উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে, তবে আগে নিজে চেষ্টা করবে।

একটা রহস্য সমাধানও তোমাদের করতে হবে।এই সমাধান যে করতে পারবে সে ব্যোমকেশ বক্সী উপাধি লাভ করবে, যে পারবে না সে অজিত।

আমাদের প্রথম বিভাগ প্রশ্নমালা... চটপট জবাব দাও:

১। ছেলেবেলায় স্বামীজিকে কী নামে ডাকা হত?

২। ভারতের প্যারিস কোন শহর কে বলা হয়?

৩। গত বছর বিশ্বকাপ ফুটবলে কোন দেশ ফাইনালে গিয়েও হেরে যায়?

৪। পরাশর বর্মা চরিত্রটি কার সৃষ্টি?

৫। ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কত সালে হয়?

৬। ফেলুদার বাড়ির পরিচারকের নাম কী?

৭। বাংলা দেশের জাতীয় ফুল কী?

৮। আকবর যে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন তার নাম কী ছিল?

৯। পুরাণ মতে সৃষ্টিকর্তা কোন দেবতাকে বলা হয়?

১০। বাদশাহি আংটি গল্পে আংটি আসলে কোন বাদশাহের ছিল?

১১। হুমায়ুননামা কার লেখা?

১২। ভূমধ্যসাগরের সব চেয়ে বড় দ্বীপ কোনটি?

১৩। ভারতের সব চেয়ে উঁচু জলপ্রপাতের নাম কী?

১৪। ‘Prince of Builders’ কাকে বলা হয়?

১৫। কর্ণের সারথি কে ছিলেন?

১৬। স্পাইস গার্ডেন কোথায় অবস্থিত?

১৭। মালয়েশিয়ার জাতীয় খেলা কী?

১৮। কোষের শক্তিঘর কাকে বলা হয়?

১৯। ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় কোন বিষাক্ত গ্যাসটি দায়ী?

২০। সাইলেন্ট ভ্যালি কোন রাজ্যে অবস্থিত?

এবার তোমাদের উত্তরগুলো দিয়ে দিই।

১। বিলে

২। জয়পুর

৩। আর্জেন্টিনা

৪। প্রেমেন্দ্র মিত্র

৫। ১৯৫২ সালে

৬। শ্রীনাথ

৭। শালুক

৮। দীন –ই –ইলাহী

৯। ব্রহ্মা

১০। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব-এর।

১১। বাবরের মেয়ে গুলবদন বেগম

১২। সিসিলি

১৩। যোগ জলপ্রপাত

১৪। শাহজাহানকে

১৫। মহারাজ শল্য

১৬। কেরালা

১৭। ব্যাডমিন্টন

১৮। মাইটোকন্ড্রিয়া

১৯। মিথাইল আইসোসায়ানেট

২০। কেরালা

মগজাস্ত্র ২

বন্ধুরা এবার তোমাদের জন্য রয়েছে একটা রহস্য। তোমাদের মধ্যে অনেকেই ডিটেকটিভ গল্প পড়তে ভালোবাসো। অনেকে পড়তে পড়তে কেস সল্ভ করারও চেষ্টা করে। এই পুরো কাহিনীর মধ্যেই সমাধান লুকিয়ে আছে। যদি তুমি এই রহস্যের কিনারা করতে পারো তবে তুমি ব্যোমকেশ বকসী, আর যদি না পারো তাহলে তুমি অজিত। দেখা যাক তোমরা পারো কিনা! উত্তর আগে দেখবে না কিন্তু । এবার মন দিয়ে কেসটা পড়ো।

খবরের কাগজে প্রায় দিনই কোনও না কোনও ক্রাইম-এর খবর থাকে। ইদানীং একটা খবর প্রায়ই বেরুচ্ছে। পুলিসরাও বেশ নাজেহাল। দুপুরের দিকে বাড়ির গিন্নিরা যখন একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছে ঠিক তখনই সদর দরজায় কড়া নড়ে ওঠে (কলিং বেল বেজে ওঠে)। ভদ্রমহিলা যদি জিজ্ঞাসা করেন, কে?

একটি নারী কণ্ঠ শোনা যায়, ভালো শাড়ি আছে দেখবেন?

ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। ব্যাস মিষ্টি মেয়েটি ভেতরে ঢুকে মহিলার গলায় ছুরি বা পিস্তল ধরে টাকা পয়সা, গয়নাগাটি নিয়ে প্রস্থান করে। পুলিস এই উৎপাতের কোনও কিনারা করতে পারেনি।

এবার আসি চিন্তামণি কুণ্ডুর কথায়। আপনার মক্কেল এই ভদ্রলোক। বয়স্ক মানুষ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। নিজের তিনটে বাড়ি আছে। সব বাড়ি ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। একটা বাড়ির দোতলায় থাকেন নিজের পরিচারককে নিয়ে। দুটো বাড়ি ওর বাড়ির সামনে, দোতলায় জানলার ধারে বসে উনি রাস্তাঘাট, লোকজন, ভাড়াটের দিকে লক্ষ্য রাখেন। তপন সেন আর তার স্ত্রী শান্তা তার সামনের একটা বাড়ির ভাড়াটে হয়ে আসে। কুণ্ডুমশাই সারা দিনরাত জানলার ধারে বসে বসে লক্ষ্য রাখেন সব কিছু। ওনার একটি বাইনোকুলারও আছে। তপন আর শান্তাকে কখনও এক সাথে দেখা যায় না। তপন নাইট ডিউটি করে আর শান্তার কাজ দিনে শুরু হয়। একটি মেয়েদের স্কুলে পড়ায়। দুজনে প্রায় সমবয়সী। তপনের গলার স্বর চেরা চেরা। আর শান্তার মাথা ভরতি লম্বা চুল, গালে একটা লাল তিল। মাঝে মাঝে সে কুণ্ডু মশাইয়ের সঙ্গে এসে গল্প করে যায়। শান্তা বুঝতে পারে যে কুণ্ডু মশাই-এর লক্ষ্য সব দিকে। কারণ ওনার আর বিনোদনের কোনও মাধ্যম নেই। উনি চলাফেরা করতে পারেন না। সকাল সাড়ে নটা বাজলে শান্তা বেরিয়ে যায়, ফেরে চারটের সময়। সন্ধ্যের সময় তপন বেরোয়, তার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ইলেকট্রিক আলো নিভে যায়। মোমবাতি জ্বলে তখন। শান্তা জানায় যে সে বিজলি বাতির আলো সহ্য করতে পারে না। তাই তপন চলে গেলেই আলো নিভিয়ে মোম জ্বালায়। ওদের বাড়িতে কখনও কোনও অতিথি আসে না।

সময়টা শীতকাল। একদিন মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল কুণ্ডু মশাইয়ের। জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে রাস্তা দেখতে লাগলেন। সেই রাত্রেই চোখের সামনে খুন হতে দেখলেন একজন লোককে। খুনি আর কেউ নয়, তপন সেন। রাস্তার আলো তপনের মুখে পড়েছিল, না হলে চিনতে পারতেন না। পুলিসে খবর দিলেন। পুলিস কুণ্ডুমশাই আর শান্তাকে বিরক্ত করতে শুরু করল। শান্তা সেই সময় ঘুমোচ্ছিল। সে কিছুই বলতে পারল না। উধাও হয়ে গেল তপন সেন। মৃত ব্যক্তির নাম বিধু ভূষন আইচ, পুলিসের কর্মচারী ছিলেন।

রহস্য এই টুকুই। এবার তোমাদের সমাধান করার পালা। কুণ্ডুমশাইকে হেল্প করো, উনিই তোমাদের মক্কেল। পুলিস ওনাকে হয়রানি করছে। মন দিয়ে কেস স্টাডি করো। সমাধান লুকিয়ে আছে এর মধ্যেই। সত্যান্বেষী হতে গেলে চাই একটু অনুমান শক্তি। একটু মাথা খাটানো।

এবার চলো সমাধানের দিকে যাই।

ক্লু নম্বর ১। খবরের কাগজের বিশেষ সংবাদ, মেয়ে ডাকাতের প্রসঙ্গ।

ক্লু নম্বর ২। তপন আর শান্তা সমবয়সী প্লাস দুজনকে এক সাথে কখনই দেখা যায় না। এটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শান্তা নিজেই ক্রিমিনাল। সকালবেলা সে কোনও মেয়ে স্কুলে পড়াতে যেত না। যেত ডাকাতি করতে। ব্যাগে বা ব্রিফকেসে ভরে সেগুলো আনত বিকেল চারটের সময়। বাড়িতে সে একাই থাকত। তপন সেন-এর কোনও অস্তিত্ব ছিল না। নিজেই ছেলে সেজে তপন সেন নাম নিয়ে কুণ্ডু মশাই-এর সঙ্গে দেখা করে। গলার স্বর বদলে কথা বলে। যখন শান্তা হত মাথায় ফলস চুল লাগাত আর গালে একটা লাল তিল এঁকে নিত। নিহত পুলিশকর্মী শান্তাকে চিনে ফেলায় তাকে মরতে হয়। রোজ সন্ধে হলেই তপন সেজে শান্তা বেরিয়ে পড়ত কারণ সে জানত কুণ্ডু মশাই জানলায় বসে সব দিকে লক্ষ্য রাখছেন। নিজের ঘরের ইলেকট্রিকের আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে বেরুত। কুণ্ডু মশাই মনে করতেন তপন বেরুবার পর আলো নিভল বাড়ির, কিন্তু তপন বেরুবার আগেই আলো নিভিয়ে দিত। বয়স্ক মানুষের ভুল হতেই পারে, বিশেষ করে তাঁর মনে কোনও সন্দেহের উদ্ভব হয়নি, তাই আলো নেভানোর সঠিক সময় তিনি গুলিয়ে ফেলেছিলেন। তপন কিছুক্ষণ পর পেছনের দরজা দিয়ে ফিরে আসত, তারপর ঘুমিয়ে পড়ত। সকাল হলে আবার মেয়ে হয়ে সেজে গুজে বেরিয়ে পড়ত ডাকাতি করতে। নিরীহ মেয়েটি যে স্কুল শিক্ষিকা নয় বরং একজন অপরাধী তা বোঝা শক্ত ছিল। খুন করার পর তাড়াতাড়ি পুলিশ এসে যায় কুণ্ডুমশাইয়ের ফোনের জন্য। ফলে শান্তা আর পালাতে পারে না। আবার মেয়ে সেজে বাড়িতে বসে থাকে দুঃখ দুঃখ মুখ নিয়ে। শান্তা নামটাও বানানো, আসল নাম প্রমীলা। চুল গুলো ছাঁটা। চোখে হিংস্র দৃষ্টি। একজন ক্রিমিনাল।

রহস্যটি নেওয়া হয়েছে শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়-এর অদ্বিতীয় গল্প থেকে। যেখানে এই রহস্য সমাধান করেন শ্রী ব্যোমকেশ বক্সী।

(ছবি-তন্ময় বিশ্বাস)

মগজাস্ত্র ৩

ছবি দেখে গল্প চেনো।

প্রত্যেকটা ছবি খুব মন দিয়ে দেখো। এক একটা ছবির পেছনে লুকিয়ে আছে এক একটা গল্প অথবা টান টান কোনও অ্যাডভেঞ্চার। দেখো তো চিনে নিতে পারো কিনা?

(১)

(২)

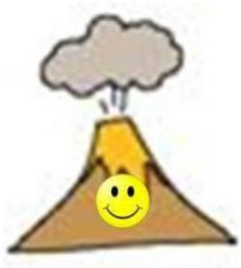

(৩)

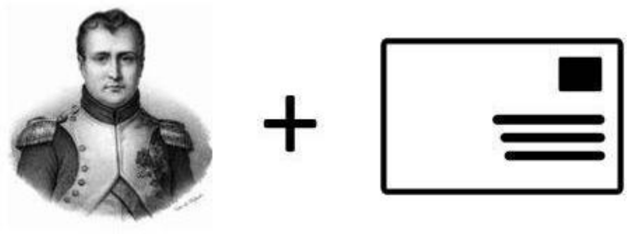

(৪)

(৫)

(৬)

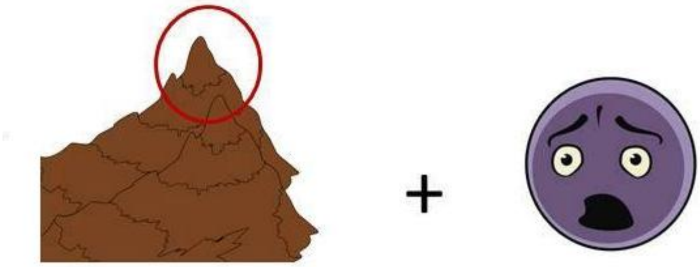

(৭)

(৮)

ছবি দেখে গল্প চেনো-উত্তরঃ

১। ফুলের দেশে বিভীষিকা (অনন্যা দাশ)

২। আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

৩। নেপোলিয়ানের চিঠি (সত্যজিৎ রায়)

৪। শজারুর কাঁটা (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

৫। বাদশাহী আংটি (সত্যজিৎ রায়)

৬। পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

৭। রাতের ট্রেনের সঙ্গী (অভিজ্ঞান রায়চৌধুরি)

৮। কেরালায় কিস্তিমাত (সুচিত্রা ভট্টাচার্য)

মগজাস্ত্র বানাতে যাদের যাদের মগজ লেগেছে তারা হলেন অনন্যা দাশ, সহেলী চট্টোপাধ্যায় এবং তন্ময় বিশ্বাস।

হাওয়াকল ::

হাওয়াকল

হাতের কাজ শেখো

অঙ্কিতা দাস

এই বিভাগে তোমাদের হাতের কাজ শেখাচ্ছেন অঙ্কিতাদিদি।

প্রথমে নিচের ভিডিওতে শিখে নাও কীভাবে বানাবে পেন-দানি।

ভিডিও লিঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=BBrBFoepHDA

এবারে শিখে নাও কীভাবে বানাবে ফুলদানি।

ভিডিও লিঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=313RgHPo3eg

ম্যাজিক:: ভোজবাজি::

ভোজবাজি

সহজে ম্যাজিক শেখো

এবারের ম্যাজিক - পেন্ডুলাম মিরাকল

শেখাচ্ছেনঃ শশাঙ্ক শেখর চট্টোপাধ্যায়

নিচের ভিডিওতে ক্লিক করলেই ম্যাজিক

ভিডিও লিঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=AQBs95keeCU

একটু ভাবি

তন্ময় বিশ্বাস

দুরে ডালপালার গারদ ভেদ করে সূর্যটা উঠে আসে। চারদিকে ছড়িয়ে দেয় গেরুয়া আগুন। পাখির ডানায় চড়ে তারা ছড়িয়ে পরে দিকবিদিক। পুজোর বার্তা নিয়ে।

লম্বা বারান্দাটায় অলস ভাবে গা এলিয়ে দেয় একফালি রোদ। এখানকার বাসিন্দাদের মতই তার কোন কাজ নেই। শুধুই পড়ে থাকে। যেন থেকেও নেই। একটু পরেই দোতলা বাড়িটার সারি সারি ঘরগুলো জেগে ওঠে। যেন না উঠলেও চলে। নেহাতি নিয়মের তাগিদে ওঠা। অভ্যাসের বসে বেঁচে থাকা!

সামনে একটা মাঠ। বড় বড় ঘাস। একটা নালার ক্ষীণ জলধারা বয়ে চলেছে তির তির করে। কোথা থেকে আসছে কেউ জানে না। শুধুই বয়ে যায়। নালার ওপাশে বন। খুব একটা গভীর নয়। মাঝে মাঝেই ময়ূরের কেকা ভেসে আসে। এখানে প্রাকৃতিক ভাবেই ময়ূর আছে। তবে শরৎ কালে তাদের দেখা পাওয়া ভার।

সামনের সাইন বোর্ডটায় দুটো চড়াই এসে বসে। কিচির মিচির করে কি যেন বলাবলি করে। তারপর আবার ফুড়ুৎ! বোর্ডটায় বড় বড় করে লেখা 'ঢাকেশ্বরী ওল্ড-এজ হোম', সাদা বাংলায় 'বৃদ্ধাশ্রম'। ঘর বোঝাই জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত কিছু সৈনিক। সারাজীবন যুদ্ধের পর যাদের পুরস্কার একমুঠো বঞ্চনা, থেকেও না থাকা কিছু মুখ, আর একরাশ চোখের জল। ড্যাম্প ধরা দেওয়াল গুলো ধরে সময় যেন এগোতে চায় না। সময় এখানে বড্ড বেশি নির্বাক। বড্ড বেশি নিশ্চল।

বছর কাটে। পুজো আসে, আবার চলেও যায়। পুজোর গন্ধ এ বাড়িতে আসে না। চিহ্ন বলতে শুধু দূরের মাঠে মাথা দোলানো কাশফুল, আর ক্যালেন্ডারের কয়েকটা পাতা। লালকালির কয়েকটা তারিখ। একফালি রোদটা ধীরে ধীরে বড় হয়। টুকরো টুকরো হয়ে ঢুকে পড়ে সারি সারি খোলা দরজা দিয়ে। একফালি গিয়ে উঠে পড়ে শ্রদ্ধা ঠাকুমার কোলে। ঠাকুমা একমনে সোয়েটার বুনে চলেছে। নাতিকে দেখেনি বহুদিন হয়ে গেল। আন্দাজে বোনা। জানে নাতি এসব 'ওল্ড ফ্যাশন' এর জিনিস পড়বে না। তবু বোনে। কাটা-উলের যুগলবন্দীতে বোনা হয়ে যায় কিছু নীরব ভালোবাসা। একপক্ষ ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা গায়েমাখার কেউ নেই।

আরেক টুকরো সোনালী রোদ গিয়ে পড়ে স্নেহ দাদুর ঘরে। ঘর জুড়ে দলা-পাকানো কাগজ। দলা-পাকানো কবিতা। লেখেন আর দলা-পাকিয়ে ফেলে দেন। কিছুই মনমত হয় না। সেই কলেজ জীবনে ফেলে এসেছেন কবিতাদের। তারপর সংসার যন্ত্রে সব পিষে গেছে। এখন তিনি সেই যন্ত্রেরই বিকল একটা অংশ। ম্যানুফ্যাকাচারিং ডিফেক্ট! তাই আবার সেই কবিতা। কিন্তু, অভিমানী কবিতারা আসতে চায় না। একদিন আসবে ঠিকই। ততো দিনে হয় তো শেষের দিনটাও কড়া নাড়বে। শেষের দরজাটা যে এখান থেকে বড্ড কাছে!

পাশের ঘরে জহর কোট পরা যতীন দাদু। মেরুদণ্ড এক্কেবারে সোজা। ঠোঁটের কোণায় সবসময় ফিঙের মত নাচছে একখানা পাইপ। সামনে ধরা ওথেলো। কাউকে পরোয়া করেন না। স্ত্রী-মেয়ের সাথে বনিবনা হয়নি। পেনসন টেনশন সব বাড়িতে ফেলে স্বেচ্ছায় চলে এসেছেন আশ্রমে। ঘরে ঢুকলেই বলেন 'welcome young man to our dead city' তারপর হেসে নিজের দিকে দেখিয়ে বলবেন 'And meet the only living person.' হো হো করে হেসে ওঠেন। টেবিলের ওপর রাখা ইনহেলারটাও কেমন যেন বাঁকা বাঁকা হাসে!

একতলার বারান্দা ধরে রান্নাঘরের দিকে যায় বাসন্তী ঠাম্মা। সাদাকালো রোদ্দুর ছায়া মেখে। শরীরে শুধুই হাড়। ফোকলা প্রায় মাড়িগুলো গাল দু'টো কে টেনে নিয়েছে। মুখে একটা মিষ্টি হাসি। কাজের মেয়ে কুসুমকে হালকা ঠ্যালা দিয়ে বলে 'কি রে দুধটা দে তাড়াতাড়ি?'

কুসুমের মেজাজ তিরিক্ষে। হাতের বাটিটা দিয়ে সটাং একটা বাড়ি মারে ঠাম্মার মাথায়। ঠং করে একটা ধাতব শব্দ ওঠে।

কি ভাবছেন? এবার বাড়াবাড়ি করছি? বিশ্বাস, অবিশ্বাস সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। এই একজোড়া চর্মচক্ষে ঘটনাটার সাক্ষী থাকতে হয়েছে। আমরা রে রে করে উঠেছিলাম। তুমুল চেঁচামেচি। মনুষ্যত্বের ধানাই পানাই। তারপর নিয়ম মত একসময় সব থেমে গেছে।

আমরা 'স্পর্শ'র তরফ থেকে সেদিন জড়ো হয়েছিলাম। কয়েক টুকরো আনন্দ যদি ফিরিয়ে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টায়। পূজোর আনন্দ। দিনটা ছিল ষষ্ঠী।

এখানকার সব আবাসিকদের নিয়ে একটা পূজা পরিক্রমা। একসাথে খাওয়া দাওয়া। সবাই যেতে পারবেন না। চলার ক্ষমতা নেই। একটা বাস আর কয়েকটা গাড়ি রওনা হয়ে গেল। পেছনে দোতলা বাড়িটা। ক্ষণিকের বিদায়।

সবার সাথে আমিও ছিলাম। আমি 'স্পর্শ'-র কেউ নই। আমার কোনও কাজও নেই তাও ছিলাম। দাদু-দিদা-দের স্নেহ ভালোবাসা মেখে বেড়াচ্ছিলাম। কারোর দাদুভাই তো কারোর নাতি-সাহেব! চলন্ত জানলার হাওয়ার তোড়ে কত কত হাসি। কত কত আনন্দ। হয়তো অনেকদিন পর, হয়তো বা শেষবার।

বেশ কিছু প্যান্ডেলে ঘোরা হল। থিম, সাবেকি সবরকম। কোনও প্যান্ডেলে সম্বর্ধনা, কোথাও দাদু দিদারাই ফিতে কেটে পুজোর সূচনা করে, কোথাও বা স্রেফ ভোঁ ভাঁ! কিচ্ছু নেই। এসেছ এসো, যাচ্ছ যাও। আমাদের কি!

এক ঠাকুমা আবদার জোড়ে মা-কে ছোঁব। তেমন চলতে পারেন না। পুজো কমিটি সাগ্রহে অনুমতি দেন। আমাদের একজন কোলে করে নিয়ে যায়। প্রতিমার চিবুকে হাত বোলান ঠাম্মা। বলিরেখার ভাঁজে ভাঁজে এক মুহূর্তের জন্য হলেও আলো জ্বলে ওঠে। "শক্তি রুপেণ সংস্থিতা!"

কোথা দিয়ে যেন দিনটা কেটে যায়। সেই সব বিস্তারিত অন্য কোন দিন। অন্য কোনও কলমে। দিনের শেষে আবার সেই দোতলা বাড়ির কবলে রেখে আসতে হয়, কিছু ভাগ্যহীন-ভাগ্যহীনার বাবা মা দের। রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যাওয়ার পরও যেন আনন্দ থেকে যায়। থেকে যায় শান্তি। শেষে বাস-ড্রাইভার কে পাওনা মেটাতে গেলে, সে হাত জোড় করে বলে 'দাদা, পাপ লাগবে যে। ও টাকা কোথায় রাখব?"

সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিছু কিছু মানুষ নিজের অজান্তেই সবাইকে স্তব্ধ করে দেয়। নিজের অজান্তেই অন্যদের ছাড়িয়ে যায়।

'স্পর্শ'-র এই উদ্যোগ তিন বছরের বেশি চলেনি। আর নাকি ডোনেশান ওঠে না। আজও ষষ্ঠীর দিন মনটা খারাপ হয়ে যায়। তারা এখনো একা। আজো পুজো এসে ফিরে যায়। দোতলা বাড়িটায় নোনা-হাওয়ার ঝাঁক হুল ফোটায়। যেন বলে 'আর কতদিন? অনেক তো হল!'

শুধু ঢাকেশ্বরী নয়। আরো অনেক 'বৃদ্ধাশ্রম'-এর চিত্র এমনটাই। ছেলেমেয়েরা দেখতে আসা তো দূরের কথা ফোন পর্যন্ত করে না। চিকিৎসার ব্যবস্থাও তথৈবচ!

আচ্ছা মা-বাবা সন্তানদের পৃথিবীর আলো দেখায়, মানুষ করে কি এই দিনটা দেখার জন্য? শেষ বয়সে একটু সন্মান, একটু যত্ন-আত্তিও কি তাদের প্রাপ্য নয়? সারা জীবন যারা শুধুই দিয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে দিয়ে স্বপ্ন দেখেছে, বাঁচতে চেয়েছে, তাদের উপহার একটা ১০ফুট বাই ১০ ফুট ঘর? কমন বাথরুমে ভোর ৫টা থেকে লাইন? সারা দিন অন্তত দশ বার ছেলের কথা ভেবে জল ফেলা? নাকি, মাথায় বাটির বাড়ি খাওয়া? কোনটা? এগুলোর মধ্যে কোনটা তাদের প্রাপ্য একটু বলবেন প্লিজ? ওল্ড এজ হোমে এই সবকটাই জোটে। হ্যাঁ হ্যাঁ সবকটাই!

একটা বয়সের পর অনেক সময় মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। তারা অনেক কিছু ভুলে যান। ভুল কাজ করে ফেলেন। তাই বলেই তাদের দূরে সরিয়ে দিতে হবে? ছোটতে আমি-আপনি ভুলভাল করিনি? বিছানা ভিজিয়ে দিয়ে রাতের পর রাত মায়ের ঘুম নষ্ট করি নি? নাকি ময়দা আনতে গিয়ে আটা নিয়ে ফিরিনি? করেছি তো! তবে? বাবা-মারা কি তখন আমাদের ফেলে দিয়েছেন?

বাবা-মা কে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠালে বাড়িটা অনাথ আশ্রম হয়ে যায়। আচ্ছা একটু যদি চেষ্টা করি তবে কি ওই বৃদ্ধাশ্রম গুলোতে চিরকালের মত তালা ঝুলিয়ে দিতে পারি না? পারি না তাদের স-সম্মানে রেখে দিতে? অনেকে হয়তো পশ্চিমের উদাহরণ টানবেন। বলবেন 'ওখানে অনেক ছোট বয়স থেকেই ছেলে মেয়েরা বাবা মার কাছ থেকে আলাদা থাকে!' ডিয়ার স্যার, ওদের দেশের যা কিছু ভালো তা আমাদের দেশে আছে তো? মা-বাবাদের সম্মান দেওয়াটা আমাদের দেশের সংস্কৃতি। সেটা পশ্চিমী হাওয়ায় উড়িয়ে দেব কেন!
বয়স, সময় কোনটাই থেমে থাকবে না। আপনিও একদিন বৃদ্ধ হবেন। বাবা-মা কে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে, নিজের জন্যই সিট-বুকিং করে রাখছেন না তো? একটু ভেবে দেখবেন প্লিজ!

ছবি – লেখক

বায়োস্কোপ ::

সিনেমা: সিন্ডেরেলা

রিভিউ: ঋজু গাঙ্গুলি

সিন্ডেরেলা! নামটা শোনা মাত্র ছোটোবেলা থেকে শুনে বা পড়ে আসা একটা গল্প চোখের সামনে ডানামেলা প্রজাপতির মতো রঙিন আলোর ফুলকি ছড়িয়ে দিয়ে ভেসে ওঠে। কী সেই গল্প?

সৎ মায়ের আর সৎ বোনেদের অত্যাচারে খুব কষ্ট পেত একটা মেয়ে। তাদের জন্যে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর চিমনির ধারে ছাই আর অঙ্গারের মধ্যে বসে থাকত সে, আর তাই এক বোন তাকে বলত সিন্ডারটেইল, কিন্তু অন্যজন (যে একটু শান্ত আর ভালো) তাকে বলত সিন্ডেরেলা। একদিন সে খবর পেল, যে রাজকুমারের ইচ্ছেয় রাজবাড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে এক নাচের অনুষ্ঠান। গোটা দেশের সব মেয়েরা সেই অনুষ্ঠানে যাবে, যাবে তার দুই হিংসুটি বোনও। সিন্ডেরেলা তাদের চমৎকার করে সাজিয়ে দেয়, কিন্তু সে নিজে যেতে পারে না সেখানে। কী করে যাবে সে? তার না আছে ভালো পোষাক, না আছে সেই রাজকীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার মতো ঘোড়ায় টানা গাড়ি আর কোচম্যান, যা না থাকলে রাজবাড়ির দরজায় দাঁড়ানো গোমড়ামুখো প্রহরীরা সবাইকে আটকে দেয়। দুঃখিনী সিন্ডেরেলাকে সাহায্য করতে তখন এগিয়ে আসেন তার ফেয়ারি গডমাদার। তাঁর ম্যাজিকের বাগানের সবথেকে বড়ো কুমড়োটা হয়ে যায় এক চোখ-ধাঁধানো ছয় ঘোড়ায় টানা গাড়ি, খাঁচায় আটকে পড়া ছ'টা নেংটি ইঁদুর হয় ছ'টা টগবগে ঘোড়া, একটা ধেড়ে ইঁদুর হয় কোচম্যান, ছ'টা টিকটিকি হয় জমকালো ফুটম্যান, আর সিন্ডেরেলার ছেড়াখোঁড়া পোশাক নিমেষে বদলে যায় মণিমুক্তো বসানো আর সোনা-রুপো দিয়ে বানানো পোশাকে। তারপর সে পায়ে দেয় একজোড়া কাঁচের জুতো (আহা, তেমন অসাধারণ জুতো আমরা চোখেই দেখিনি, তাই আমি আর কী বর্ণনা দেব তার?)। গডমাদারের

বলা সাবধানবাণী (রাত বারোটার মধ্যে তাকে ফিরতেই হবে, এক মুহূর্তও যদি দেরি হয় তাহলেই সব হয়ে যাবে আগের মতো) মাথায় নিয়ে সে পৌঁছে যায় নাচের আসরে। সেখানে তার সৌন্দর্য দেখে রাজকুমার তার প্রেমে পড়ে যান, কিন্তু নাচে আর আনন্দে ঘড়ির কাঁটা কখন যে বারোটার দাগ প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে, তা সে বুঝতেই পারেনি। তারপর দৌড়-দৌড়-দৌড়! শেষে যখন সে ফিরে আসে নিজের বাড়িতে তখন তার পোশাক-কোচ-ঘোড়া-কোচম্যান-ফুটম্যান সবই আগের অবস্থায় ফিরে গেছে, আর পা থেকে পড়ে গেছে এক পাটি জুতো সেই রাজপ্রাসাদেই।

কিন্তু রাজকুমার যে তার প্রেমে এক্কেবারে কাবু সে কথা বোঝা গেল যখন দেশ জুড়ে রাষ্ট্র হল এই কথা: ওই এক পাটি জুতো যার পায়ে ফিট হবে, রাজকুমার বিয়ে করবেন সেই কন্যাকেই। এরপর হুলুস্থুল না বেঁধে উপায় আছে! প্রথমে রাজপ্রাসাদের অল্পবয়সী মেয়ে আর মহিলারা, তারপর দেশের নামকরা পরিবারের মেয়েরা, শেষে দেশের সব মেয়েকে ওই জুতো পরানোর চেষ্টা হল, কিন্তু জুতো পায়ে ফিট হল শুধু সিন্ডেরেলার। তারপর সব্বার জন্যে হ্যাপি এন্ডিং, মায় সিন্ডেরেলার দুই হিংসুটি বোনের জন্যেও, কারণ সিন্ডেরেলা তাদের ক্ষমা তো করেই, তাদের জন্যে দুটি ভদ্রগোছের বর-ও যোগাড় করে দেয়। এই গল্পটা তো আমাদের সবারই জানা, তাহলে এই নিয়ে একটা নতুন সিনেমা কেন, আর কেনই বা সেই সিনেমা নিয়ে ম্যাজিক ল্যাম্পে এই লেখা? এ কথার উত্তর দেওয়ার আগে এই গল্পটার ইতিহাস খুউব সংক্ষেপে বলে দিই।

আজ থেকে দু হাজার বছরেরও বেশি আগে, যিশুখ্রিষ্ট জন্মানোর ৭ বছর আগে আমরা রোডোপিস নামের এক ক্রীতদাসীর কথা জানতে পারি, আকস্মিক ভাগ্য-পরিবর্তনের ফলে এবং নিজের গুণে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মিশরের রাজপুত্রের। ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ চিনের দুয়ান চেংশিহ–এর লেখায় আমরা পাই য়েহ-সিয়েন-এর কথা, যে সৎ মা আর সৎ বোনেদের অত্যাচার উপেক্ষা করেও শেষ অবধি জীবনের যুদ্ধে জিতে গেছিল, কারণ ১০ ফুট লম্বা একটা মাছ তাকে দিয়েছিল খাবার, সোনা আর মুক্তো, মাছরাঙার পালক-লাগানো পোশাক, এবং সোনার তৈরি ছোট্ট-ছোট্ট জুতো। দেশে দেশে গল্পটা একটু-আধটু বদলে যায়, যেমন স্কটল্যান্ডের রাশিন কোটি তার উপহার পায় একটি লাল রঙা বাছুরের থেকে। তবে আমরা যে গল্পটা চিনি-জানি, সেটি স্থান পায় শার্ল পেরো-র সংকলিত এবং লিখিত "টেলস অফ মাদার গুজ"-এ, ১৬৯৭-এ। এর পরে ১৮১২-য় গ্রিম ভাইদের সংকলনে অ্যাশেনপুতেল নামে আমরা এই গল্প পাই, কিন্তু তাতে একটা গাছ থেকে সিন্ডেরেলা তার সব উপহার পায়, আর সেই গল্পে রক্তারক্তি বড্ড বেশি।

সিন্ডেরেলা নিয়ে প্রথম সিনেমা হয়েছে ১৮৯৯-এ ফ্রান্সে, মোটে ৭ মিনিট লম্বা ছিল সেই ফিল্মটি। হলিউড ১৯১৪-য় এই গল্প নিয়ে সাইলেন্ট মুভি বানিয়েছে। তবে আমাদের সবার চেনাজানা সিন্ডেরেলা-কে আমাদের কাছে পেশ করেন ওয়াল্ট ডিজনি তাঁর ১৯৫০-এর মিউজিক্যাল অ্যানিমেশন-এ, শার্ল পেরোর লেখা অবলম্বনে। সে সিনেমা শুধু যে জবরদস্ত হিট হয় তাই নয়, আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এর বিচারে সে সিনেমাটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম অ্যানিমেটেড সিনেমাগুলোর তালিকায় ৯ নম্বরে জায়গা পায় (বাকি সিনেমাগুলোর নাম বলতে গেলে সম্পাদকমশাই রাগ করবেন, তাই চুপিচুপি লিংকটা দিয়ে রাখি শুধু: http://www.afi.com/10top10/category.aspx?cat=1)।

২০১৫-র ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়াল্ট ডিজনি পিকচার্স আমাদের আবার দেয় সিন্ডেরেলাকে নিয়ে একটি নতুন সিনেমা। ১৯৫০-এর ক্লাসিকটির থেকে অনেক উপাদান নিলেও এই সিনেমাটি কিন্তু নীলের বদলে কালচে রং, আলোর মধ্যে বেশ কিছুটা অন্ধকার, আর অনেকটাই দুঃখকষ্টে ভরা। এলা (সিন্ডেরেলা)-র ভূমিকায় লিলি জেমস, প্রিন্স চার্মিং (কিট)-এর ভূমিকায় রিচার্ড ম্যাডেন, এবং ফেয়ারি গডমাদারের চরিত্রে হেলেনা কার্টার চমৎকার অভিনয় করলেও লেডি ট্রেমেইন, তথা সিন্ডেরেলার সৎ মা-র চরিত্রে পাক্কা ভিলেইন হিসেবে অভিনয় করে কাঁপিয়ে দিয়েছেন কেট ব্লানচেট। কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে তিন-তিনবার অস্কার জেতা ডিজাইনার সিডনি পাওয়েল এই সিনেমায় চরিত্রদের সাজসজ্জার দায়িত্বে থাকায় স্ক্রিন জুড়ে সত্যিই দেখার মতো পোশাকের ছড়াছড়ি ছিল। তবে এই ফাঁকে তোমাদের একটা টপ-সিক্রেট খবর জানিয়ে রাখি: সিন্ডেরেলার পায়ের কাঁচের জুতোর জন্যে মিউজিয়াম ঘেঁটে ডিজাইন বানানো গেলেও কাঁচ তো আর ঝকমক করে না, তাই এই সিনেমার জন্যে মোট ৮ জোড়া জুতো শেষ অবধি বানানো হয়েছিল স্বারোভস্কি থেকে, ক্রিস্টাল দিয়ে; কিন্তু বেচারি নায়িকা সেগুলো আদৌ পরতেই পারেন নি, তাই তাঁকে চামড়ার জুতো পরিয়েই শুটিং করা হয়, আর সিনেমা বানাবার সময় সেটা ডিজিটালি বদলে করে দেওয়া হয় কাঁচের, মানে ক্রিস্টালের জুতো!

তাহলে মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়াল? দেখা যাবে এই সিনেমাটি, যা ইতিমধ্যেই ওয়াল্ট ডিজনি হোম ভিডিও এন্টারটেইনমেন্ট-এর মাধ্যমে ব্লু রে আর ডিভিডি হয়ে এসে পড়েছে তোমার আশেপাশে? সিনেমাটা দেখার মতো তো বটেই, আর আর একটা দারুণ সারপ্রাইজ দিয়ে রাখি। সিনেমাটার সঙ্গে স্পেশাল ফিচার হিসেবে রয়েছে আমাদের সবার সুপার-ডুপার পছন্দের সিনেমা "ফ্রোজন"-এর একটা ছোট্ট সিকুয়েল: ফ্রোজন ফিভার, আর স্ক্রিনের সামনে বসে সেইটি দেখার জন্যে সোফা নিয়ে আমি মারামারি করতেও রাজি আছি।

তাহলে দেরি নয়, ছোট করে দেখে নাও সিন্ডেরেলার এক চিলতে ট্রেইলার:
https://www.youtube.com/watch?v=WRuHM6rLSF8

যাবার আগে মনে করিয়ে দিই, সিনেমাটা যখন দেখতে বসবে, তখন পাশের সিটটা খালি রেখো কিন্তু, নইলে হাতে পপ-কর্ন নিয়ে ঢুকে আমি বসব কোথায় শুনি?

বায়োস্কোপ::

সোনার আলো হীরের দ্যুতি

শ্রেয়সী চক্রবর্তী

ফিল্ম রিভিউ – হীরের আংটিঃ পরিচালক – ঋতুপর্ণ ঘোষ (১৯৯২)

১৯৯২ সালে আমরা যারা ছোট ছিলাম, কিংবা আজকের এই ২০১৫-এ যারা নতুন যুগের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা এবং যে সব নতুন শিশু আগামীদিনের বাঙালি সংস্কৃতির নতুন জুতোয় পা গলাবে ... তাদের সব্বার কাছেই এটি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে হাল-আমলের বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠতম পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁর প্রথম ছবি 'হীরের আংটি' বানিয়েছিলেন শিশুদের জন্য, আমাদের সকলের ছোটবেলার জন্য। আর এই সিনেমাটির বিশেষত্ব এখানেই যে বিখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়–এর লেখা মূল উপন্যাসটির রস সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেও পরিচালক সোনার বাংলার সোনার ছেলেমেয়েদের হাতে সিনেমার যে রসভাণ্ডটি তুলে দিয়েছিলেন সেটি নিজেই একটি অনন্য ক্রিয়েশন অর্থাৎ নতুন সৃষ্টি।

বন্ধুরা তো জানোই পুজো এসে গেছে। আকাশে মন ঝিলমিল করা শরতের সোনা রোদ্দুর। তোমাদের মধ্যে কারা কারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজ পাঠ' বইটা পড়েছ বলো দেখি? সেই যে সহজ পাঠে বলা আছে না... "ছুটির দিনে কেমন সুরে/ পূজার সানাই বাজায় দূরে/ তিনটে শালিক ঝগড়া করে/ রান্নাঘরের চালে!!" এমনি এক পূজার ছুটির দিনে পূজার সানাইয়ের গল্প দিয়ে শুরু হয় গেনুদা'র সঙ্গে হাবুল আর তিন্নির গ্রামের বাড়িতে মজাদার দুপুর। গেনুদা কিন্তু শুধুই গেনুদা নন, তিনি হলেন গিয়ে খাস "রামদুলালের নাতি" এবং রাজপুত্র গন্ধর্বনারায়ণ; তাঁর ঘোড়া আছে, সৈন্য সামন্ত আছে, রাজ্যপাট আছে, রাজ্যের শত্রু আছে আর আছে এক কমল হীরের বিশাল দামী আংটি। কিন্তু এত কিছু ভালো এবং মন্দ থাকার পরেও এই পৃথিবীটার রৌদ্রে অমৃত, জলে অমৃত, বায়ুতে অমৃত... অর্থাৎ তিনি আনন্দ করে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চান। আর হ্যাঁ তাঁর

একটা রংবেরঙের ঝোলাব্যাগ আছে, তাতে যে আলপিন টু এলিফ্যান্ট কি জিনিস নেই তা বলা শক্ত ! কিন্তু এহেন গেনুদার কাছে হাবুল আর তিন্নির মত দুটো ছোট্ট মিষ্টি ভাইবোন মোটেও ছিল না। কিভাবে গেনুদা এই ভাইবোনদের খুঁজে পেলেন তার গল্পই হল "হীরের আংটি"।

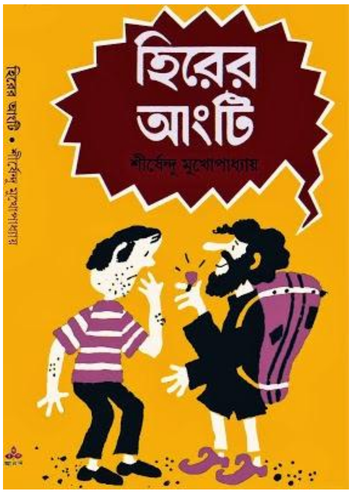

পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ

গেনুদা

কিন্তু তাহলে "রামদুলালের নাতি" আর ষষ্ঠীচরণের কি হবে?? ও হ্যাঁ বলাই তো হয়নি, হাবুল যে গ্রামে থাকে আর তার বোন তিন্নি আমেরিকা থেকে বাবা মায়ের সঙ্গে যে গ্রামে দাদুর কাছে পূজার ছুটি কাটাতে এসেছে, সেই গ্রামের 'নামকরা' (আসলে 'বদনাম' করা) ছিঁচ্‌কে চোর হল ষষ্ঠীচরণ। ছিঁচ্‌কে হলেও ষষ্ঠী চোর মোটেও নিজেকে এলেবেলে ভাবে না। সে স্বপ্ন দেখে সে হবে একদিন এক বিশাল রক্তজল করা হারে রে রে রে রে ডাকাতদলের মালিক! আর তার জন্যই সে লোকের ঘটিটা, বাটিটা চুরি করে বেড়ায়। বেচারা টাকা চুরি করতে সুযোগ পায় না। টাকা তো সব ব্যাঙ্কে থাকে; তাই। তা সেই ষষ্ঠীচরণ এসেছিল হাবুলদের বাড়ির অতিথি "রামদুলালের নাতি" গন্ধর্বনারায়ণ ওরফে গেনুদার সেই খুব দামী হীরে বসানো ঝকমকে সোনার আংটিটা চুরি করতে। আর এসে কিনা শুনে ফেলল, হাবুলদের এই সম্পত্তি জমি বাড়ি বাগান পুকুর দুর্গাপূজা কিছুই নাকি হাবুল দের নয়, সবই নাকি হাবুলের দাদুকে গচ্ছিত রাখতে দিয়ে গিয়েছিলেন এক সময়ের বিখ্যাত ডাকাত "রামদুলাল"। শর্ত ছিল তিরিশ বছরের মধ্যে যদি রামদুলালের নাতি গন্ধর্বনারায়ণ ফিরে আসে, যার হাতে থাকবে ঐ বিখ্যাত হীরের আংটি আর তাকে চিনে নেবে শ্বেত আর লোহিত নামে রামদুলালের দুই সাকরেদ লাঠিয়াল, তাহলে রামদুলালের নাতিকেই তার সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবেন হাবুল- তিন্নির দাদু।

হাবুল আর তিন্নি

অথচ তিরিশ বছর পূর্ণ হওয়ার সময়, মহালয়ার দিন সকালে সিল্কের চাদর দুলিয়ে, নতুন পাঞ্জাবী পরে যে গন্ধর্বনারায়ণ উপস্থিত হলেন হাবুলদের বাড়িতে আর বিকেলে তাঁরই জন্য বন্ধ হয়ে গেলো গ্রামের বাড়ির দুর্গাপুজো; আর মহালয়ার রাতেই কি না রোমহর্ষক কাহিনীর মধ্যে দিয়ে জানা গেলো আসলে তিনি আসল গন্ধর্বনারায়ণই নন!!!! সব ওই শ্বেত আর লোহিতের কারসাজি! আর তার সঙ্গে সঙ্গেই হাবুলের ছোটকার ঝাক্কাস্ অ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে ঘটে গেলো আরো একটা ম্যাজিক! ভালো লোকের কাছে পরাজিত হল অনেক শক্তিশালী দুষ্টু লোক। অনেক বছর পর জীবনের ভালো আর মন্দ গুলো তোমরা যখন জানতে শিখবে, তখন দেখবে হীরের আংটি সিনেমার এই ভালো স্বভাবের, ভালো মানুষের জিতে যাওয়ার গল্পটা তোমাদেরকে নতুন করে লড়াই করার শক্তি যোগাবে, ভালো মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা দেবে। হীরের আংটি সেই প্রায় হারিয়ে যেতে বসা ভালোত্বের, মনুষ্যত্বের গল্প বলে। আর বলে সম্পর্কের কথা। গেনুদা একা মানুষ, তাই না গেনুদা অত সহজে ওই বাজে লোকগুলোর খপ্পরে পড়েছিল। যেই না হাবুল তিন্নি কে পেলো গেনুদা, অমনি তার মনের কত বদল হল বল দেখি! সে সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দিল হাবুলের দাদুকে, মায় কমল হীরের অসম্ভব দামী আংটিটাও সে হাবুলকে দিয়ে গেলো ভালোবাসার 'অভিজ্ঞান', মানে চিহ্ন হিসেবে, এটাই বা কি কম কথা! এই লোভ না করতে শেখার গল্পই হল হীরের আংটি।

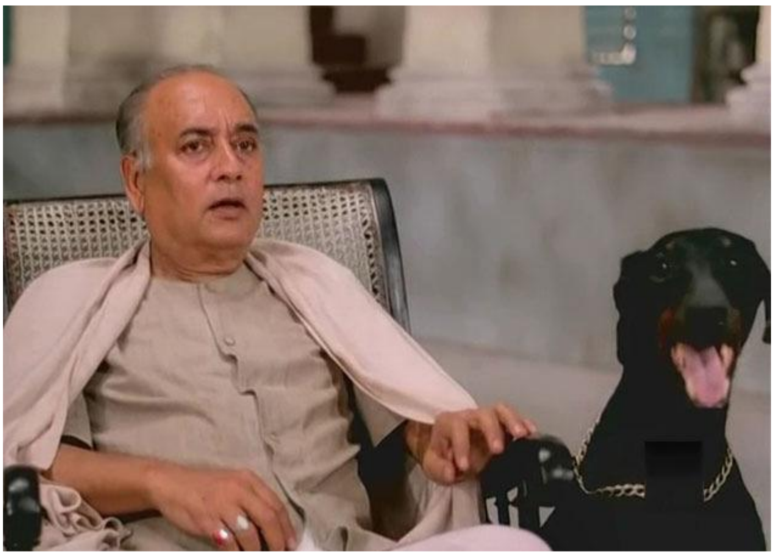

বন্ধুরা আজ মহালয়ার দিনে "ম্যাজিক ল্যাম্পের" আলোয় তোমাদের মুখ চোখ যখন আনন্দে আর বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তখন খুব সহজে, না না সিনেমার জন্য ডিভিডি বা সিডির দরকার নেই; অনেক সময় মহালয়ায় এটা টিভিতেই দিয়ে দেয়! অথবা স্রেফ এই লিঙ্কে ক্লিক করে 'ইউটিউব' খুলে কম্পিউটারেই দেখে ফেলো না বহু বছর আগের আরেক মহালয়ার দিনের গল্প 'হীরের আঙটি' –

https://www.youtube.com/watch?v=O0BbfMnycXY

দেখবে এই সিনেমা আর তার অভিনেতাদের তোমরা কোনোদিনই ভুলতে পারবে না, সে তোমরা একদিন যত বড়ই হয়ে যাও না কেন! এই অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই এখন আর বেঁচে নেই; আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই এই ছবির পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ-ও। কিন্তু বাংলা সিনেমার সিন্দুকে রেখে যাওয়া তাঁর 'হীরের আংটি' এখনও ঝলমল করছে বাঙালীর মনে।।

কি বন্ধুরা তাহলে এবার পুজোর শুরুতেই দেখে নিচ্ছ তো 'হীরের আংটি'?!

[ছবি সূত্রঃ ইন্টারনেট]

ম্যাজিক ল্যাম্পের দলবল এবং লেখক পরিচিতি

প্রথম বর্ষ।। প্রথম সংখ্যা।। শারদীয় ২০১৫।।

যারা প্রথম থেকে পাশে ছিলেন

	অনন্যা দাশ বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ছেলেবেলা কেটেছে জয়পুর শহরে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ায় বসবাস করেন এবং পেন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। ইংরাজি ও হিন্দি ভাষায় সৃজনশীল রচনার সঙ্গে বাংলা থেকে অনুবাদ ও করেন। 'ইন্দ্রজালের নেপথ্যে', 'মার্কিন মুলুকে নিরুদ্দেশ', 'রুজভেল্টের পাণ্ডুলিপি', 'ফুলের দেশের বিভীষিকা', 'হিরের চেয়ে দামি', 'মৎসকন্যার অভিশাপ', ত্রি-তীর্থঙ্করের অন্তর্ধান', 'উত্তরাধিকার এবং' তাঁর বিখ্যাত কিছু বই। একমাত্র 'উত্তরাধিকার এবং' প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রকাশিত। ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা।
	অভিজ্ঞান রায় চৌধুরী লেখক-এর সম্পর্কে আর নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখালেখির শুরু ১৯৯৪ থেকে। লেখার বিষয় প্রধানত বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান এবং রহস্য হলেও কিশোর সাহিত্যের অন্যান্য ধারাতেও সমান স্বচ্ছন্দ এবং জনপ্রিয়। 'মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন', 'নিয়ম যখন ভাঙ্গে', 'সংকেত রহস্য', 'রহস্য যখন ডারউইন', 'ভৌতিক অলৌকিক' ও অন্যান্য। বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত এবং সেই সুত্রে ব্রিটেনের ওয়েলস এর প্রবাসী। ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা।
	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য যথাক্রমে জয়ঢাক ও tambourine নামে ছোটোদের দুটো ওয়েবপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৯৫ সালে গুয়াহাটিতে খবরের কাগজে লেখা শুরু। বড়ো-ছোটো বিভিন্ন পত্রিকায় সেই থেকে নিয়মিত লিখেছেন ও লিখছেন। প্রকাশিত বইঃ ইলাটিন বিলাটিন (ছড়া), কল্পলোকের গল্পকথা (ছড়া), বনপাহাড়ি গল্পগাথা (লোকগল্প), ঈশ্বরী (গল্পগ্রন্থ), ঠগির আত্মকথা (অনুবাদ), দোর্দোবুরুর বাক্স (উপন্যাস), গভীর উত্তর সরণীতে (বাশো মাৎসুওর ভ্রমণকাব্যের অনুবাদ)। ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা।
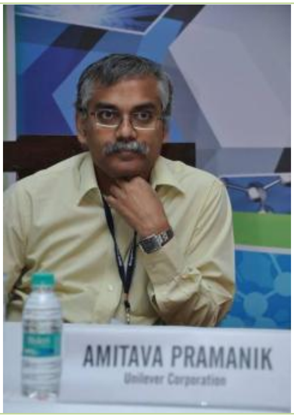	**আমিতাভ প্রামাণিক** ব্যাঙ্গালোর নিবাসী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিক। ছড়া লেখায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার, এছাড়াও অন্যান্য লেখালেখিতেও অনায়াস। ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা। এই ম্যাগাজিনের বিজ্ঞান বিভাগটি অমিতাভবাবু দেখাশোনা করছেন।

ম্যাজিক ল্যাম্পের ম্যাজিশিয়ানরা

রাখী নাথ (কর্মকার)

ইংরেজীতে স্নাতকোত্তর, স্কুল শিক্ষিকা। স্বামীর কর্মসূত্রে বর্তমানে পেনসিলভ্যানিয়া, ইউ এস এর বাসিন্দা। নেহরু চিল্ড্রেন'স মিউজিয়ামের একসময়ের ক্রিয়েটিভ ডিপার্টেমেন্টের টিচার - ছবি আঁকার শখ যার জন্মগত। এছাড়াও ভালো লাগে ঘুরে বেড়াতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে ক্যামেরাবন্দী করতে, সৃজনশীল লেখালেখিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। 'সানন্দা', 'এই সময়', 'আনন্দবাজার', 'ফেমিনা', 'উনিশ কুড়ি', 'ভ্রমণ', 'সংবাদ প্রতিদিন', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ', 'গৃহশোভা', 'কিশোর ভারতী' ইত্যাদি নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার লেখা। ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের ভ্রমণ বিভাগটি দেখছেন।

মহুয়া ব্যানার্জী

শিকাগো-তে থাকেন। হাউস ওয়াইফ, সখ - ভ্রমণ (ট্রাভেল), ছবি তোলা। রান্না আর হাতের কাজেও (ক্রাফট) সখ আছে। এছাড়াও গান শুনতে ,বই পড়তে আর গিটার বাজাতে ভালো লাগে। আমাদের ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের চটপট চেটেপুটে বিভাগটি দেখছেন।

অঙ্কিতা দাস

জন্ম বিখ্যাত আমের জেলা মালদায়। স্কুল জীবন কেটেছে মালদা শহরেই। Lady Brabourne কলেজ থকে ইতিহাসে স্নাতক ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। সংসারের কাজের ফাঁকে হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করেন। ছোটদের জন্য বিভিন্ন ধরণের ক্রাফ্ট বানাতে এবং শেখাতে ভালবাসেন। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন। ম্যাজিক ল্যাম্পের হাওয়াকল বিভাগএর দায়িত্বে আছেন।

ঋজু গাঙ্গুলি

চাকরির সূত্রে প্রবাসী বাঙালি। বই পড়তে এবং সিনেমা দেখতে ভীষণ ভালোবাসেন। ম্যাজিক ল্যাম্পের বায়োস্কোপ বিভাগটি দেখছেন। রিভিউ বিষয়ে মতামত দিতে এবং যেকোন প্রশ্ন করতে মন চাইলে ওনাকে পাবেন এই ই-মেইলে: dpshqgj@gmail.com

শ্রেয়সী চক্রবর্তী

এই নামটি আসলে তাঁর বদনাম; তাঁর ভালো নামটি হল 'এলোমেলো রোদ্দুর'! বই আর প্রকৃতিকে অসম্ভব ভালোবেসে এই পৃথিবীর বুকে খামখেয়ালি পছন্দসই জীবন কাটানোই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আর হ্যাঁ গাছপালা থেকে কীটপতঙ্গ, ফড়িং থেকে বাঘ – সব কিছুর-ই সংরক্ষণের প্রবল পক্ষে এঁর অবস্থান।

রুদ্র সেন

কলকাতার বাসিন্দা। একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত। নেশা বই পড়া এবং ইতিহাস চর্চা। বিভিন্ন পত্রিকায় এবং ওয়েবজিনে রুদ্র'র লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ম্যাজিক ল্যাম্পের ইতিহাস বিভাগটি সহেলীর সাথে যুগ্মভাবে দেখছেন। এই সংখ্যায় মাচুপিচু নিয়ে আকর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন রুদ্র।

সহেলী চট্টোপাধ্যায়

উত্তর চব্বিশ পরগণার কাঁচরাপাড়ার বাসিন্দা। ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। শখ বই পড়া আর মাঝে মাঝে এক আধটা গল্প লেখা। ম্যাজিক ল্যাম্পের মেরুদন্ড হিসেবে যারা আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

তন্ময় বিশ্বাস

ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আসানসোলের বাসিন্দা তন্ময় ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। শখ হল বই পড়া, লেখালেখি আর ছবি আঁকা। প্রশিক্ষণ না নিলেও তন্ময়ের আঁকার হাত বেশ ভালোই। ওর বেশ কিছু গল্প এবং ছবি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক বিভাগে তন্ময় ম্যাজিক ল্যাম্পের পাশে থেকেছে।

তাপস মৌলিক

নিবাস উত্তরপাড়া, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, তাপস মৌলিক ছোটদের জন্য লিখছেন গত কয়েক বছর। জনপ্রিয় বিভিন্ন ওয়েব পত্রিকা ও কাগুজে পত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখি করেন তিনি। লেখালিখির পাশাপাশি গানবাজনা এবং ভ্রমণে সমান উৎসাহী। ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা এবং ওয়েব ডিজাইনার।

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

ম্যাজিক ল্যাম্পের সম্পাদিকা। কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত এবং বৈদিক সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনার পরে বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরের জৈন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র সংঘের পরিবেশ মূলক নীতি বিষয়ে গবেষনায় রত.. এবং জৈন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপিকা হিসেবে নিযুক্ত। কবিতা প্রথম ভালবাসা। এছাড়াও ছবি আঁকতে, আবৃত্তি করতে, এবং ছোটদের সাথে সময় কাটাতে ভালবাসেন। প্রথম বই ১৪টি ছোট গল্পের সংকলন "সাত আকাশের ওপারে"। কিশোর ভারতী, আনন্দমেলা, রংবেরং, কিচিরমিচির, ইচ্ছামতি-তে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি লেখালিখি করেন, এছাড়াও নিয়মিত জয়ঢাক পত্রিকায় গল্প পাঠ করেন। দ্বৈতা ম্যাজিক ল্যাম্প-এর ছড়া-কবিতা বিভাগটি দেখছেন। ম্যাজিক ল্যাম্পের মস্তিষ্ক দ্বৈতা।

আঁকিবুকি বিভাগের সদস্যরা

রাখী নাথ (কর্মকার)

ইংরেজীতে স্নাতকোত্তর, স্কুল শিক্ষিকা। স্বামীর কর্মসূত্রে বর্তমানে পেনসিলভ্যানিয়া, ইউ এস এর বাসিন্দা। নেহরু চিল্ড্রেন'স মিউজিয়ামের একসময়ের ক্রিয়েটিভ ডিপার্টেমেন্টের টিচার - ছবি আঁকার শখ যার জন্মগত। এছাড়াও ভালো লাগে ঘুরে বেড়াতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে ক্যামেরাবন্দী করতে, সৃজনশীল লেখালেখিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। 'সানন্দা', 'এই সময়', 'আনন্দবাজার', 'ফেমিনা', 'উনিশ কুড়ি', 'ভ্রমণ', 'সংবাদ প্রতিদিন', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ', 'গৃহশোভা', 'কিশোর ভারতী' ইত্যাদি নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার লেখা। ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের ভ্রমণ বিভাগটি দেখছেন।

পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়

পেশায় ভূগোলের শিক্ষিকা। কলকাতার বাসিন্দা, শখ ছবি আঁকা আর কবিতা লেখা। বই পড়তেও ভালোবাসেন পিয়ালী।

পুষ্পেন মণ্ডল

(জন্ম – ১৯৭৯) বাসস্থান – বজবজ। পেশায় ফ্যাশান ডিজাইনার। স্কুল জীবনে গল্প লেখার হাতে খড়ি। ২০০২ ও ২০০৩ সালে 'রবিবাসর' (লিটল ম্যাগাজি আয়োজিত গল্প প্রতিযোগিতায় দুবারআ প্রথম পুরস্কার ও ২০১৪ 'জয়ঢাক' গল্প প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। মূলত ছোটদের জন্য রোমাঞ্চকর গল্প লেখেন। বিভিন্ন শিশুকিশোর - পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। হবি ছবি আঁকা ও কবিতা পড়া।

নচিকেতা মাহাত

বাড়ি বেলপাহাড়ীর এক ছোট্টো গ্রামে। বর্তমানে ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা। ৩ বছর বয়সে আঁকার স্কুলে ভর্তি শিলদাতে। পড়াশুনোর হাতেখড়ির আগেই আঁকাতে হাতেখড়ি হয়। এখন ফিজিক্সে অনার্স, এটা প্রথম বর্ষ। জয়ঢাক অনলাইন ম্যাগাজিনে প্রথম কমিকস প্রকাশিত হয় www.joydhak.com। এখন বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত কমিকস প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় ছোটোগল্প এবং কবিতাও লেখে নচিকেতা, বেড়াতে ভালোবাসে।

তন্ময় বিশ্বাস

ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আসানসোলের বাসিন্দা তন্ময় ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। শখ হল বই পড়া, লেখালেখি আর ছবি আঁকা। প্রশিক্ষণ না নিলেও তন্ময়ের আঁকার হাত বেশ ভালোই। ওর বেশ কিছু গল্প এবং ছবি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিক বিভাগে তন্ময় ম্যাজিক ল্যাম্পের পাশে থেকেছে।

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

ম্যাজিক ল্যাম্পের সম্পাদিকা। কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা। বেশ কিছু পত্রিকায় দ্বৈতার কবিতা এবং ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। দ্বৈতা নিজে একজন অলংকরণ শিল্পীও । ম্যাজিক ল্যাম্পের মস্তিষ্ক দ্বৈতা।

বহুরূপী বিভাগের লেখক-শিল্পীদের পরিচিতিঃ

মণিমালা চক্রবর্তী

কাজ বলতে পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা। তবে গম্ভীর বৈজ্ঞানিক তাকে কোনভাবেই বলা চলে না। সবরকমের বই পড়তেই ভালবাসে। আর সে ভালবাসে টো টো করে ঘুরে বেড়াতে। 'খায় দায় গান গায়' আর আশেপাশে যেথায় যেমন যে টুকু দেখে, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখার পসরা সাজায় তোমাদের জন্য।

স্বর্ণ চক্রবর্তী

ওরফে বার্ডম্যান নতুন প্রজন্মের একজন উন্মুখ প্রকৃতি পড়ুয়াই নন শুধু, তিনি সর্বতোভাবে সংরক্ষণের পক্ষে। এই তরুণ প্রকৃতিবিদ পাখি আর প্রজাপতি বিষয়ে অসীম জ্ঞানের অধিকারীই নন শুধু, 'স্নেক হ্যান্ডলিং'-এও মহা দক্ষ!

শ্রেয়সী চক্রবর্তী

এই নামটি আসলে তাঁর বদনাম; তাঁর ভালো নামটি হল 'এলোমেলো রোদ্দুর'! বই আর প্রকৃতিকে অসম্ভব ভালোবেসে এই পৃথিবীর বুকে খামখেয়ালি পছন্দসই জীবন কাটানোই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আর হ্যাঁ গাছপালা থেকে কীটপতঙ্গ, ফড়িং থেকে বাঘ – সব কিছুর-ই সংরক্ষণের প্রবল পক্ষে এঁর অবস্থান।

আমন্ত্রিত শিল্পীঃ

রাখী নাথ কর্মকার

ইংরেজিতে স্নাতোকত্তর, স্কুল শিক্ষিকা। বর্তমানে ইউ এস এ-র পেন্সিলভ্যানিয়া নিবাসী এই গুণী মানুষটির ছবি আঁকার শখ চিরন্তন। একসময়ে যুক্ত ছিলেন 'নেহ্রু চিল্ড্রেন্স মিউজিয়ামের' ক্রিয়েটিভ আর্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে। তাই আমাদের 'বহুরূপী'-র জন্যও তুলি ধরতে দ্বিধা করেননি। বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রিকায় এঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। আর ম্যাজিক ল্যাম্পের ভ্রমণ বিভাগে এই দিদির অবদান দেখে এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছ!

লীলা রায়

'বহুরূপী' বিভাগের 'তির্যক' ভিডিয়োটা কেমন লাগল বন্ধুরা?? এই ভিডিয়ো তোমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের সব্বার ভালোবাসার দিদিমণি, শ্রীমতী লীলা রায়। উত্তরবঙ্গের এই মানুষটি স্কুলে পড়ান জীবন বিজ্ঞান আর তাঁর মিষ্টি গলায় ঘুরে বেড়ায় রবীন্দ্রনাথের গান!

আর তাছাড়া আমাদের সব্বার পায়ের তলায় আছে সর্ষে আর নানা রকম বড় মেজো, সেজো- ছোট চাকার দল যা দিয়ে পাহাড়ে নদীতে সাগরে মাঠে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে আমরা সব্বাই ভালোবাসি।।

কমিকস বিভাগের লেখক-শিল্পীদের পরিচিতিঃ

অভিনব সাহা

Creative Head at Dark Dreams - Damn Comics and Creative Artist cum Visualiser at Kriyetic. Studied at Vijaygarh Jyotish Ray College. Past: St. Andrew's School.

দীপায়ন

Project Manager at Switchgear & Controls and Founder & Creative Head at Dark Dreams - Damn Comics. Studied at Globsyn Business School. Past: Andrew's high(H.S) School, Kolkata.

বিজয়া

Studies DGWA at Maya Academy of Advanced Cinematics (MAAC). Past: Jodhpur Park Girls' School.

নচিকেতা মাহাত

বাড়ি বেলপাহাড়ীর এক ছোট্টো গ্রামে। বর্তমানে ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা। ৩ বছর বয়সে আঁকার স্কুলে ভর্তি শিলদাতে। পড়াশুনোর হাতেখড়ির আগেই আঁকাতে হাতেখড়ি হয়। এখন ফিজিক্সে অনার্স, এটা প্রথম বর্ষ। জয়ঢাক অনলাইন ম্যাগাজিনে প্রথম কমিকস প্রকাশিত হয়)www.joydhak.com)। এখন বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত কমিকস প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় ছোটোগল্প এবং কবিতাও লেখে নচিকেতা বেড়াতে ভালোবাসেন।

আরও যাঁদের লেখায় সেজে উঠেছে ম্যাজিক ল্যাম্পঃ

প্রদীপ্ত ভক্ত

প্রদীপ্ত ভক্ত পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আপাতত বাস ইউ এস এ-র কলোরাডোতে। নেশা ভ্রমণ, তা সে বাইক নিয়েই হোক কিংবা প্লেনে, একা বা সদলবলে।

মধুমিতা ভট্টাচার্য

জন্ম আসানসোলে, অধুনা ডুয়ার্সের চাবাগানে বাস। স্নাতক থেকে ডক্টরেট অবধি পড়াশুনো শান্তিনিকেতনের শিক্ষাভবনে। - এয়ারফোর্স স্কুল হাসিমারার প্রধান শিক্ষিকা।অবসর সময়টুকু লেখালিখিতে কাটাতে ভালবাসেন। এছাড়াও ভালবাসেন গান, ছবি আঁকা, বই পড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে একাধিক কবিতা ও গল্প। ছোটদের জন্যে কলম ধরেন অনাবিল আনন্দ পেতে।

চুমকি চট্টোপাধ্যায়

কিশোর ভারতী পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ। পত্র ভারতী প্রকাশনার সাথেও যুক্ত।

কিশোর ভারতীর সম্পাদকীয় দফতরে আছেন প্রায় দশ বছর। কবিতা ক্লাবের সদস্যদের প্রেরণায় লেখা শুরু করেন। পত্র ভারতীর সঙ্গে তিরিশ বছরের সম্পর্ক। অবসর পেলেই ছোটোদের জন্য কলম ধরেন।

সৌগত সেনগুপ্ত

জন্ম কলকাতায়। পঃ বঃ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার প্রয়োগবিদ্যায় স্নাতকোত্তর। বর্তমানে বহুজাতিক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত। লেখালেখির শুরু "এই সময় সংবাদপত্রে।" এছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় ছোটদের জন্য গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাজিক ল্যাম্প পরিবারের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সৌগত।

মহাশ্বেতা রায়

ছোটদের ওয়েব পত্রিকা ইচ্ছামতীর সম্পাদকপরিকল্পক। পেশাগতভাবে ওয়েব ডিজাইন-, ফরমায়েশি লেখা এবং অনুবাদের কাজ করেন।

	সঙ্গীতা দাশগুপ্ত রায় পেশায় সফট স্কিল ট্রেনার । কাজে অকাজে দেশ বিদেশের শহর বন্দর থেকে গ্রামবাংলার উঠোন বাগান অবধি অবাধ গতির সুবাদে মানুষের মনের কাছাকাছি আসা এবং সে মনের ছবি কাগজে কলমে ফুটিয়ে তোলাই নেশা । বিশ্বাস করেন স্বপ্নবুনন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। লেখালেখি দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা , সানন্দা এবং বিভিন্ন ওয়েবম্যাগ ও লিটলম্যাগে ...
	সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী নদীয়ার কল্যাণীর বাসিন্দা, জন্ম ও বেড়ে ওঠা সেখানেই। পেশায় আমডাঙ্গা হাইস্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। নেশা বহুমুখী। ছবি আঁকতে ভালবাসেন, বিশেষত কার্টুন ও পোর্ট্রেট, কিছু পত্রপত্রিকায় অলঙ্করণের দায়িত্ব সামলেছেন। ছোটবেলা থেকে আবৃত্তির অভ্যাস পরে কবিতাপ্রেমে রূপ নিয়েছে। কিশোর ভারতী সহ একাধিক পত্রপত্রিকা এবং অনলাইন ম্যাগে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ। গান শুনতে এবং খোলা গলায় গাইতে, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে ঘুরতে এবং দুর্লভ দৃশ্যকে লেন্সবন্দী করতেও ভালবাসেন খুব।

ম্যাজিক ল্যাম্পে লেখা পাঠানোর নিয়মঃ

১। শিশুকিশোরদের উপযোগী মৌলিক লেখা পাঠান।

২। অন্য কোনও ছাপা পত্রিকা বা ই-ম্যাগাজিনে পূর্বে প্রকাশিত লেখা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

৩। লেখা ওয়ার্ড ফাইলে অভ্র সফটওয়্যারে টাইপ করে পাঠাতে হবে।

৪। লেখা পাঠানোর ঠিকানা editor.desks@gmail.com

নিয়মিত খবরাখবর পেতে চোখ রাখো আমাদের ফেসবুক গ্রুপ-এ। নিচের লিঙ্কে ক্লিক করলেই সটান পৌঁছে যাবে সেখানে – https://web.facebook.com/%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA-956332851067089/timeline/